ঐতিহাসিক চিত্র।

বর্গীহস্তে বঙ্গসৈন্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গলা, বিহার, র মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময়ে মুর্শিদাবাদ বঙ্গরাজ্যের ী ছিল। গিরিয়ার সমরক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ-স্থাপয়িতা মুর্শিদ খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। বিহার ও বাঙ্গলা য়াসেই তাঁহার করতলগত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উড়িষ্যা অধিকার তে তাঁহাকে কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। উড়িষ্যা সর-াজ খাঁর জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর অধিকৃত ছিল। আলিবর্দ্দী তাহাকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে ড়িষ্যার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসেন। সৈয়দ আহম্মদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য মুর্শিদকুলীর জামাতা মির্জ্জা বাখর উড়িষ্যা অধিকার করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করিয়া ফেলেন। নবাব সেই সংবাদ শুনিয়া সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ, মীর জাফর খাঁ প্রভৃতির সহিত উড়িষ্যায় উপস্থিত হন, এবং মির্জ্জা বাখরকে পরাজিত করিয়া সৈয়দ আহম্মদের উদ্ধার সাধন করেন। মুর্শিদকুলীর বক্সী মীর হাবীব এই সময় হইতে নবাবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হন।

উড়িষ্যাবিজয়ের পর নবাব মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায়

মধ্যে মৃগয়ামোদ ভোগ করি... । সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়-পঞ্চকূট ও ময়ূরভঞ্জ পদদলি... হর মহাদেও' শব্দে মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। এই সম... সাহিত পাঁচ ছয় সহস্র সৈন্য মাত্র ছিল। এই মহারাষ্ট্রীয়গণই বাঙ্গলায় চিরদিন বর্গী নামে প্রসিদ্ধ। শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পেশওয়াগণ সর্ব্বপ্রধান থাকিলেও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণও কোন কোন প্রদেশ অধিকার করিয়া স্বাধীন ভাবে তাহার শাসনকার্য্য পরিচালনে প্রবৃত্ত হন। পেশওয়া বালাজী বাজিরাওএর প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুজী ভোঁসলা সমগ্র বিরার প্রদেশ জয় করিয়া দা... ণাত্য-মধ্যেও আপনার মহীয়সী ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তদানীন্তন সম্রাট মহম্মদ সাহকে হীনবল জানিয়া রঘুজী বাঙ্গলা... স্থাপন উদ্দেশ্যে স্বীয় দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিতকে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে বহু শিক্ষিত ও সাহসী সৈন্যসহ বঙ্গরাজ্যে প্রেরণ করেন। ভাস্করের ... সংখ্যা পঞ্চবিংশ সহস্রের ন্যূন ছিল না। কিন্তু তাহা চতুর্দ্দিকে চত্বা... সহস্র বলিয়া ঘোষিত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই... মহারাষ্ট্রীয়গণ মেদিনীপুর হইতে তথায় সমাগত হয় ও নানাস্থানে ... প্রয়োগ করিয়া আপনাদের আগমন ঘোষণা করিতে থাকে। এইখানে বঙ্গসৈন্যের সহিত তাহাদের কয়েকটী সামান্য যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বর্গীগণ বঙ্গসৈন্যেরও বাহুবলের পরিচয় পাইয়াছিল।

রঘুজী দিল্লীর বাদশাহকে হীনবল জানিয়া বাঙ্গলার চৌথগ্রহণের জন্য ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার নবাব যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না, এ সংবাদ বোধ হয় তিনি জানিতে পারেন নাই তিনি না জানিলেও ভাস্কর পণ্ডিত প্রথম সংঘর্ষেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি আপনার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট হইতে কিছু অর্থলাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন। ভাস্কর নবাবের নিকট দশ লক্ষ মুদ্রা চাহিয়া পাঠাইলে আলি-

বর্দ্দী খাঁ উৎকোচ প্রদানে অসম্মত হন। অগত্যা ভাস্করের ক্রোধাগ্নি প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ বঙ্গসৈন্যদিগকে আক্রমণের জন্য স্বীয় সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ বিদ্যুদ্বেগে বঙ্গসৈন্যের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদের রক্তে বসুন্ধরা রঞ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। বঙ্গ-সৈন্যগণও আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে থাকে। এই সময়ে নবাবের প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ও তাঁহার সহকারী সর্দ্দার খাঁ, সমসের খাঁ প্রভৃতি আফগানগণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করায় নবাবসৈন্য মহারাষ্ট্রীয়-দিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে থাকে।

প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নবাব সেনাপতিদিগকে সৈন্যসংগ্রহের আদেশ দিতেন এবং তাহারা অধিক দিন থাকিবারও আশ্বাস পাইত। কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই নবাব সেই সমস্ত সৈনাকে বিদায় করিয়া দিতেন। সেই কারণে এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে আফগান সেনা-পতিগণ নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আফগান সেনাপতিগণের ঔদাসীন্য ও সৈন্যগণের কাতরভাবের জন্য নবাব ভাস্করের অভিপ্রায় বুঝিবার ইচ্ছায় সন্ধির ছলে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। ভাস্কর এক কোটী টাকা ও নবাবের সমস্ত হস্তীগুলি চাহিয়া পাঠান। নবাবের দেওয়ান জানকীরাম নবাবকে তাহাই প্রদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব তাঁহার পরামর্শ না শুনিয়া ভাস্করের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। একদিন যুদ্ধের পর রজনী সমাগত হইলে নবাব তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে সঙ্গে লইয়া মুস্তাফা খাঁর শিবিরে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাদের উভয়কে শাণিত তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মুস্তাফা খাঁ নবাবের সহসা আগমনে ও তাঁহার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া লজ্জিত হন ও অন্যান্য সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিয়া সকলকেই নবাবের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উপদেশ দেন। অন্যান্য আফগান সেনাপতিগণ তাহাতে সম্মত হইলে, নবাব রজনীর শেষভাগ

নিশ্চিন্ত মনে অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া দেখিলেন মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে।

নবাব পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে কোন প্রকারে হউক, শ পক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতে পারিলে আ নূতন সজ্জায় ও নূতন উৎসাহে তাহাদিগকে আক্রমণ করা যাইবে এইরূপে পরামর্শ করিতে করিতে সে দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাব শিবির হইতে একটি কামান অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে একটি বৃক্ষের উপর উক্ত কামান স্থাপন করিয়া নবাব-সৈন্যের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য বন্দুকও চালিত হইতে লাগিল। চারিদিকে সৈন্যগণের হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। বর্দ্ধমানরাজার দেওয়ান মাণিকচাঁদ ভীত হইয়া প্রভাত হইলে স্বীয় প্রভুর নিকট পলায়ন করার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সেই সময় গভীর রজনীযোগে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ, ভীম-বেগে নবাব-সৈন্যের উপর চতুর্দ্দিক হইতে নিপতিত হইল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সহসা এইরূপে আক্রান্ত হইয়া স্বীয় সৈন্যের ব্যূহ রচনার অবকাশ পাইলেন না। এমন কি তিনি নিজে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণেরও সময় পান নাই। যে যেরূপে পারিল, আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। ফলতঃ নবাব সৈন্যগণ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মীর হাবীব তিন স্থানে আহত হইয়া শত্রু-পক্ষের হস্তে বন্দী হন। তাহার পর তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাবের গোলন্দাজ সেনাপতি হায়দার আলি খাঁ যদিও শত্রুপক্ষকে ধরাশায়ী করিতেছিলেন, তথাপি সেই অগণ্য পঙ্গপালের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে মুস্তাফা খাঁ, সমসের খাঁ, সর্দ্দার খাঁ, ওমার খাঁ, রহিম খাঁ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানীগণ প্রথমতঃ বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অবশেষে সকলে দলবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন।

ব...যোগে নবাব-সৈন্যগণ যেন কিঞ্চিৎ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার অবকাশ ...ইল। তাহারা তাহার পর সমবেত হইয়া শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া ...টোয়ার দিকে যাত্রা করিল। জগন্নাথের পথ ধরিয়া তাহারা অগ্রসর ...তে লাগিল।

নবাব সৈন্যগণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। কয়েকদিন কয়েকটি সামান্য যুদ্ধের পর তাহারা একটি স্থানে উপস্থিত হইলে, মুস্তাফা খাঁ সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কি সেনাপতি, কি সৈন্য, সকলেই অনাহারে ও পথশ্রমে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিল। কাহারও মস্তিষ্ক স্থির ছিল না। মুস্তাফা খাঁ সকলকে ইসলাম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করায়, ধর্ম্মের নামে কতকগুলি সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া শত্রুপক্ষের উদ্দেশে গমন করে। এই সময়ে কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ছাড়িয়া উপাসনা ও রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। মুস্তাফা খাঁ সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করায় সকলে আপনাদের দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। মুস্তাফা খাঁর সৈন্যেরা তাহাদের খাদ্যদ্রব্যাদ অপহরণ করিয়া লয়, এবং তাহাদের নিকট অবগত হইয়া আরও কতিপয় নবাব-সৈন্য খাদ্যদ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আনায় তাহাদিগের দুই তিন দিন আহারের সংস্থান হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহার পর হইতে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল যে, নবাব-সৈন্যেরা আর তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করার সুযোগ পায় নাই।

কিছু দিন যাইতে যাইতে একদিন প্রাতঃকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা অকস্মাৎ নবাব-সৈন্যকে আক্রমণ করে। নবাব-সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ব্যূহবদ্ধ হইবার সুযোগ না পাওয়ায়, মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণে ধরাশায়ী হইতে থাকে। একে তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ...হার উপর সেই দুর্দ্দান্ত কালান্তক শত্রুগণের আক্রমণে তাহাদের

মধ্যে হাহাকারের ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেই আপন আপন প্রাণ-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। নবাব নিজে একাকী কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলেন, কিন্তু দুইটী হস্তীর পথাবরোধের জন্য তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। হস্তী দুইটী প্রয়োজনমত দ্রব্য বহন করিয়া নবাবের হস্তীর অগ্রে অগ্রে গমন করিত। কতকগুলি অপরিচিত ব্যক্তিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আপনাদের শৃঙ্খল দ্বারা তাহাদিগকে অনবরত আঘাত করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই দুই জন্তুর অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নবাবের নিকট গমন করিতে সাহসী হইল না। যদি উক্ত হস্তিদ্বয় সে দিবস পরাক্রম প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবাব হয়ত সে দিন মহারাষ্ট্রীয়হস্তে নিহত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতে নবাবের সাহায্যের জন্য অগ্রগামী বঙ্গসৈন্যেরা তাহাদিগকে ভীমবলে আক্রমণ করায় তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এইরূপে ক্রমাগত আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের কয়েক দিবস পরে নবাব সৈন্য কাটোয়া দুর্গে উপস্থিত হইল। এই সময়ে নবাবের পক্ষে তিন সহস্র মাত্র অশ্বারোহী ছিল, অবশিষ্ট সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়।*

এই ভীষণ আক্রমণে নবাব-সৈন্যগণ যেরূপ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল। তাহাদের যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য অপহৃত, শিবিরাদি বিনষ্ট, সমস্ত ধনসম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হওয়ায় সেই সমস্ত বীরপুরুষদিগকে মর্ম্মস্পর্শিনী যন্ত্রণায় অস্থির-চিত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদিগের হৃদয় ক্রমাগত নিরাশার

* Orone. হলওয়েল বলেন যে নবাবের ২৫ হাজার সৈন্যের মধ্যে কেবল ২৫০০ পাঠান ও ১৫০০ বঙ্গসৈন্য অবশিষ্ট ছিল। শেষোক্তেরা আপনাদিগের অধ্যক্ষ মীরহাবীবের উৎসাহে পাঠানদিগের ন্যায় কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিল। (Holwell's Interesting Historical Eavents. Part I. Chapter II. Page 15).

প্রগাঢ় ছায়ায় আবৃত হইতেছিল। তাহারা নিদাঘের দারুণ রৌদ্র ও বৃষ্টিতে যার পর নাই কাতর হইয়া হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত। দিবাভাগে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িত। রাত্রিকালে মেঘমিশ্রিত দুর্ভেদ্য অন্ধকার তাহাদের হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিত। ভূমিতল ব্যতীত তাহাদিগের আর কোনও শয্যা ছিল না। বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ ব্যতীত আর কিছু তাহাদের আচ্ছাদন ছিল না। তাহারা অনাহারে, অনিদ্রায়, প্রেতরাজ্যের অধিবাসিগণের আকার ধারণ করিয়াছিল। বৃক্ষের পত্র, ভূমির তৃণ, এমন কি পিপীলিকাদি কীট পর্য্যন্ত তাহাদের খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছিল। কোথায়ও তাহারা মুষ্টিমেয় তণ্ডুল মাত্র পায় নাই। যে গ্রামে তাহারা আহারের জন্য উপস্থিত হইয়াছে, অমনি মহারাষ্ট্রীয়গণ ভীষণ অগ্নিদাহে সমস্ত গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণের ভয়ে কেহ তাহাদিগকে সামান্য তৃণমাত্র প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। তাহাদের সমস্ত গোলাগুলি অপহৃত হইয়াছিল, দূর হইতে যে শত্রুপক্ষকে বাধা প্রদান করিবে তাহারও কিছু মাত্র উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বীর্য্য হ্রাস হইয়া আসিতেছিল এবং এক এক করিয়া সকলে ধরাশায়ী হইতেছিল। নবাব-সৈন্যগণ যদি সত্বর কাটোয়ায় উপস্থিত হইতে না পারিত, তাহা হইলে অনাহারে ও পথশ্রমে সকলেই একবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।

এই সময়ে জগন্নাথের পথে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মহাজনগণ কর্ত্তৃক যাত্রীদিগের জন্য অনেকগুলি চৌবাচ্চা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নবাব সৈন্যগণ রাত্রিকালে তাহার নিকটে অবস্থান করিয়া পথশ্রম দূর করিত। সেই সমস্ত চৌবাচ্চার চারিপার্শ্বে অনেক বৃক্ষ রোপিত থাকায়, সৈন্য, সেনাপতি সকলে উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহাদের পত্র ও বল্কল ভোজন করিয়া কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিত। কি সেনাপতি, কি সামান্য সৈন্য সকলেই আহার্য্যের জন্য অস্থির হইয়া এক সের খিচুড়ি বা অর্দ্ধসের

পচা মাংস দশ বার জনে মিলিয়া আহার করিত। রাত্রিতে নিদ্রাগমনের উপায় ছিল না। কারণ, মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন্ সময়ে যে তাহাদিগকে আক্রমণ করে তাহার স্থিরতা ছিল না। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারেই হউক অথবা দিবার উজ্জ্বলালোকেই হউক, সন্ধ্যার আলোকান্ধকার-মিশ্রণে হউক, অথবা প্রভাতের প্রথম আলোক-সমাগমেই হউক, সেই কৃতান্তানুচরগণ যখনই সুযোগ পাইত, তৎক্ষণাৎই নবাব-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিত। তাহারা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর একটি মাত্র প্রাণীকেও মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতে দিবে না। এই প্রকার দীর্ঘকাল ব্যাপী নিদারুণ কষ্টে নবাব সৈন্য ও সেনাপতিগণের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছিল। তাহারা সামান্য কথায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। বিশেষতঃ মুস্তাফা খাঁ একেবারে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, হয় তাহারা নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইবে, না হয় একেবারে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। ফলতঃ এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার নবাব-সৈন্যগণ কখনও অনুভব করে নাই এবং তাহারা যত দিন জীবিত ছিল ততদিন ইহার ভীষণ স্মৃতি তাহাদিগের হৃদয়-পটে সমভাবে অঙ্কিত ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল যে, মহা-রাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে যদি সুশৃঙ্খলার অভাব না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষকে আপনাদিগের করতলগত করিতে পারিত।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বহু কষ্টে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া মনে করিয়া-ছিলেন যে, উক্ত গঞ্জ হইতে সৈন্যগণের আহারাদি সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন ও পথিমধ্যস্থ সমস্ত গ্রামে অগ্নিদাহ উপস্থিত করে। অনেক খাদ্য দ্রব্য তাহাতে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া যায়। নবাব-সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়া সেই অর্দ্ধদগ্ধ তণ্ডুলাদির দ্বারা আপ-নাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে নবাব মুর্শিদাবাদে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদ ও ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদ

কাটোয়ায় উপস্থিতির বিষয় লিখিয়া পাঠান, ও সৈয়দ মহম্মদকে কতিপয় নূতন সৈন্য সহ খাদ্য দ্রব্য ও শিবিরাদি লইয়া আসিতে বলেন। নবাব রাজধানীরক্ষার জন্যও বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়াছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ অগ্রেই উড়িষ্যা হইতে মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নবাবের পত্র পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়াবহ আক্রমণের সংবাদ তাঁহারা বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সমস্ত বঙ্গভূমি যে প্রতিনিয়ত বিকম্পিত হইতেছে তাহাও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। তাঁহারা অনেকদিন নবাবের সংবাদ না পাইয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, নবাব বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার জীবিত থাকা ও রাজধানীর নিকটে উপস্থিতি জ্ঞাত হইয়া তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, এবং নবাবের আদেশমত সৈয়দ আহম্মদকে অনেকগুলি পুরাতন গোলন্দাজ সৈন্য ও অপর্য্যাপ্ত খাদ্য দ্রব্য * ও শিবিরাদি বাসোপযোগী সামগ্রী সহ কাটোয়াভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সৈয়দ আহম্মদ ভাগীরথী পার হইয়া কাটোয়ায় নবাবের সহিত মিলিত হইলেন। নবাব-সৈন্যগণের মধ্যে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। তাহারা অপর্য্যাপ্ত খাদ্য দ্রব্যাদি অবলোকন করিয়া আনন্দধ্বনিতে আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এইরূপে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া শত্রুপক্ষকে বাধা প্রদান করিতে সাহসী হইলেন। ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়েরা মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন ও হুগলী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম ভাগে আপনাদের প্রাধান্য বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্যক।

* রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, হাজী আহম্মদ সহরের সমস্ত রুটি-ওয়ালার দ্বারা অনেক রুটি প্রস্তুত করাইয়া কাটোয়ায় পাঠাইয়াছিলেন।

বর্গীহস্তে নিপতিত হইয়া বঙ্গসৈন্যগণ অশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া যে রূপে আত্ম রক্ষা করিয়াছিল, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিয়াই বোধ হয়। পাশ্চাত্য ইতিহাসে দশ সহস্র গ্রীকবীরের প্রত্যাবর্ত্তন এক অভাবনীয় বিষয় বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু এই পাঁচ ছয় সহস্র বঙ্গসৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন আমাদিগের নিকট আরও অভাবনীয় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের অবিরত আক্রমণ সহ্য করিয়া তাহারা যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বর্গীগণ বাঙ্গালার সৈন্যদিগকে নিতান্ত ক্রীড়াপুত্তলিকা মনে করিতে পারে নাই।

ভাই মধু।

পঞ্জাবের ইতিহাস নানা রহস্যে বিজড়িত। ইহার উত্থানের ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে। ভারতে আমাদের আর্য্যগণের প্রথম লীলাস্থল এই পঞ্জাব। আবার হিন্দুদের পতনও এই পঞ্জাবেই শেষ হইল। হিন্দুবীর্য্যের শেষ স্ফুলিঙ্গ শিখ-বীর দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে হতগর্ব্ব হইলে ভারত একেবারে পরাধীন হইয়া পড়িল। তারপর সে পরাধীনতা আজও চলিয়াছে। কবে তাহার অবসান হইবে, কে বলিতে পারে?

শিখেরা কেবল সামরিক বীরই নয় তাহাদের হৃদয়ে নানা কোমল বৃত্তিও পরিস্ফুট হইয়াছে। যোদ্ধৃজনোচিত কঠোরতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরও আবেশ তাহাতে দেখা যায়। শিখেরা আন্তরিক ভক্ত। তাহাদের ভক্তি উদ্দীপনাময়ী। তাহারা গুরুর জন্য দেশের জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে। তাহাদের মত আত্মোৎসর্গ করিতে এ জগতে বুঝি আর কেহই শিখে নাই। ধর্ম্মরক্ষার্থ তাহারা দেহত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে কতদূর উৎসুক, তাহা বান্দার সময়ের ইতি-বৃত্তে বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সুকবি রবীন্দ্রনাথের একটি কথায় এ দৃশ্য কেমন সুন্দর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তার লাগি তাড়াতাড়ি
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দিরা সারি সারি
"জয় গুরুজীর" কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।

এমন করিয়া মরিতে শিখ ভিন্ন আর কে জানে!

জীবনের সামান্য ছোট ছোট গুণ গুলিও তাহারা আয়ত্ত করিয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা, তাহাদের আতিথেয়তা কেহই কখন ভুলিবে না। এ সকল গুণ তাহাদের মধ্যে আবার যে সকল বীরের হৃদয়ে অধিকতর হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকেই আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। যে কয় জনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তাহা এত মহৎ, এত উদ্দীপনাময় যে, তাহা সর্ব্বকালেই সর্ব্বাবস্থাতেই জগতের আদর্শ হইয়া রহিবে।

আমরা রাজা হরিশ্চন্দ্রের দাক্ষিণ্য-কাহিনী শুনিয়াছি, মহাবীর কর্ণের ও রন্তিদেবের আতিথেয়তা, মহারাজ শিবির (১) আশ্রিত রক্ষার

(১) মহারাজ শিবি কোন ব্রত উপলক্ষে কেবল জল মাত্র পান করিয়া আটচল্লিশ দিন কাটাইয়া দিলেন। তৎপর দিন তিনি আহারে বসিলেন। যখন তিনি সে খাদ্য শ্রীহরিকে নিবেদন করিবেন, এমন সময় দ্বারদেশে এক ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হইলেন। রাজা সমুচিত সমাদরে তাঁহাকে আহার করাইলেন। সে দিন আর তাঁহার আহার হইল না। তৎপর দিন যখন আবার আহারে বসিলেন, তখন এক দরিদ্র ভিক্ষুক আসিয়া দেখা দিল। সে দিনও রাজার আহার হইল না। তৎপর দিবস এক শূদ্র কতকগুলি সারমেয় বেষ্টিত হইয়া আসিয়া রাজার অংশ গ্রহণ করিল। রাজার আহারের আর কিছুই রহিল না, কেবল পানের সামান্য মাত্র জল রহিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া রাজা যেমন তাহা পান করিবেন, এমন সময় এক চণ্ডাল আসিয়া বলিল 'মহারাজ! বড়ই তৃষ্ণা-কাতর হইয়াছি। একটু জল দিন।' রাজার আর জল পান করা হইল না। যেটুকু জল ছিল, তাহাও চণ্ডাল পান করিয়া তৃপ্ত হইল। শুনা যায়, তার পর শ্রীহরি তাঁহার এরূপ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া দেখা দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উপাখ্যানটি শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়।

মহাভারতে মহারাজ শিবির যে বিবরণ আছে, তাহা এই—একদিন মহারাজ রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটি কপোত তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া বসিল ও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে নিবেদন করিল। অনতিবিলম্বে একটি শ্যেন আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। শ্যেন আসিয়া কপোতকে ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিল, বলিল—কপোত তাহার খাদ্য। সুতরাং তাহার খাদ্য লুকাইয়া রাখা রাজার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় আচরণ। রাজা শ্যেন-বাক্যে বিষম বিপদে পড়িলেন। তিনি কোন রূপেই শ্যেনকে তুষ্ট করিতে পরিলেন না। শেষে শ্যেন বলিল—'ভো রাজন! আপনার দক্ষিণ উরু কর্ত্তন করিয়া, উহা হইতে আমাকে কপোত-পরিমিত মাংস প্রদান করুন; তাহা হইলেই আমার প্রিয়ানুষ্ঠান ও কপোতের পরিত্রাণ হইবে, এবং আপনিও শিবিগণের প্রশংসাভাজন হইতে পারিবেন।'

বিবরণ অনেক পড়িয়াছি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ভারত ভুলে নাই। তাঁহাদের মত হইবার জন্য ভারত আজীবন তপস্যা করিতেছে। এই তপস্যায় কত জনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সে ইতিহাস কে জানে? আমাদের এই পতিতাবস্থাতেও হয়ত অনেক হরিশ্চন্দ্র, অনেক কর্ণ, বহু রন্তি ও বহুতর শিবি আছেন। কালে হয়ত আবার তাঁহাদের কীর্ত্তিতে জগন্মণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

মহাবীর কর্ণ যেমন স্বীয় সন্তানকে উৎসর্গ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন, শিখবীর ভাই মধুও তদ্রূপ আপনার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে উৎসর্গ করিয়া অতিথির সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে উৎসর্গকাহিনী যেমনি হৃদয় বিদারক, তেমনি মধুর। সে কাহিনী শিখ আজও আদরের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

একদিন সন্ধ্যাবসানে মধু দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী, সুখ দুঃখে সমভাগিনী সহধর্ম্মিণীর সহিত বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন পতিপ্রাণা স্ত্রীও ক্লান্ত স্বামীকে আন্তরিক ভক্তির সহিত আহারাদি করাইয়া এখন প্রীত মনে তাঁহার সেবা করিতেছেন। সে রাত্রিতে প্রকৃতি বড়ই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। অনবরতই শীতল বাতাস বহিতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রবল বাত্যা আসিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরটিকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। বাহিরে

তখন রাজা স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া পরিমাণ করিলেন, কিন্তু সেবারেও কপোত গুরু হইল। এইরূপে রাজা সর্ব্ব শরীরের মাংস কাটিয়া পরিমাণ করিলেন, তথাপি কপোত গুরু হইল। শেষে রাজা নিজেই তুলাদণ্ডে বসিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া শ্যেন অন্তর্হিত হইল। তখন জানা গেল, কপোত বৈশ্বানর অগ্নি আর—সেই শ্যেন শচীপতি ইন্দ্র।

এই উপাখ্যানটি বন পর্ব্বের ১৯৬তি অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ পর্ব্বের ১৩১শ অধ্যায়েও ঠিক্ এইরূপ একটি বিবরণ দেখা যায়। তাহাও মহারাজ শিবির পিতা উশীনরকে পরীক্ষা করিবার জন্য অগ্নি ও ইন্দ্রেরই ছলনা। এই উভয় উপাখ্যানের কোনই প্রভেদ নাই। একটি অপরটির অনুকৃতি মাত্র।

ঘোর অন্ধকার। সে অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ মানুষের কর্ম্ম নহে। দম্পতি সুখে আলাপ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ দ্বারে ঘন ঘন ধাক্কা পড়িতে লাগিল। শুনিতে পাওয়া গেল, সেই ধাক্কার সহিত শব্দ হইতেছে,—"ক্লান্ত পথিক দ্বারে দণ্ডায়মান। এ অন্ধকারে বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। রাস্তা হারাইয়া ফেলিয়াছি। রাত্রির জন্য আশ্রয়প্রার্থী। দয়া করিয়া আশ্রয় দিন।"

সে কাতরধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ভাই মধু আর্ত্তের ত্রাণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীর কথা ভুলিয়া গেলেন। শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। এক কাতর পথিক সে গৃহে প্রবেশ করিল। দম্পতি পরম যত্নে সে পথিকের সেবা করিলেন। সেই রাত্রে আবার রন্ধন করিরা তাহাকে খাওয়াইলেন, তারপর একটি ভিন্ন ঘরে তাঁহার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। পথিক বেশ সুখে সে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। পথিক যে নিরীহ ব্যক্তি নহে, এক জন দস্যু, তাহা সে ক্ষুদ্র গৃহস্থ আদৌ জানে না। পথিক লোক ভুলাইবার মতলবে শিখপরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আসিয়াছিল। গৃহস্থও বিপন্ন পথিক ভাবিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রত্যুষে গৃহস্থ শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। পথিকও শয্যা ছাড়িয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিলেন। যথোচিত শিষ্টাচারের পরে পথিক বিদায় প্রার্থনা করিল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ শিখগৃহস্থ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, বিশেষ মিনতি করিয়া বলিলেন যে, 'আজ না খাইয়া যাইতে পারিবেন না। আপনি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমরা আহারের ব্যবস্থা করিয়া ফেলি। পরে আহারান্তে যথা ইচ্ছা যাইবেন।' কিন্তু পথিক কিছুতেই থাকিতে সম্মত হইল না, শেষে নিতান্ত পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া বলিল—"যদি একান্তই না ছাড়েন, তবে আমাকে খানকতক রুটি দিন, আমি তাহাই লইয়া যাত্রা করি।' পথিকের এই কথামত গৃহিণী

রুটি প্রস্তুতের জন্য তাড়াতাড়ি কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহস্বামী ভাই মধু তরকারি কিনিবার জন্য বাজারে চলিয়া গেলেন।

পথিক দেখিল, গৃহে আর কেহ নাই, কেবল এক গৃহিণী মাত্র রন্ধনে ব্যস্ত। তাঁহার গাত্র নানা স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত। সে সব অলঙ্কার দেখিয়া দস্যুর পাপতৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠিল। সে সেই অবলাকে আক্রমণ করিল। তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল ও সেই অলঙ্কারগুলি লইয়া অন্তর্হিত হইল।

পথিমধ্যে দস্যু মধুকে দেখিতে পাইল। মধুকে দেখিয়া তাহার পাপ প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে তাঁহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য চেষ্টা করিল। কিন্তু ভাই মধু তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া গেলেন। তাঁহাদের সে সামান্য খাদ্য না খাইয়াই অতিথি বিমুখ হইয়া ফিরিলেন, অতিথিবৎসল মধু তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি পথিকের এরূপ হঠাৎ চলিয়া আসিবার কারণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। পথিক কিছুতেই ফিরিবেন না, কিন্তু মধুর আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। পথিক কাঁপিতে কাঁপিতে মধুর গৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে আসিয়া মধু সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। পথিকের এরূপ আচরণে তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনি ধীর ভাবে তাহা সহ্য করিলেন। পথিককে নিকটে বসাইয়া তাহাকে রুটি করিয়া খাওয়াইলেন। তাহাকে কোন কথা বলিলেন না। সামান্য বিরক্তির ভাবও সে বীরের বদনে প্রকাশ পাইল না।

মধুর এরূপ উদারতা ও ক্ষমাশীলতা দর্শন করিয়া পাষাণ প্রকৃতি দস্যুর হৃদয় গলিয়া গেল। তাহার সে কৃতকর্ম্মের জন্য তাহার হৃদয় জ্বলিয়া গেল। সে অনুতাপদগ্ধ হইয়া কাতর ভাবে মধুর নিকট ক্ষমা চাহিল। তাহাকে শ্রীগুরুর নিকট লইয়া যাইবার জন্য মধুকে আগ্রহের

সহিত বারম্বার অনুরোধ করিল। মধু অনুতপ্ত দস্যুকে গুরুর নিকট লইয়া গেলেন। গুরু দস্যুর এরূপ পরিবর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন ও তাহাকে পবিত্র শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

এই ঘটনা শিখদিগের ষষ্ঠ গুরু মহাত্মা হরগোবিন্দের সময়ে ঘটে।

শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজয়নগররাজের প্রণয়পরিণাম।

——:*:——

[সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ফিরিস্তায় বিজয়পুররাজের বিচিত্র প্রণয় কাহিনী ও তাহার বিষফল নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। বিজয় নগরের লুপ্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রাহক সিউয়েল মহোদয় (Robert Swell) অনুমান করেন বক্ষ্যমাণ রাজা দেবলরায় দ্বিতীয় বুক্কের ভ্রাতা ও সিংহাসনের অধিকারী প্রথম দেবরায়। দেবরায় ১৪০৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিজয়পুর সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ১৪১২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তাহার শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন।]

মুদকল নগরে (Mudkul) একজন কৃষিজীবী বাস করিতেন। তাঁহার এতাদৃশ অসামান্য রূপসম্পন্না একটি কন্যা ছিল যে, অনুমান হইত, বিধাতা তাঁহার সৌন্দর্য্যবিভূতির পূর্ণতা সম্পাদনজন্যই যেন তাঁহার সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করিয়া কন্যারত্নের নির্ম্মাণকৌশলে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই মোহিনীমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। এরূপ রমণীরত্ন বিজয়পুররাজেরই অন্তঃপুরচারিণী হইবার নিতান্ত যোগ্য, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণ বিজয়নগরের রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং রাজদর্শনের পর, রাজাকে সম্মোহিত করিবার জন্য তাঁহার শিক্ষিতা কুমারীর রূপগুণের সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজা তাঁহার লাভাশায় নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং বিবাহার্থে তাঁহাকে তাঁহার জনকজননীর নিকট হইতে আনিবার জন্য ব্রাহ্মণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ সিদ্ধমনোরথ হইয়া, মূল্যবান্ উপহার কন্যার, পিতামাতার প্রতি রাজানুগ্রহের ও স্বয়ং কন্যার জন্য "রাজ্ঞী" এই মানাস্পদ উপাধির প্রতিশ্রুতির সহিত কৃষিজীবীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং—রায়ের আদেশ জানাইয়া তাঁহাদিগকে পরিজনপরিবৃত হইয়া বিজয়নগর যাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষকদম্পতি দুহিতার অচিন্তিত

পূর্ব্ব সৌভাগ্য প্রত্যাশায় আনন্দোন্মত্ত হইয়া ব্যগ্রভাবে তনয়ার কণ্ঠ দেশে রাজোপহৃত আভরণ পরাইতে উদ্যত হইলেন। কারণ এইরূপ প্রণয়-চিহ্ন একবার স্বীকৃত হইলে, পুনরায় বিবাহে কোন অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুহিতার ব্যবহারদর্শনে তাঁহারা একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাদিগের বিপরীত মতাবলম্বিনী কন্যা কণ্ঠাভরণ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, 'বিজয়পুরের রাজান্তঃপুরে যাহারা একবার প্রবেশ করে, তাহারা আত্মীয়গণের মুখদর্শন হইতেও একেবারে জন্মের মত বঞ্চিত হয়। আপনারা যদি পার্থিব সমৃদ্ধিকামনায় আমাকে বিক্রয় করিতে চাহেন, কিন্তু বিজয়পুরের রাজপ্রাসাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পাইলেও, তাহার বিনিময়ে পিতামাতা হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য জানিবেন।' অশ্রুগদগদ বচনে স্নেহময়ী কন্যাকর্ত্তৃক এই কথা কয়েকটি উচ্চারিত হইলে উচ্চাকাঙ্ক্ষ জনক-জননীর হৃদয়ও স্নেহাবেগে পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। সুতরাং অবশেষে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে তাঁহাদিগকে সমস্ত উপহার দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিতে হইল। ব্রাহ্মণ এইরূপে ভগ্ন মনোরথ হইয়া কোপভরে বিজয়নগর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। ইহাতে বিজয়নগররাজের সুন্দরীলাভাভিলাষ একেবারে অদম্য হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি প্রবর্দ্ধিত প্রণয়বেগে অধীর হইয়া বল-প্রয়োগে কৃতসংকল্প হইলেন। শুভানুসন্ধায়ী সচিব ও বন্ধুগণের নিষেধ সত্ত্বেও পরিবার-পরিবৃত পর্ত্তাল * যে গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহাকে লাভ করিবার আশায় তাহা অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রণয়াধিকারিণীর জনকজননীকে সময় মত কোন সংবাদ না দেওয়ায়, অপরাপর গ্রাম বাসীদিগের ন্যায় তাঁহারও মুদকলের অবরোধায়োজন অবগত হইয়াই

* ফিরিস্তার অনুবাদক ব্রিগসের (Briggs) মতে এই অনিন্দ্যসুন্দরীর নাম নেহাল।

পলায়ন করেন। ক্রমে সৈনিকগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া ব্যর্থমনোরথে বিজয়নগর প্রত্যাবর্ত্তনের পথে লুণ্ঠননির্য্যাতন করিতে লাগিল। অতএব তৎসমীপবর্ত্তী রাজ্যের প্রবলপ্রতাপান্বিত অধীশ্বর ফিরোজ শাহের * পরাক্রান্ত সৈন্যকর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে অচিরেই বাধা প্রাপ্ত হইতে হইল, এবং তাহাতে দুই সহস্র সেনার প্রাণ বিয়োগ ঘটিল।

ফিরোজ মুদ্‌কলকে স্বীয় অধিকারভুক্ত মনে করিতেন। সুতরাং তাহার অবরোধে বিজয়নগর রাজকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার ছলে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতএব লুণ্ঠনাদি ও সৈন্যক্ষয়ের পর বিজয়নগর রাজ দেব (ল) রায় ৮০৯ হিজরীর (১৪০৬ খৃ অঃ) শীতকালে ফিরোজ সৈন্যকর্ত্তৃক নিষ্পিষ্ট হইয়া বিজয়নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে, প্রবল সেনার সহিত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে সুলতান ফিরোজও উক্ত নগরসমীপে সমুপস্থিত হইয়া, কয়েকটী রাজপথ অধিকার করিয়া রহিলেন। কিন্তু কর্ণাটকগণ রাজার হঠকারিতায় রাজ্য শত্রু-কবলিত হইতে চলিত দেখিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে সুলতান-সৈন্য আক্রমণ করিলে অবশেষে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ অভাবনীয় আশু সিদ্ধিলাভে উৎসাহিত হইয়া রাজা পূর্ব্ব পরাভবের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ প্রাচীরের অন্তরালে স্বীয় সৈন্যসমাবেশ করিয়া দ্বিগুণ বেগে সুলতানের বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। বিজয়নগরের বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ মুসলমানদিগণের কার্য্যপটুতা প্রদর্শনের বিশেষ অনুকূল ছিল না। সুতরাং তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হইতে লাগিলেন। এই বিগ্রহে ফিরোজশাহের হস্তে একটি বাণ বিদ্ধ হয়। তিনি তাহাতে অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়াই অপর হস্তের সাহায্যে শর আকর্ষণ করিয়া ক্ষতস্থান একখণ্ড বস্ত্র

* ফিরিস্তার মতে বাহমনী বংশীয় ফিরোজ শাহ ১৩৯৭ হইতে ১৪২২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কুলবর্গ Kulbarga এই বাহমনী বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী ছিল। ইহাঁদিগের বংশপ্রতিষ্ঠাতা হুসেন গঙ্গা নামক এক ব্রাহ্মণের সেবক হইতে রাজপদে উন্নীত হইলে, ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক 'বাহমনী' উপাধিগ্রহণ করেন।

দ্বারা বাঁধিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সুলতানসৈন্য ইহাতে ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং অবশেষে আহমদ ও খান খানানের অদ্ভুত বিক্রমে ও আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রকারিতায় শত্রুগণ বিতাড়িত হইলে, সুলতান নগর পরিত্যাগ করিয়া 'সুবিধাজনক সমতল ক্ষেত্রে' * সরিয়া গিয়া, আহতদিগের আরোগ্য পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিত রহিলেন। এইরূপে চারিমাস যাবৎ রায়কে তাঁহার রাজধানী মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়া, তিনি বিজয়নগরের দক্ষিণ অংশ উৎসন্ন করিয়া বঙ্কাপুর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ইহাতে ষষ্টি সহস্র হিন্দু বন্দিরূপে গৃহীত হইয়া বঙ্কাপুর মুসল্‌মানদিগের করায়ত্ত হইল। বিজয়নগররাজ নিরুপায়, কি করিবেন, মুসল্‌মানগণ নগর হইতে বহির্গত হইবার পথ রোধ করিয়া বসিয়া আছে। অতঃপর খানখানানের উপর বিজয়নগর অবরোধের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া শত্রুগণের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় দুর্গ আদোনী (Adoni) অবরোধ করিবার জন্য সুলতান স্বয়ং যাত্রা করেন। ইহাতে দেবরায় প্রমাদ গণিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলেন। পরাজিত পক্ষের প্রার্থনায় বিজেতা কর্ত্তৃক সন্ধি যেরূপে সমাহিত হইয়া থাকে, বিজয়নগরের পক্ষে অতি ঘৃণ্য সর্ত্তে, ফিরোজশাহের সহিত সন্ধি নিষ্পন্ন হইল।

এই সন্ধির মর্ম্মানুসারে দেবরায় স্বীয় দুহিতাকে ফিরোজশাহের সহিত পরিণয় বন্ধ করিতে, তাঁহার যুদ্ধের ক্ষতি পূরণার্থ প্রচুর ধনরত্ন দিতে এবং বঙ্কাপুর দুর্গের অধিকার চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হইলেন। ফিরিস্তা পর্য্যন্ত বলেন,—কর্ণাট রাজগণের কন্যা স্বজাতীয় ব্যতীত বিজাতীয়ের হস্তে অর্পণ করা যদিও নিতান্ত গ্লানিকর ও নিতান্ত অপমানজনক ব্যাপার, তথাপি দেব(ল)রায় নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাহা স্বীকার

* সিউয়েল বলেন, বিজয়নগরের দক্ষিণস্থিত হোস্পেট (Hospete) নগর সমীপবর্ত্তী প্রান্তরই এই 'সুবিধাজনক সমতল ক্ষেত্র'। এতদ্ব্যতীত সুলতান কর্ত্তৃক নগরের দক্ষিণ ভাগের ধ্বংস সাধনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উঠা যায় না।

করিতে বাধ্য হইলে, উভয়পক্ষ হইতেই বিবাহের সমারোহ আয়োজন চলিতে লাগিল। তাহাতে ৪০ দিন যাবৎ নগর ও সুলতানের সেনাবাসের মধ্যে উভয় পক্ষের সংবাদবাহকগণের সর্ব্বদা যাতায়াত চলিয়াছিল। পথপার্শ্ব বিপণি ও পণ্য-শ্রেণী দ্বারা সুসজ্জিত হইল; এবং ঐন্দ্রজালিক, বিদূষক, নট ও হাস্যোদ্দীপক অনুকারকগণের শিক্ষানৈপুণ্যে ও শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শনে পথিক ও নাগরিকগণ নিরতিশয় পুলকিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহারা জানিতে বা বুঝিতে চাহিল না, ইহাতে কিরূপ চিরন্তন কলঙ্কারোপের সহিত বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে চলিল। মীর ফজল উল্লাহ ও খানখানান বরপক্ষের উপহার লইয়া বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং সপ্তাহান্তে নানাবিধ যৌতুক ও উপহার সহ বিজয়নগররাজকুমারীকে লইয়া সুলতানের সেনাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অতঃপর দেব(ল)রায় সুলতানকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ফিরোজশাহ নববধূর সহিত একত্রে শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সেনানিবাস খানখানানের অধ্যক্ষতাধীন রাখিয়া, নির্দ্দিষ্ট দিবসে সুলতান্ বিজয়নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দেব-(ল)রায় মহাসমারোহে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া জামাতার সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। নগর-তোরণ হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত তিনক্রোশ পথ সুবর্ণজড়িত মখমল, সাটিন প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল। উভয় নরপতিই শুভদর্শন সুন্দর বালক-বালিকা-শ্রেণীর মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন এবং তাঁহারা অগ্রসর হইলেই, তাহারা তাঁহাদিগের মস্তকোপরি স্বর্ণথাল ও রজতপুষ্প দোলায়িত করিয়া নিক্ষেপ করিলে, জনসমূহ ইচ্ছামত তাহা কুড়াইয়া লইতেছিল। নগরের মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া, নগরবর্ত্মে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে একত্রীভূত রাজ-কুটুম্বগণ মূল্যবান্ উপহারের সহিত অভিবাদন করিয়া নরপতিদ্বয়ের অগ্রে অগ্রেই শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত হইয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগি-

লেন। প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইবামাত্র সুলতান ও রায় অশ্ব হইতে অবতরণ ও রত্নমণ্ডিত সুশোভন শিবিকায় আরোহণ করিয়া চলিলেন। অভিনন্দনার্থ বরকন্যা নির্দ্দিষ্ট গৃহে নীত হইলে, দেব (ল) রায় সন্ধি-প্রাপ্ত জামাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাসভবনে গমন করিলেন। তিন দিন যাবৎ সুলতান রাজোপযোগী উপকরণ সমূহে আপ্যায়িত হইয়া রায়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, বিজয়নগররাজ পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক মূল্যের উপহারভারে তাঁহার পূজা ও দুইক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গমন করিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও বিপরীত ফল ফলিল। তিনি এত করিয়াও সুলতানের মন পাইলেন না—কুল মান ধন সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও বিজাতীয় জামাতার বিষনয়নে পড়িলেন। শ্বশুর তাঁহার সেনানিবাস পর্য্যন্ত অনুগমন করেন নাই বলিয়া, সুলতান ফিরোজশাহ ক্রোধে অধীর হইয়া মীর ফজল উল্লাকে বলিলেন, আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনজনিত অবমাননার প্রতিশোধ অবশ্যই লইতে হইবে।' তাঁহার এই প্রকাশ্যোক্তি দেব (ল)-রায়ের গোচরীভূত হইলে, এত ন্যূনতা স্বীকার করিয়াও সুলতানের সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি নিতান্ত বিরক্তি সহকারে এরূপ উদ্ধত উত্তর করিলেন, যে ঘনিষ্ট পারিবারিক সম্বন্ধ সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এরূপ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল যে, কোন ক্রমেই তাহার বিরতি হইল না।

ফিরোজ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেব রায়ের মনো-মোহিনী পর্ত্তাল (বা নেহাল)-কে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। সুলতান সমক্ষে তাঁহাকে উপস্থাপিত করা হইলে, ফিরোজশাহ তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য রাশি প্রত্যক্ষ করিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান খাঁর * সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এইরূপে দেবরায়ের প্রেমপাত্রী বিজয়-

* এই হাসান খাঁ দুর্ব্বলচেতা ও দুর্ব্ব্যসনী বলিয়া ফিরিস্তাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন। পিতৃ সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী হইলেও, তিনি তাঁহার পিতৃব্য খান খান আহমদ

নগর রাজের অবরোধের বিনিময়ে তাঁহার নপ্তৃস্থানীয় বাহমনী রাজকুমারের ব্যসনবিলাসোল্লাসিত অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়া পূর্ব্বাশঙ্কিত পিতামাতার চিরবিচ্ছেদের সহিত ক্রমে বিজাতীয় পতির সুখসৌভাগ্য চিরতরে অস্তমিত হইতে দেখিয়া দুঃখে কষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার বালিকাস্বভাবসুলভ অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ একটি সমৃদ্ধ রাজবংশ দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমারোপ ও তাঁহার ভাগ্যে বিধর্ম্মী পতির দুরবস্থার অংশ গ্রহণরূপ দুইটি বিষফল প্রসূত হইয়াছে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রায়ই অনুশোচনার অঙ্কুশতাড়ন সহ্য করিতে হইত।

আর দেবরায়! যাঁহার অবৈধ প্রেমোন্মত্ততার ফলে তাঁহাকে এইরূপ শোচনায় অবস্থায় নিপতিত হইয়া বংশগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে স্বীয় দুহিতারত্ন সমর্পণ করিয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। মুসলমান সেনাকর্ত্তৃক দেশ উৎসাদিত, দুর্গ অধিকৃত, রাজকোষ শোষিত, এবং বংশ মর্য্যাদা অপহৃত হইয়াও, তিনি বাহমনী সুলতানকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি জিত, সুলতান জেতা। পরাজিত যতই কামনারহিত ও শান্তিপ্রিয় হউক না, বিজেতার নিকট তাহার পদে পদে দোষ, কথায় কথায় ত্রুটি, প্রতি অঙ্গচালনায় বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয়। ভারতবাসীকে একথার সত্যতা অনুভব করিতে অধিকদূর যাইতে হইবে না। বাঙ্গালী জাতির প্রতিহৃদয়ই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আর এই পরাজয়ের মুখ্য কারণ সেই ধর্ম্মনীতি-

কর্ত্তৃক সর্ব্বাধিকারচ্যুত হইয়া ফিরোজাবাদে আলস্য ও ব্যসন নিরত হইয়া সময়াতিবাহিত করিতেন। ফিরিস্তা-প্রণেতা বলেন, আহমদশাহ হাসানের বাসার্থ ফিরোজাবাদের প্রাসাদ, বিস্তর জাইগীর ও রাজভবনের চতুষ্পার্শ্বে চারিক্রোশ পর্য্যন্ত মৃগয়া করিবার অধিকার প্রদান করেন। হাসান খাঁ এইরূপে হৃতসর্ব্বস্ব বন্দী হইয়াও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া অধিকতর সন্তোষ সহকারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার ও তাঁহার পিতৃব্য আহমদশাহের মধ্যে বিরোধের কোন কারণই বর্ত্তমান না থাকিলেও, অবশেষে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ফিরোজাবাদে বন্দিভাবে আবদ্ধ রাখা হয়। সুতরাং উভয় নরপতির বিবাদবিষয়ীভূত পর্ত্তালের এই খানেই সমস্ত সুখসৌভাগ্যের অবসান হয়।

বিরুদ্ধ ব্যবহার ;—অবৈধ প্রেমান্ধতা—প্রেমান্ধতাই বা বলি কেন—ঘোর ইন্দ্রিয়পরতাই বিজয়নগররাজের অশেষবিধ লাঞ্ছনার প্রধান হেতু। দেশবৈরী কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের পরশ্রীকাতরতার ফলে ভারতে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পুণ্যস্রোতে কনোজরাজের জীবন বিসর্জ্জন হইতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়া অষ্টশতাব্দী যাবৎ প্রতি ভারতবাসীই সেই পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কতকটা নিষ্পাপ হইয়া আসিতেছিলেন। তাহার নিদর্শনস্বরূপ মারাঠা, শিখ, রাজপুতের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছিল, এমন সময় মীরজাফর, রায় দুর্লভ প্রভৃতি কুলাঙ্গারগণের বিশ্বাসঘাতকতায়, মারাঠাদিগের দস্যুবৃত্তিতে, রাজপুতগণের পরস্পর বিদ্বেষের ফলে দুই শতাব্দী হইতে চলিল, ভারতবাসীর আবার নবাচরিত পাপের নূতন প্রায়শ্চিত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একমাত্র বিশ্বনাথই বলিতে পারেন ইহারই বা অবসান কোথায় ? কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য, আপনি আমি যেরূপ পাপাচরণ করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার চক্ষে ধূলি দিয়া, তাহা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারি না। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কালে তাহার অমোঘ ফল ভুগিয়াই থাকি, যেরূপ জয়চন্দ্র, আলাউদ্দীন, আওরঙ্গজেব, জাফর, রাঘোবা, ক্লাইব, হেষ্টিংস কেহই বিশ্বেশ্বরের অলঙ্ঘ্য শাসনসীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেইরূপ যিনি যতই আপনাকে শাসনাতীত ও অদম্য মনে করুন না কেন, অত্যাচার, অবিচার ও দুর্নীতির দণ্ডভোগ হইতে কিছুতেই তাঁহার নিস্তার নাই। ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে রাজা, প্রজায়, দুর্ব্বল প্রবলে কোন ভেদ নাই। তাই দেবরায়ের পরিণাম এইরূপ শোকাবহ। এ তথ্য শাস্য শাসক, সেব্য সেবক, সমর্থ অসমর্থ, রাজা রাজপ্রতিভূ, দিনজীবী দীন হীন কাহারও ভুলিলে নিস্তার নাই।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

কল্যাণেশ্বরী।

(৩)

রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ, মিথিলার রাজধানী গৌড় অসংখ্য সুরম্য সৌধে-ভূষিত হইয়া অমরাবতীর শোভাকেও পরাজিত করিয়াছিল। মর্ত্ত্য-মন্দাকিনীর সুপবিত্র সলিলধারা তাহাকে প্রক্ষালিত করিয়া আরও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছিল। ঘাটে ঘাটে প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি জাহ্নবীবক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া দিগন্তক্রোড়ে মিশিয়া যাইত। পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও মন্দিরের কাঁসররব সমস্ত নগরকে কম্পিত করিয়া তুলিত। নাগরিক ও সৈন্যগণের কোলাহলেরও বিরাম ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া মহারাজ বল্লালসেন-দেব ভারতের সমগ্র রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে যে সম্মান লাভ করিয়া ছিলেন, সেই সম্মান যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌড়নগরে বিরাজ করিতেছিল। আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত গৌড় বল্লালের বিজয়পতাকায় আরও শোভাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মের স্রোতে তাহা সর্ব্বদা ভাসমান হইত। বল্লালের বাহুবলের ও ধর্ম্মবলের সাক্ষীস্বরূপ এই মহানগর বঙ্গলক্ষ্মীর প্রিয়নিকেতনরূপে অবস্থিতি করিতেছিল।

গৌড়ের রাজপ্রাসাদমধ্যে রাজসভায় বসিয়া মহারাজ বল্লালসেন-দেব রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। নিকটে মহামন্ত্রী, মহাসান্ধি-বিগ্রহিক ও অন্যান্য অমাত্যবর্গও উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব আসনে আসীন হইয়া সভাস্থলকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে সময়ে মহারাজ নিবিষ্টচিত্তে কার্য্যে নিযুক্ত, সেই সময়ে সন্ন্যাসীঠাকুর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"মহারাজ বল্লালসেনদেবের জয় হউক," সভাসদগণসহ রাজা

আসন হইতে উত্থিত হইয়া সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে বলিলেন, "দেব আসন পরিগ্রহ করুন।"

সন্ন্যাসী নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলে রাজাও রাজাসনে উপবেশন করিলেন। পরে মহারাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন,

"অনেক দিন পরে প্রভুর শ্রীচরণদর্শন ঘটিল। এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন ও দাসের প্রতিই বা কি অনুমতি হয়।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—

"আমি এক্ষণে মা শ্যামরূপার নিকট হইতে আসিতেছি, রাজকার্য্য-সমাপনের পর মহারাজের সহিত নির্জ্জনে কিছু কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা আছে।"

"প্রভুর আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে।" এই বলিয়া রাজা রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী সভাসদ্গণসহ রাজকার্য্য পরিচালনা দেখিতে লাগিলেন। কার্য্যসমাপন হইলে মহারাজ বল্লাল-সেনদেব সন্ন্যাসীকে লইয়া একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় সন্ন্যাসীকে উপযুক্ত আসন প্রদান করিয়া নিজেও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলেন। সেখানে কাহারও প্রবেশ করার অধিকার রহিল না। মহারাজ বল্লালসেনদেব সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দাসের প্রতি কি আদেশ করিতেছেন?"

"আপনার কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, তাহার বিবাহের কিছু স্থির করিয়াছেন কি?"

"চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, সুপাত্র পাইতেছি না। এই বঙ্গ ভূমিতে ক্ষত্রিয়সন্তান পাওয়া বড়ই দুষ্কর, দূরে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

"আপনার কন্যা যেরূপ সুলক্ষণা, তাহাতে একটি সুন্দর ও সুলক্ষণ পাত্র চাই। আহা মাতা সাধনা যেন সাক্ষাৎ দেবী, মা আমাকে পাগলা ছেলে ব'লে কতই ভালবাসেন।"

"আপনি সাধনার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? প্রভু-রও অনেক স্থানে যাতায়াত করা হয়, কোন সুপাত্রের সন্ধান আছে কি?"

"আছে বৈকি, নতুবা আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিব কেন?"

"দাসের শুনিতে কি কোন বাধা আছে,"

"বাধা কি, আপনাকে বলিবার জন্যইত আসিতেছি।"

"শিখরভূমীশ্বর মহারাজ কল্যাণশেখরের নাম মহারাজ বোধ হয় জ্ঞাত আছেন?"

"শিখরভূমির কথা কাহার অজ্ঞাত, যে বল্লালসেন রাঢ়, বঙ্গ, মিথিলা বারাণসী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছে, শেখরভূমির পর্ব্বতমালা আজিও তাহাকে উপহাস করিতেছে।"

"মহারাজ কল্যাণশেখর আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী,"

"ইহা বড়ই আনন্দের কথা, বড়ই সুখের কথা। শিখরভূমির সহিত গৌড়ের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হয় ইহাতে কাহার অনিচ্ছা হইতে পারে?"

"কিন্তু মহারাজ তিনি বিবাহের যে যৌতুক প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কি আপনি দিতে পারিবেন?"

"এমন কি যৌতুক, যাহা বল্লালসেনের অদেয়?"

"বল্লালসেনের অদেয় নহে, তবে বল্লালসেন দিতে পারিলে হয়। কল্যাণশেখর সাধনার সহিত শ্যামরূপাকে চাহিয়াছেন।"

শুনিয়া বল্লালসেন শিহরিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—

"মহারাজের নিকট হইতে কোন উত্তর পাইব কি?"

"আপনাকে এক্ষণে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, পরে দিব।"

"কত দিন পরে পাইব?"

"তিন দিনের মধ্যে পাইবেন। সে কয় দিন আপনাকে গৌড়ে অবস্থিতি করিতে হইবে।"

"তাহাই হইবে। মহারাণী বোধ হয় সাধনাকে লইয়া অদ্যই আসিবেন। শ্যামরূপার মন্দিরে কল্যাণশেখরের সহিত সাধনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাধনা শ্যামরূপাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না জানিয়াই কল্যাণ-শেখর তাঁহাকে যৌতুক চাহিয়াছেন। অদ্য আমি চলিলাম, তিন দিন পরে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

রাজা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন, সন্ন্যাসীও অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ বল্লালসেনের হৃদয়ে এক অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। শ্যামরূপা সেনবংশের কুলদেবতা, কিরূপে তাঁহাকে অপরের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং তিনি সেনবংশকে পরিত্যাগ করিলে সেনবংশেরই বা কিরূপ পরিণাম হইবে? আবার সাধনাও শ্যামরূপাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, কল্যাণশেখরও শ্যামরূপাকে না পাইলে সাধনাকে গ্রহণ করিবেন না। এই সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তবে তাঁহার মনে মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার অবসানের পর সেনবংশের পরিণাম শুভ হইবে না। কারণ পুত্র লক্ষ্মণসেনের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। এইরূপ আন্দোলিতচিত্তে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে মহারাণী ও সাধনা সেনপাহাড়ী হইতে প্রত্যাগত হইলেন। বিশ্রামের পর মহারাণী মহারাজকে চিন্তান্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহারাজকে এরূপ ভাবিত দেখিতেছি কেন?"

"সে কথার উত্তর পরে দিব, এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার উত্তর দাও,"

"কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

'শ্যামরূপার মন্দিরে সাধনার সহিত শিখরভূমির রাজা কল্যাণ শেখ-রের কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

"আপনার নিকট সে সংবাদ আসিল কিরূপে? বোধ হয় সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া থাকিবেন।"

"সে কথা পরে বলিব। আমি যাহা জানিতে চাহিলাম তাহার উত্তর কৈ ?"

"হয়েছিল, সেই অবধি ত সাধনা কেমন কেমন হয়েছে। তাঁর সহিত সাধনার বিয়ে না দিলে পরিণামে বড়ই অমঙ্গল ঘটবে।"

"তা যেন বুঝলাম, কিন্তু তিনি কি যৌতুক চান শুনেছ" ?

"না তাত শুনিনি"

"তিনি শ্যামরূপাকে যৌতুক চান,"

"ও সেইজন্য সন্ন্যাসী ঠাকুর সাধনাকে বলেছিলেন, যে মহারাজ ও মহারাণীকে বল যে শ্যামরূপাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। সাধনাও শ্যামরূপার পদে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে বাঁচবেও না। আপনাকে বুঝি সন্ন্যাসী ঠাকুর সব বলেছেন।"

"হাঁ তাঁহার নিকট থেকেই সমস্তই শুনেছি। এক্ষণে উপায় কি ?"

"তাইত।"

"কেমন ক'রে সেনবংশের কুলদেবতাকে অপরের হস্তে অর্পণ করি।"

"কেন সাধনা ত তোমার বংশেরই, তাকে দিলে কি অপরকে দেওয়া হবে ?"

"তা যেন বুঝ্‌লাম, কিন্তু সেত ঠিক সেনবংশের হ'ল না।"

"আমি অত বুঝিতে পারি না। মার যা ইচ্ছে তাই হবে।"

'বেশ কথা ব'লেছ মহারাণী, মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

মহারাণীর সহিত কোন কথার মীমাংসা হইল না বটে, কিন্তু মহারাজ নিজেই তাহার মীমাংসা করিয়া লইলেন। তিনি অমাত্যগণের সহিতও কোন পরামর্শ করিলেন না। কিন্তু স্থির করিলেন, যদি সাধনা প্রাণ ভরিয়া শ্যামরূপার সেবা করে, তবে মাকে তাহারই হস্তে দিব। সেন-বংশের অদৃষ্টে যাহা আছে, মা তাহার বিধান করিবেন। বল্লালসেন সন্ন্যাসীকে ডাকাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—"মায়েরও তাহাই অভিপ্রায়।"

৮

নীলাকাশের কোলে ঘনীভূত মেঘখণ্ডের ন্যায় পঞ্চকূট পর্ব্বত দূর হইতে শোভা পাইতেছিল। নিকটে কেবল চিরহরিত বৃক্ষরাজির শ্যাম-তরঙ্গ অবিরত খেলা করিতেছিল। শাল, বংশ, কূটজ, পলাশ প্রভৃতি নানাজাতি বৃক্ষ পর্ব্বতের পাষাণস্তর ভেদ করিয়া চিরদিনই সমভাবে দণ্ডায়মান। কত সুন্দর পক্ষীর সুমিষ্ট কাকলী সেই নির্জ্জন পর্ব্বতবক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। দুই একটি গিরিনির্ঝরিণী কুলুকুলুরবে পর্ব্বতগাত্র ধৌত করিয়া নীচে নামিতেছিল। এই পর্ব্বতের পাদদেশে একটি সুদৃঢ় দুর্গ কালের কঠোর পীড়ন সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। দুর্গের পরিখাগুলি গিরিনির্ঝরিণীর জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হইয়া দুর্গটিকে অজেয় করিয়া রাখিয়াছিল। দুর্গের মৃৎপ্রাচীরের মধ্যে মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত তোরণ সর্ব্বদাই সুরক্ষিত ছিল। পর্ব্বতপার্শ্বে ও দুর্গমধ্যে অনেকগুলি দেবমন্দির পঞ্চকূটের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিতেছিল। শিখরভূমির সুদৃঢ় প্রাসাদ এই দুর্গ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহার গৌরব বাড়াইতেছিল। বহুকাল হইতে পঞ্চকূটের পাদমূলে দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে শিখররাজগণের রাজধানী গঠিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের নামানুসারে রাজধানী ও রাজ্য পঞ্চকূট আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই রাজধানীতে শিখরভূমির বা পঞ্চকূটের রাজগণ স্বাধীনতালক্ষ্মীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা কল্যাণশেখর তাঁহাকে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিবার জন্যই কল্যাণকূটে কল্যাণেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প দিন হইল তিনি সেনপাহাড়ী হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর অনুরোধে তিনি সাধনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজমাতা ও রাজ্যের আর আর সকলে সম্মত হইবেন কিনা তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। কল্যাণশেখর বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া স্নেহময়ী মাতার দ্বারা লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া শিখর-ভূমির রাজদণ্ড ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায়

রাজমাতাই একরূপ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এখনও কল্যাণশেখরের মাতার অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, সাধনাকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু মাতার অনুমতি ব্যতীত তাহা কিরূপে পারিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, এবং কিরূপেই বা মাতার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন, ইহাও সর্ব্বদা তাঁহার মনে উদয় হইত। অবশেষে শ্যামরূপাদর্শনের কথা উপলক্ষে রাজমাতাকে সমস্ত বলিবেন ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের দোহাই দিয়া তাঁহার অনুমতি লইবেন, ইহাই স্থির করিলেন। পঞ্চকূটের রাজপ্রাসাদ ও অন্তঃপুর সন্ন্যাসীঠাকুরের পক্ষে অবারিতদ্বার ছিল। রাজমাতাও নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন।

সেনপাহাড়ী হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাজমাতার সহিত শ্যামরূপা সম্বন্ধে কল্যাণশেখরের সামান্য কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। একদিন আবার তাহা একটু বিশেষভাবে বলিবার জন্য কল্যাণশেখর ইচ্ছুক হইলেন এবং তিনি সন্ন্যাসীঠাকুরের আগমনপ্রতীক্ষাও করিতেছিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া কল্যাণশেখর চিন্তিত হইতেছিলেন।

একদিন রাজমাতা নিজেই শ্যামরূপার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি বলিলেন,—

"কল্যাণ, কৈ ভাল করিয়া ত শ্যামরূপার কথা শুনিতে পাইলাম না ?'

"কয়দিন ধরিয়া বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।"

"শ্যামরূপা খুব জাগ্রত, না ?"

"হাঁ মা তাঁহারই জন্যই সেনবংশের এত প্রতিপত্তি। বল্লালসেন তাঁহারই জন্য দিগ্বিজয় করিতে পারিয়াছেন।"

"তা করুক, কিন্তু পঞ্চকূটে সেনেরা আসিতে পারে নাই।"

"সেও শ্যামরূপার কৃপায়।"

"তা কি ক'রে হবে, তিনি সেনেদের কৃপা করিলে ত তাহারা আসিত।"

"সে বিষয়ে তিনি সেনেদের কৃপা করেন নাই বটে, কিন্তু আমাদিগকে কৃপা করিয়াছেন, এবং আরও করিবেন।"

"তা সেনবংশের কুলদেবতা আমাদিগকে কৃপা করিবেন কেন?"

"তিনি কেবল সেনবংশের কুলদেবতা নন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালার রাজরাজেশ্বরী। যেখানে স্বাধীনতালক্ষ্মী থাকিবেন, তিনি সেই খানেই কল্যাণ বর্ষণ করিবেন। সেনবংশের কুলদেবতা শিখরভূমিরও কুল-দেবতা হইতে পারেন।"

"সে কি কথা, তা কেমন করে হবে?"

"আগে ত বলিলাম যে যেখানে স্বাধীনতালক্ষ্মী থাকিবেন, তিনিও সেখানে থাকিবেন। সেনবংশের স্বাধীনতা যাইতে পারে, কিন্তু শিখর-ভূমির স্বাধীনতা অপহরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। কাজেই মা শিখর-ভূমিতেই কল্যাণ বর্ষণ করিবেন।"

"তোর কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিনা।"

"মনে কর শ্যামরূপা যদি শিখরভূমিতে আসেন?"

"সে আবার কি? তিনি কেমন করিয়া আসিবেন?"

"আমি যদি তাঁহাকে আনিতে পারি?"

"তুই কি বল্লালসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্?"

"না মা তাহা করি নাই।"

"তবে কি করিয়া শ্যামরূপাকে আনিবি?"

"সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু মা, শ্যামারূপা নিশ্চয়ই শিখর-ভূমিতে আসিবেন।"

রাজা কল্যাণশেখর এই কথা কয়টি বলিতে না বলিতে পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিলেন,—

"এবং তিনি হইবেন কল্যাণেশ্বরী।"

রাজা ও রাজমাতা ফিরিয়া দেখিলেন যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন,—

"আপনাদের মঙ্গল হউক। মা কল্যাণেশ্বরী আপনাদের কল্যাণ করুন।"

রাজমাতা বলিলেন,—

"ঠাকুর আপনাদের হিঁয়ালী বুঝিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসীঠাকুর মধ্যে মধ্যে রাজবাটীতে আসায় রাজমাতা তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতেন এবং রাজান্তঃপুর সন্ন্যাসী ঠাকুরের পক্ষে অবারিত-দ্বার ছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসী রাজার অনুসন্ধানে আসিয়া মাতাপুত্রের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন, রাজমাতার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—

"মা, ইহার মধ্যে হিঁয়ালী কিছুই নাই; সত্যসত্যই মাতা শ্যামরূপা মহারাজ কল্যাণশেখর কর্তৃক কল্যাণকুটে আনীত হইয়া কল্যাণেশ্বরী হইবেন।"

"কেমন করিয়া হইবে তাহাই ত হিঁয়ালী।"

"তবে আমি সমস্তই আপনাকে খুলিয়া বলিতেছি, আগে আমি যাহা ভিক্ষা চাহিব, তাহা আমাকে দিবেন, স্বীকার করুন।"

"আপনি যাহা চাহেন তাহা দিতে আমি কবে অসম্মত?"

"সত্য কথা, পুত্রের প্রার্থনা মা সর্ব্বদাই পালন করিয়া থাকেন।"

"এখন আপনার কথা কি বলুন।"

"আমি মহারাজ কল্যাণশেখরকে আপনার নিকট ভিক্ষা চাই।" রাজমাতা চমকিত হইয়া উত্তর করিলেন,—

"কেন তাহাকে সন্ন্যাসী করিবেন নাকি?"

"না মা, তাহা মনেও আনিবেন না। আমি তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিব না, কিন্তু গৃহী করিব।"

এও হিঁয়ালী বলিয়াবোধ হচ্ছে।"

"তবে শুনুন," বলিয়া সন্ন্যাসী আরম্ভ করিলেন,—

মহাপুরুষদিগের আদেশ যে মহারাজ কল্যাণশেখর মাতা শ্যাম-রূপাকে কল্যাণকুটে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন ও তদবধি মা হইবেন কল্যাণেশ্বরী।

"কেমন করিয়া তাঁহাকে আনিবে?"

"তাহাই বলিতেছি শুনুন, যদি মহারাজ কল্যাণশেখরের সহিত বল্লাল সেনের কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে বল্লাল শ্যামরূপাকে যৌতুক দিবেন।"

"কেমন করিয়া তাহা হইবে, সেনেরা যে কি জাতি, তাহার ঠিক নাই। ক্ষত্রিয় বলিয়া শুনা যায় বটে, কিন্তু লোকে তাহাদের সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে।"

"লোকে যা বলে বলুক, কিন্তু তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়; শিখর ভূমির রাজ-বংশের সহিত অনায়াসে তাঁহাদের আদান প্রদান হইতে পারে।"

"যদি তাঁহারা সত্যসত্যই ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই।"

"সে বিষয়ে আমি দায়ী, মা শ্যামরূপা শিখরভূমিতে আসিয়া আপনারই পুত্রের নামে কল্যাণেশ্বরী হইবেন। মায়ের তাহাই ইচ্ছা।"

"মায়ের যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাই হবে। আপনারা বিবাহের আয়োজন করিতে পারেন। বল্লালসেন সম্মত আছেন ত?"

"আছেন" বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাদিগকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। শুনিয়া রাজ মাতাও বিবাহের আয়োজনের আদেশ দিলেন। পঞ্চকুটে মহাধুম পড়িয়া গেল।

খাসিয়া জাতি।

খাসিয়ারা খাসিয়া এবং জয়ন্তী পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগে বাস করে। তাহারা দেখিতে অনেকটা গৌরবর্ণ। উহাদের মুখ প্রায়শঃ বড়, মস্তকের কেশদাম কৃষ্ণবর্ণ, সোজা এবং খুব লম্বা লম্বা। অনেকে মাথার সম্মুখভাগ পশ্চিমবাসিলোকদিগের মত কামায়। তাহারা খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু দেখিবামাত্র অত্যন্ত বলশালী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খাসিয়া শিশু দেখিতে অতিশয় সুন্দর। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা মাথায় করিয়া বড় বড় মোট বহন করিয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করে না। তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। খাসিয়ারা স্বভাবতঃ অতিশয় নম্র কিন্তু একবার রাগিলে আর রক্ষা নাই, শত্রুকে মারিবেই মারিবে। যতক্ষণ না প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে, ততক্ষণ তাহার খোঁজে খোঁজে ফিরিবে। ইহারা পান খাইতে খুব মজবুত। ইহাদের মদ বা আফি-মের উপর খুব ঝোঁক নাই সত্য, কিন্তু জুয়াখেলায় অত্যন্ত আসক্তি আছে। খাসিয়ারা অন্যদেশে অতাল্প প্রচলিত একটি সদ্‌গুণে ভূষিত—সেটী সত্যবাদিতা। মিথ্যাবাদীরা খাসিয়াদিগের নিকট অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র।

যদিও খাসিয়ারা জয়ন্তী পর্ব্বতের নিকট বহুদিনাবধি বাস করিয়া আসিতেছে, তবুও ইহাদিগের পূর্ব্বনিবাস সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্ক আছে। Robert সাহেব তাঁহার "Khasia Grammar"এ লিখিয়াছেন যে, তাহারা হয়ত বর্ম্মাদেশ হইতে আসিয়াছে, কারণ প্রতিবৎসর একখানি কুঠার বর্ম্মাদেশের রাজার নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। আবার অনে-কের মত যে, তাহারা পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলাতে বাস করিত। সেখানে অত্যধিক বন্যা হইলে তাহারা এদেশে আসিয়াছে। বোধ হয় শেষের ঘটনাটি সত্য। খাসিয়াদিগকে দুই রকমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দেখা যায়—

আধুনিক ও প্রাচীন। প্রাচীনকালের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অগ্রে কিছু জানা আবশ্যক। খাসিয়ারা হাতবিবর্জিত এবং গলাকাটা কোট ব্যবহার করে; কিন্তু এরূপ কোটের ব্যবহার ক্রমশঃ হীন হইয়া আসিতেছে। এখন প্রায় অনেকেই ইউরোপদেশীয় কোট ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ব্যবহৃত 'night cap'র মতন তাহাদের টুপি। খাসিয়াদিগের পোষাক অত্যন্ত জাঁকজমক সম্পন্ন না হইলেও অনেকটা সিমশাম। তাহারা আমাদের দেশের চারখানার ন্যায় রেশমী কাপড় পরিধান করিয়া থাকে। আজকাল তাহারা নিকার-বোকার (Knicker bockers) বুট ইত্যাদি ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা সেমিজ্ পরিধান করিয়া থাকে।

তাহারা অলঙ্কারাদির খুব ভক্ত। তন্মধ্যে নেকলেস্ ইহাদের অতিশয় প্রিয় এবং অধিক ব্যবহৃত হয়। উহাদের অস্ত্রের ভিতরে বর্শা, তরবারি ধনুর্ব্বাণ এবং গোলাকার ঢালের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্শাগুলি অত্যন্ত লম্বা এবং এগুলি পশম কিম্বা চুলদ্বারা (নাগাদিগের বর্শার মত) শোভিত হয় না। ধনুর্ব্বাণ স্বভাবতঃ শিকারের সময়েই ব্যবহৃত হয়। যদিও তাহারা ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষিত নহে, তবুও মোটের উপর নিতান্ত মন্দ নয়। সাধারণতঃ বাণ ৩০০।৩৫০ হাত পর্য্যন্ত ছুড়িতে পারে। ঢালগুলি আগে গণ্ডারের চামড়ায় তৈয়ারী হইত, এখন মহিষের চামড়ায় তৈয়ারী হয়। আজকাল ঢালগুলি কেবল দেখানর জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কামান বোমা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেও খাসিয়ারা অত্যন্ত পটু; আগে সোরা, গন্ধক এবং কয়লা দ্বারা বারুদ প্রস্তুত হইত। এখনও জয়ন্তী রাজার দুইটি কামান বর্ত্তমান আছে।

খাসিয়াদিগের অধিকাংশ লোকেই চাষবাস দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। গত Census Report পাঠ করিলে জানা যায় যে, ১৫৪৯০৭ লোক চাষবাসে নিযুক্ত আছে। অবশ্য চাষবাস বলিলে শুধু ধান চালের নয়, আলু, কমলালেবু, সুপারি, পান

প্রভৃতিও ইহার ভিতরে ধরিতে হইবে। এখানে তাঁতির সংখ্যা খুব কম। এতদ্ব্যতীত রাস্তা ও বাটী নির্ম্মাণ করাই তাহাদের প্রধান কাজ। এই সব কার্য্যে বহুলোক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়। তাহাতে পুরুষেরা দৈনিক আট আনা এবং স্ত্রীলোকেরা দৈনিক ছয় আনা হিসাবে মজুরী প্রাপ্ত হয়।

তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ও ঘর বাড়ী।

খাসিয়াদিগের ঘরগুলি প্রায়শঃ ২।৩ ফিট উচ্চ, কাজেই মাঝারি রকম উচ্চের লোক ঘরের ভিতরে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। ঘরের একদিকে একটিমাত্র জানালা থাকে, তাহা আবার অতিশয় ছোট। ঘরের ভিতরে সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। বাড়ীর সম্মুখে একটা জায়গা বেড়া দিয়া ঘেরা থাকে। যখন একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হয়, তখন তাহারা একটি উৎসব সম্পাদন করে। আজকাল ধনী খাসিয়াদিগের বাড়ী অনেকটা পাশ্চাত্যভাবে গঠিত। ছাদটি লৌহের এবং চারিদিকের জানালা দরজা কাচ দ্বারা আবৃত। ঘরের ভিতরে শীতপ্রধানদেশের অনুকরণে একটি চিমনি (Chimney) জ্বালিয়া রাখা হয়। খাসিয়ারা নাগা এবং কুকিদিগের মত পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না, তদপেক্ষা অনেক নিম্নে ঘর বাঁধিয়া থাকে; কারণ তাহারা জানে যে, তাহা হইলে ভীষণ ঝটিকা-পাত ও প্রবলবাত্যা হইতে রক্ষা পাইবে। গৃহগুলি অতি ঘন ঘন ভাবে নির্ম্মিত হয়। তাহাদিগের বাস্তবাটীর উপর একটা অস্বাভাবিক টান আছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাহারা কিছুতেই বাটী ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়ন্তী বিদ্রোহের সময় জোয়াই গ্রাম ধ্বংস হইলে তত্রত্য অধিবাসিগণ যুদ্ধ শেষ হইলে পুনরায় স্ব স্ব বাসভূমির উপর নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে। ভূমিকম্পের পরেও এইরূপ হইতে দেখা গিয়াছে।

মথার গ্রামে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তত্রত্য বিস্তর লোকের বাড়ী ইউরোপদেশীয় সাজসজ্জায় পরিশোভিত। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজদিগের অভ্যুদয়ে তাহাদের আসবাববিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জল প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য খাসিয়ারা সুপক্ক লাউয়ের কঠিন আবরণ দ্বারা প্রস্তুত পাত্রে পান করে। লাউ দ্বারা কিরূপে বাটি প্রস্তুত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। লাউ দুই ভাগে কাটিয়া তাহা হইতে সমস্ত শাঁস তুলিয়া লইলে যে ছাল থাকে, তাহাই বাটির মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে রান্নার জন্য লৌহপাত্র ব্যবহার করে। আমাদের দেশে গরীবলোকে যেরূপ বাঁশ দিয়া মাচা তৈয়ার করিয়া শয়ন করে, এ দেশেও সেইরূপ, কিছুমাত্র বিভিন্নতা দেখা যায় না। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই হুঁকার চলন আছে। ইহারা খুব তামাক খায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খাসিয়ারা অতিশয় সুন্দর কৃষিকার্য্য জানে। একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই উহাদিগের বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহারা বসন্তকালে ফুলবাগান তৈয়ারি করে। বীজগুলি বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। পূর্ব্ব হইতেই দুই খণ্ড জমি পুষ্পোদ্যানের জন্য মনোনীত হইয়া সুন্দররূপে কর্ষিত হইয়া থাকে। একখণ্ড জমিতে উহারা বীজগুলি বপন করিয়া তদুপরি অনবরত জল সেচন করিতে আরম্ভ করে। পরে যখন চারা ৪।৫ ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হয়, তখন ঐ গুলি প্রস্তরবেষ্টিত অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আর এক খণ্ড জমিতে ফাঁক ফাঁক করিয়া রোপিত হইয়া থাকে। এই স্থানে গাছগুলি বড় হইয়া পুষ্পদ্বারা সুশোভিত হয়।

শিকার ও মাছ ধরিবার ফন্দি।

শিকার তাহাদের এক প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য। ইহারা শিকার করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে কি না জানিবার জন্য একটি ডিম ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করে। যাইবার পূর্ব্বে অনেক সময় গ্রামদেবতারও পূজা

করিয়া থাকে। দেবার্চ্চনা শেষ হইলে তাহারা একটি ভাল দিন স্থির করিয়া শিকারে বহির্গত হয়। সঙ্গে অনেকগুলি কুকুর থাকে; কোন শিকারের উপযোগী জন্তু দেখিলে কুকুরকে উহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে ইঙ্গিত করে। শিকার করিয়া যে মাংস পাওয়া যায়, তাহা গ্রাম্যদেবতার্চ্চনা হইলে, তাহারা বিভাগ করিয়া লয়।

ইহা ছাড়া মৎস্য ধৃত করা তাহাদের এক প্রধান আমোদ বলা যাইতে পারে। স্রোতস্বতী নদী বিষাক্ত করা ইহাদের মাছ ধরিবার এক প্রধান উপায়। ইহারা পলই বা জকাই ব্যবহার করে না। অনেক সময় dynamite ফুটাইয়া মাছ ধরা হইত। কিন্তু এ প্রথা এখন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিষ দিয়া মাছ ধরা যদিও খারাপ, তবু dynamite অপেক্ষা শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। কারণ বিষ ব্যবহার করিলে সব মাছ মরে না, অল্প কিছু বাঁচিতে পারে; কিন্তু dynamite ব্যবহার করিলে একটি মাছও অব্যাহতি পায় না।

খাসিয়ারা সাধারণতঃ দুই বেলা আহার করে। কিন্তু যাহারা চাষ-বাস করিয়া খায়, তাহারা দুপুর বেলা আর একবার খায়। ইহারা কুকুরের মাংস ব্যতীত আর সমুদয় মাংসই অতীব রুচির সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। সাধারণ খাদ্যের মধ্যে ভাত এবং শুষ্ক মাছের নাম উল্লেখযোগ্য।

আগেই বলা হইয়াছে যে, খাসিয়ারা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করা ইহাদিগের জাতীয় খেলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে এবং তাহারা জানুয়ারি মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মে মাস পর্য্যন্ত ইহা শিক্ষা করিয়া থাকে।

খেলা, শিল্প ও বাণিজ্য।

আজকাল ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার আড্ডা প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বিদ্যমান আছে। তাহারা আর একটি সর্ব্বজন-পরিচিত খেলা করিয়া থাকে:—একটি মসৃণ বাঁশ পোঁতা হয়। তার পর বাঁশটিকে তেল দিয়া খুব পিচ্ছিল করে। উহা শেষ হইলে বাঁশের উপরে কয়েকটি

টাকা রাখিয়া দেওয়া হয়। যে কেহ বাঁশ বাহিয়া উঠিয়া টাকা লইতে পারে, তাহারই ঐ টাকা হইল।

ইহা ভিন্ন তাহাদের আরও অনেক প্রকার খেলা আছে; যথা—মল্লযুদ্ধ, লুকোচুরি, ঘুড়ি উড়ান, মার্বেল খেলা ইত্যাদি।

পূর্ব্বে খাসিয়ারা শিল্প ও বাণিজ্যকার্য্যে অত্যন্ত নিপুণ ছিল। এক্ষণে সে গুলি আমাদের ভারতের মত দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সে গুলির মধ্যে লোহা গলাইয়া পরিষ্কার করা, এবং অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে যে ইহারা লৌহশিল্পে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে। Colonel Lisker ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যে প্রায় ২০০০০ মণ লোহা আসাম উপত্যকা হইতে রপ্তানি হইয়াছিল।

গত Census Report আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

তন্তুবায় ও কুম্ভকার

ঐ জেলায় ৫৩৬ জন তন্তুবায়ের বাস ছিল। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে রেশমবস্ত্র বয়ন করিতে জানে। বস্ত্রগুলি নিতান্ত মন্দ নয়, গুণানুসারে ৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত এক একখানি কাপড়ের দাম হইয়া থাকে। ইহাদের একখানি বস্ত্র বুনিতে প্রায় ১ বৎসর সময় লাগে, কারণ ইহারা এ বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী।

জয়ন্তী পর্ব্বতে এবং তাহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী ভূভাগে ৫০।৬০ জন মাত্র কুম্ভকার আছে। ইহারা আমাদিগের দেশের মত পাত্রই প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাদিগের তৈয়ারী পাত্রগুলিকে 'খিউরেণি' Khiewranei বলে।

ইহারা আমাদের দেশের কুম্ভকারের মত চাকা ব্যবহার করে না, হাত দিয়াই সকল রকম জিনিস গড়িয়া থাকে। জলপাত্র গুলি প্রায়ই মদের জন্যই ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটি ।০ আনা হইতে ।৵০ পর্য্যন্ত দামে বিক্রীত হয়। পাত্রগুলি প্রথমে রৌদ্রে শুকাইয়া তৎপরে পোড়াইয়া লয়।

খাসিয়া ও জয়ন্তীবাসী লোকদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। খাসিয়া, ছিনটেং, ওয়ার, ভোই এবং লিন্‌গাম্। ইহাদিগকেও আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে অসমগোত্রে বিবাহবিধি একেবারে নিষিদ্ধ নহে, পরন্তু সাকুল্য বিবাহপ্রথাও প্রচলিত আছে। ছিনটেং প্রায়ই ছিনটেংএর ভিতরেই বিবাহ করে। কোন খাসিয়া লিন্‌গাম্‌কে বিবাহ করিলে তাহা তাহার পক্ষে অপমানজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কুলজ বন্দোবস্ত।

খাসিয়াদিগের প্রভুর নাম "সায়েম"। তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি দরবার আছে। দরবারের অনুমোদন ব্যতীত সে কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। দরবারটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাত্র। ইহার ন্যায়ান্যায় সমাধানসম্বন্ধীয় ক্ষমতাও আছে। "সায়েম" সভার মন্ত্রিগণের সাহায্যে দেশের ও রাজ্যের কার্য্য সকল সম্পন্ন করে। আবার অনেক গ্রামে "সরদার" অভিহিত প্রভু আছে। ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন প্রথাও প্রচলিত আছে। "সায়েম" স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় বংশ হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। "খাইরিম" রাজ্যছাড়া আর সমুদয় স্থানেই প্রায় এক রকম। সেখানকার প্রথাটি একটু অন্য রকমের। সেখানে স্ত্রীলোক ধর্ম্মযাজকই সর্ব্বপ্রধান। তাহার বংশজাত পুরুষই রাজা হইবার অধিকারী। এখন প্রায়ই "সায়েম" ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিই ভোট দিতে পারে। পূর্ব্বে "সায়েম"রা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত, এখন আর যায় না। "সায়েম" দরবারের অনুমোদন অনুসারে যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারে।

রাজকীয় বন্দোবস্ত।

এক্ষণে জয়ন্তী পর্ব্বত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জয়ন্তী পর্ব্বতকে বিশভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভক্ত ভাগের উপরে একজন "দোলই" আছে। "দোলইগণ" জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়, তবে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন থাকা চাই। গবর্ণ-

মেণ্ট ইচ্ছা করিলে লোক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত "দোলই"কে পদচ্যুত করিতে পারেন। প্রত্যেক "দোলই" বিচার করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হয়।

খাসিয়াদিগের বিবাহে একটি আশ্চর্য্য পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন আমাদের দেশে স্বামী বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে নিজের বাটীতে আনে, উহাদের পদ্ধতি সেরূপ নয়। স্বামীকে তাহার শ্বাশুড়ীর বাড়ীতে থাকিতে হয়। যত দিন স্ত্রী তাহার মায়ের কাছে থাকে, তত দিন সেই স্ত্রীর উপার্জ্জিত সম্পত্তি সমস্ত তাহার মা পায়।

বিবাহ প্রথা।

তারপর দুই একটি সন্তান হওয়ার পর স্বামী তাহার স্ত্রীকে নিজের বাটীতে আনে এবং তখন হইতে দুইজনের উপার্জ্জিত ধন পরিবার প্রতিপালনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছিন্‌টেংর একটি প্রথা আছে যে স্বামী গতায়ু হইলে স্ত্রী তাহার হাড় নিজের কাছে রাখে; উদ্দেশ্য এই যে সে যেন পুনর্ব্বিবাহ না করে। উহাদের বিশ্বাস যে যতদিন হাড তাহার কাছে থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত স্বামীর আত্মা স্ত্রীর কাছে অবস্থান করে। এইজন্য স্বামীর প্রতি ভক্তিসম্পন্না স্ত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বকই হাড় নিজের কাছে রাখিয়া দেয়। যদি কোন রমণী বিধবা হওয়ার এক বৎসর পরেই আবার বিবাহ করে, তাহা হইলে সকলে তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহার সন্তান সন্ততি একটি উৎসব করিয়া মৃত পিতার হাড় একটি নূতন ঘরে রাখিয়া দেয়। ঘরটী শুধু সেই জন্যই নির্ম্মিত হয়। উৎসবের সময় সেই রমণী তথায় উপস্থিত থাকিতে পায় না। খাসিয়া রমণীগণ যে বহু বিবাহ করিত, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজকাল তাহাদের একটি মাত্র বিবাহপদ্ধতিই প্রচলিত। আগেই বলা হইয়াছে যে, উহাদের অসমগোত্রে বিবাহ বিধি আছে. কাজেই কোন খাসিয়া তাহার নিজের গোত্রে বিবাহ করিতে পারে না। যদি কেহ ঐরূপ করে, তবে তাহাকে এক ঘ'রে করিয়া রাখা হয়, আর তাহার হাড়

গ্রামস্থ সমাধিক্ষেত্রে রাখিয়া দেওয়া হয় না। কোন খাসিয়া তাহার পিতৃব্যের জীবিতকালে তাহার মেয়ে বিবাহ করিতে পারে না, কারণ প্রত্যেক খাসিয়াই পিতৃব্যকে পিতৃতুল্য ভক্তি করে। পিস্তুতো বোনের সঙ্গেও পিতার বর্ত্তমানে বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ। তবে পিতা গতাসু হইলে ঐরূপ বিবাহ হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা অতীব অপমান জনক। স্ত্রী গতপ্রাণা হইলে এক বৎসর পরে শালীকে বিবাহ করিবার পদ্ধতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এরূপ আরও অনেক প্রথা আছে।

Shadwell সাহেব লিখিয়াছেন খাসিয়াদিগের বিবাহ কেবল সুব্যবস্থিত চুক্তি মাত্র।"কিন্তু এ কথা সত্য নয়; কারণ তাহারা বিবাহের পূর্ব্বে ঈশ্বরের এবং মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের আহ্বান করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে ত্রিবিধ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে —(১) পিন্হিয়ার ছিন্জট্ (২) ল্যাম্ড (৩) ইয়াজিদ্ কিয়াদ্; ইহার মধ্যে তৃতীয় প্রথাটি গরীব ব্যক্তিদিগের মধ্যেই প্রচলিত। কারণ প্রথম দুইটি প্রথাই বহুব্যয়-সাপেক্ষ।

বিবাহের আনুক্রমিক ঘটনা।

সতর আঠার বৎসর বয়সের বালক এবং ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকা উহাদের মতে বিবাহের উপযুক্ত। যুবকের সহিত পরিচয় আছে এরূপ রমণীর সঙ্গেই প্রায়ই বিবাহ হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় ছেলেই পিতা বা খুড়াকে মেয়ের কথা বলে। অবশ্য ঠিক হওয়া পিতামাতার মতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মেয়ে পছন্দ হইলে পরিবারের কোন পুরুষ অথবা আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি মেয়ের বাড়ীতে অন্যান্য বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে যায়। বন্দোবস্তের সময় মেয়ের সঙ্গে ছেলের গোত্রে বাধে কি না তাহা বিশেষরূপে দেখিতে হয়। যদি গোত্রে না বাধে বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্তের জন্য একটি দিন ঠিক হয়। নির্দ্ধারিত দিবসে একটি ডিম্ব ভাঙ্গিয়া এবং কুকুটের নাড়ীভুঁড়ী পরীক্ষা করিয়া বিবাহের শুভাশুভ দেখা হইয়া থাকে। যদি কিছু অশুভ বোধ

হয়, তবে আর সে দুজনের মধ্যে বিবাহ হয় না। কারণ তাহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, তাহা হইলে মেয়েটী বন্ধ্যা হইবে অথবা অল্প বয়সেই কন্যাটী কালগ্রাসে পতিত হইবে। যদি ফল শুভজনক হয়, তবে বিবাহের দিন ঠিক হয়। বিবাহের দিন বরের ও কন্যার হাতে একটি রূপার আংটি থাকে। বর কন্যার হাতে আংটিটী পরাইয়া দেয়, আবার বরের হাতে কন্যাটিও ঐরূপ আংটি পরাইয়া দেয়। এ পদ্ধতি আর এখন বেশী জায়গায় প্রচলিত নাই। বিবাহের নির্দ্ধারিত দিনে বর লাল কিম্বা সাদাপাগড়ী মাথায় দিয়া তাহাদিগের পক্ষের মধ্যস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ও আরও অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কন্যার বাটীর অভিমুখে যাত্রা করে। কন্যার বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে কন্যাপক্ষীয় লোকজন আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়। সর্ব্বাগ্রে মধ্যস্ত ব্যক্তি, তারপরে বর এবং সর্ব্বশেষে অন্যান্য জনসমূহ মেয়ের বাড়ীতে পদার্পণ করে। বরপক্ষীয় মধ্যস্ত ব্যক্তি মেয়ের বাপের বা পিতৃব্যের নিকট বরকে সমর্পণ করে। সে বরকে লইয়া গিয়া কন্যার পার্শ্বে বসায়। সেখানে দুজনে সুপারি বদলাবদলি করে; তারপর দুইপক্ষীয় মধ্যস্থ ব্যক্তি কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করে। ইহাই তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবাহ-পদ্ধতি।

দাম্পত্যবিচ্ছেদ।

দাম্পত্যবিচ্ছেদপদ্ধতি খাসিয়াদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত আছে এবং তাহা ত্রিবিধ কারণে হইতে পারে।—ব্যভিচার, বন্ধ্যাত্ব ও মনের অমিলন। খাসিয়াদিগের ভিতর নিয়ম এই যে, যে কোন কাজে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সম্মতি থাকা চাই। প্রায়ই দেখা যায় যে, একজনের অমত হয়। যখন স্ত্রী দাম্পত্যবিচ্ছেদে বা স্বামীর সঙ্গে থাকিতে অমত প্রকাশ করে, তখনই কিছু মুস্কিল। সেই সময় গ্রাম্য প্রতিবেশিগণ তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন। স্বামিস্ত্রীতে দাম্পত্যবিচ্ছেদ হইলে আর তাহাদের দুজনের মধ্যে বিবাহ হয় না, তবে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে হইতে পারে। কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় বর্জ্জন করিতে পারে না। দাম্পত্যবিচ্ছেদের সময় দুইপক্ষেরই

আত্মীয় উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক স্ত্রী স্বামীকে ৫ পয়সা দেয়। স্বামী আবার সেই ৫ পয়সা এবং তাহার ৫ পয়সা সর্ব্বশুদ্ধ ১০ পয়সা স্ত্রীকে দেয়। স্ত্রী তারপরে সেই ১০টি পয়সা স্বামীকে ফিরাইয়া দেয়। সে উহা মাটীতে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া থাকে। তখন একজন লোক গ্রামের ভিতরে চাৎকার করিয়া তাহাদের দাম্পত্যবিচ্ছেদের ঘটনা রটাইয়া দেয়; যদি এই স্ত্রীকে কেহ বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহার সন্তান সন্ততির তাহার সম্পত্তির প্রতি কোনরূপ দাবী থাকে না।

পোষ্যপুত্র গ্রহণ।

যদি কোন পরিবার স্ত্রীলোক-শূন্য হইয়া যায়, তবে ঐ পরিবারের পুরুষেরা অন্য পরিবার হইতে স্ত্রীলোক আনয়ন করিয়া থাকে এবং সে ঐ পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় এবং বাটীর কর্ত্রী হইয়া থাকে। পোষ্যপুত্রগ্রহণের সময় আমাদের মত তাহাদের কোনরূপ উৎসব করিতে হয় না। যদি কোন পরি-বার স্ত্রীলোক-শূন্য হয় তবে সেই পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি "সায়েমের" হস্তগত হয়। কাজেই পরিবারের মঙ্গলের জন্য উহারা অন্য পরিবার হইতে স্ত্রীলোক আনয়ন করিতে বাধ্য হয়।

বিবাদ মীমাংসা।

বাদী প্রথমে "সায়েমের" নিকট তাহার অনিষ্টকারী লোকদিগের নামে নালিশ করে। তৎপরে সমস্ত ঘটনাটি তাহার কাছে কথিত হয়। সে প্রথমে বিবাদ আপোষে মিটাইবার চেষ্টা করে, যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে একজন লোককে পরদিন সন্ধ্যার সময় দরবার হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতে হুকুম দেয়। হুকুম প্রচারিত হইলে হইলে কোন লোক তারপর দিন ঐ গ্রাম হইতে কোথাও যাইতে সক্ষম হয় না। যদি কেহ ইহার অমান্য করে, তবে তাহাকে জরিমানা দিতে হয়। পরদিন সন্ধ্যাকালে সমস্ত গ্রাম্যব্যক্তি যথা সময়ে দরবারস্থলে উপস্থিত হয়। জনসমূহ সমবেত হইলে এক-জন প্রধান ব্যক্তি ঐ মোকর্দ্দমা বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করে।

ক্রমে ক্রমে আরও দুই চারিজন ঐ বিষয়ে বক্তৃতা করে। তারপর অভি-যোক্তা এবং প্রতিবাদী দুইজনেই দরবারের সম্মুখে কিঞ্চিৎ চুণ, সুপারি এবং পান ফেলিয়া দেয়। অবশ্য উভয় পক্ষেরই উকীল নিযুক্ত হয়। তাহারা অতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমবেত লোকদিগকে ঘটনাটি বুঝাইতে এবং প্রতিবাদীর উকীল তাহার মক্কেলের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে। অনেক সাক্ষীর জবানবন্দীও লওয়া হয়। এই মোকদ্দমায় "সায়েম" জজ এবং উপস্থিত জনবৃন্দ জুরির কাজ করে। হয় প্রতিবাদীর জরিমানা, না হয় জেল হইয়া থাকে এবং এতদ্ব্যতীত প্রতিবাদীকে একটি শূকরের ছানা দিতে হয়। ইহাদের বিশ্বাস যে ঐ শূকরছানা রাজলক্ষ্মীর জন্য বলি হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শূকর শাবকটি "সায়েম" এবং দরবারস্থিত জনসমূহের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আর সব বিষয়ের মোকদ্দমাই "সায়েম" কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হয়। আগে 'জল পরীক্ষা' দ্বারা বিবাদ মীমাংসা হইত। এখন সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

খাসিয়ারা অতীব কুসংস্কারাত্মক। তাহারা ইহার মোহে লোক খুন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এ বিষয়ে অতি সুন্দর সুন্দর গল্প আছে।

অত্যন্ত কুসংস্কারপূর্ণ।

Gait সাহেব "Journal of the Asiatic Society of Bengal" Vol I of 1898এ একটি সুন্দর ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

খাসিয়াজাতি প্রায়ই কোন একজন ঈশ্বর আছেন মানে না, তবে বিপদের সময় অনেক ভাল মন্দ আত্মার পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, যে সব পূর্ব্বপুরুষগণের যথানিয়মে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহারা স্বর্গে ঈশ্বরের বাগানে যায়, ঐ সব বাগানে বিস্তর সুপারি গাছ আছে। সেই জন্য উহারা নিরতিশয় আনন্দের সহিত সর্ব্বদা সুপারি ও পান চর্ব্বণ করিয়া থাকে। তাহারা আরও বিশ্বাস

করে, যে সব পূর্ব্বপুরুষগণের ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদিত না হয়, সে সব ব্যক্তিগণ পশুপক্ষীর আকারে পরিণত হয় এবং পৃথিবীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। বোধ হয় ইহারা দেহান্তরবাদ হিন্দুদিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা নরক বলিয়া কোন জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। আমাদের যেমন পূর্ব্বপুরুষগণকে পিণ্ডদান দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, খাসিয়ারাও সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের দৃঢ় ধারণা যে, তাহা হইলে তাঁহারা বিপদের সময় রক্ষা করিবেন। জাপানাদিগেরও এই বিশ্বাস দৃষ্টিগোচর হয়। উহাদের বদ্ধমূল ধারণা, যে সব লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহারা যুদ্ধ করিতেছে এরূপ সহচরদিগকে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে।

পারলৌকিক অনুষ্ঠান।

পারলৌকিক অনুষ্ঠান খুব বেশী জাঁকজমকসম্পন্ন না হইলেও তাহার একটু গুরুত্ব আছে। বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হইলে, পরিবারের ভিতরে যে কোন ব্যক্তি ঐ লোকটী যে সত্য সত্যই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে সেটি নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে মৃতলোকের কাণের কাছে বসিয়া তিনবার তাহার নাম উচ্চারণ করে। যদি কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়া যায়, তবে পরিবারবর্গ স্থির করে যে, লোকটী সত্য সত্যই মরিয়াছে, তখন তাহারা দুঃখ করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে দেহটী মাটির পাত্রে রক্ষিত গরমজলে ধোয়াইয়া রাখা হয়। ধনী লোকে মৃতব্যক্তির কাণ এবং শরীরের অন্যান্য স্থান বহুমূল্য অলঙ্কার এবং বহুমূল্য বস্ত্রদ্বারা পরিশোভিত করে। তৎপরে একটি কুক্কুট বলি দেওয়া হয়; তাহাদের বিশ্বাস যে, সে মৃতব্যক্তির জন্য স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। মৃতদেহটি সাধারণতঃ তিন দিন রক্ষিত হইয়া থাকে। এই তিন দিন দুই বেলা তাহাকে আহার দেওয়া হয়। তিন দিন পরে মৃতদেহটি দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাইবার সময়, রাস্তায় টাকাকড়ি ছড়ান হয়। যখন মৃতদেহটী সম্পূর্ণরূপে দাহ করা হইয়া যায়, তখন

অগ্নি জল দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়। ইহা ছাড়া অন্যের দ্বারা আহত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে বা হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাহার বিভিন্ন ব্যবস্থা ও নিয়ম আছে।

সকল দেশেই উপকথা প্রচলিত আছে। খাসিয়াদিগের যে নাই তাহা নহে। কেবলমাত্র একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চন্দ্রে কেন কাল কাল দাগ নেত্রগোচর হয় —একদা কোন স্থানে একটি স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার ৪টী সন্তান ছিল। তন্মধ্যে তিনটী মেয়ে ও একটি ছেলে। ছেলেটির নাম চন্দ্র ও মেয়েদের নাম সূর্য্য, জল ও অগ্নি। চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বড়। চন্দ্র অত্যন্ত দুষ্ট ছেলে কারণ সে সূর্য্যকে বিষ-দৃষ্টিতে অবলোকন করিত। প্রথমে চন্দ্রে ও সূর্য্যে অত্যধিক ভাব ছিল। কিন্তু যখন সূর্য্য চন্দ্রের মন্দ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল, তখন সে অত্যন্ত কোপান্বিতা হইল। তৎপরে একমুঠো ছাই হাতে করিয়া চন্দ্রকে বলিল "আমি তোমার বড় বোন, আর তুমি আমার প্রতি ঐরূপ কু-অভিসন্ধি মনে স্থান দেও? তুমি কি জাননা যে, আমি তোমাকে কতদিন মায়ের মত পিঠে করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছি? আজ তোমার শাস্তিস্বরূপ আমি তোমার কপাল ছাই দ্বারা আবৃত করিব। তুমি বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাও"। সেই সময় হইতে চন্দ্র শুভ্রকিরণ জগতে ছড়াইতে আরম্ভ করিল; কারণ সূর্য্য তাহাকে ছাই দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছে। যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় তখন আমরা যে চন্দ্রে কাল কাল দাগ দেখিতে পাই সে দিবাকরদত্ত ছাই ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পর হইতে তিনটী বোন মায়ের কাছে থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। *

শ্রীতিনকড়ী আচার্য্য।

---

* এ প্রবন্ধটী Gurdon সাহেব কৃত "The Khasis" অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক চিত্র।

একটি নৃশংস হত্যা।

মুর্শিদাবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকাল অত্যন্ত অশান্তিময় বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র হাহাকার আনয়ন করিয়াছিল। আফগানগণের বিদ্রোহেও সর্ব্বত্র অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সুধীর ও সুবীর আলিবর্দ্দীকে প্রতিনিয়ত এই শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গরাজ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদের তিন পুত্র, নওয়াজিস মহম্মদ, সৈয়দ আহম্মদ ও জৈনুদ্দীন আহম্মদের সহিত তাঁহার তিন কন্যা ঘসিটী বেগম বা মেহের উন্নিসা, আয়মানা ও আমিনার বিবাহ হয়। নবাব, নওয়াজিসকে ঢাকার, সৈয়দ আহম্মদকে প্রথমে উড়িষ্যার পরে হুগলীর অবশেষে পূর্ণিয়ার, এবং জৈনুদ্দীনকে পাটনা বা আজিমাবাদের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। নওয়াজিস ঢাকার শাসনকর্ত্তা হইলেও সাধারণতঃ মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেন, এবং ধনরত্নে তিনি ও সৈয়দ আহম্মদ আপন আপন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। জৈনুদ্দীন ভাগ্যলক্ষ্মীর সেরূপ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। জৈনুদ্দীনের দুই পুত্র সিরাজউদ্দৌলা ও এক্রামউদ্দৌলা যথাক্রমে আলিবর্দ্দী ও নওয়াজিস মহম্মদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া তাঁহাদের দ্বারাই লালিতপালিত হইয়াছিলেন;

সিরাজউদ্দৌলাই পরে মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলা এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি ভাস্কর পন্তের আক্রমণে আলিবর্দ্দী খাঁ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি ভাস্করকে নিহত ও রঘুজীকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিয়া কিছু দিনের জন্য বিশ্রামলাভে সমর্থ হন। তাঁহার আফগান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া আজিমাবাদ আক্রমণ করায় নবাব তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিতে বাধ্য হন। মুস্তাফা খাঁর পরাজয়ের পর অন্যান্য আফগান সেনাপতি সমসের খাঁ, সর্দ্দার খাঁ প্রভৃতিও বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করায় নবাব তাহাদিগকেও বিদায় প্রদান করেন। তাহারা বিহার প্রদেশে উপস্থিত হইয়া এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে নবাব মহাসমারোহে সিরাজউদ্দৌলা ও এক্রামউদ্দৌলার বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই সমারোহে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই মুর্শিদাবাদে সমাগত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, জৈনুদ্দীন আহম্মদও তথায় আগমন করিয়াছিলেন।

জৈনুদ্দীন আহম্মদ খাঁ সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতির বিবাহের পর মুর্শিদাবাদ হইতে পাটনায় প্রত্যাগত হইয়া মনে মনে এক অভিসন্ধি স্থির করিতেছিলেন। মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে নওয়াজিস মহম্মদ ও সৈয়দ আহম্মদের অপর্য্যাপ্ত ধন রত্নের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি তাঁহাদিগকে এই প্রকারে সম্ভ্রান্ত হইতে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দীর বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের অপর্য্যাপ্ত অর্থ থাকায় নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহারা তদ্দ্বারা সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাছে সিংহাসন অধিকারে কৃতকার্য্য হন, এই আশঙ্কায় জৈনুদ্দীন এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই সময়ে সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ এবং তাঁহাদের অধীন আফগানগণ দরভাঙ্গা প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জৈনুদ্দীন নওয়াজিস মহম্মদ ও সৈয়দ

আহম্মদকে আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বল মনে করিতেন, এক্ষণে যদি তিনি কোন প্রকারে সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁকে নিজ সৈন্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সাহস ও পরাক্রম দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মীর আবদুল আলি নামক এক ব্যক্তিকে নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। আবদুল আলি পূর্ব্বে অযোধ্যার নবাব উজীর সদত খাঁর অধীনতায় কার্য্য করিতেন, কিন্তু এক্ষণে আজিমাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি জৈনুদ্দীন আহম্মদের প্রার্থনা লইয়া নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে শীতকাল আরম্ভ হওয়ায় নবাব সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের নিকট আমানিগঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা মেদিনীপুর প্রদেশে তখনও পর্য্যন্ত যাতায়াত করায় তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদানের জন্য তাঁহার উদ্যোগ হইতেছিল। আবদুল আলি নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া জৈনুদ্দীনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিলেন যে, সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ উভয়ে যেরূপ দুর্দ্দান্ত তাহাতে তাহাদিগকে রাজ্য হইতে সহসা বহিষ্কৃত করা কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ তাহারা যেরূপ ভাবে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিতেছে, তাহাতে ঐরূপ ভীষণ ব্যক্তিদিগকে রাজ্য মধ্যে বাস করিতে দেওয়াও কোন ক্রমে নিরাপদ নহে। সেই কারণে তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাহাদিগকে যদি পুনর্ব্বার সৈনিক দলের অন্তর্নিবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারে। এই বিবেচনায় তিনি তাহাদিগকে তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ নিজ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু আজিমাবাদ হইতে অতিরিক্ত সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ সুকঠিন বলিয়া তিনি বাঙ্গলার রাজকোষ হইতে তাহাদের ব্যয় প্রদানের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন। নবাব প্রথমতঃ এই প্রস্তাব শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠেন, তিনি কোন মতেই স্বীকৃত হইতে ইচ্ছা করেন নাই ; পরে অনেক বিবেচনার পর পাছে জৈনুদ্দীন দুঃখিত হন, ইহা মনে

করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করেন। আবদুল আলি সন্তুষ্ট চিত্তে আজিমাবাদে উপস্থিত হইয়া জৈনুদ্দীনকে শুভসংবাদ প্রদান করিলেন। হাজী আহম্মদ সেই সময়ে আজিমাবাদে ছিলেন। সমসের খাঁর সহিত মহারাষ্ট্রীয় পক্ষভুক্ত মীর হাবীবের কথাবার্ত্তা পরিচালিত হইতেছিল এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তিনি জৈনুদ্দীনকে তাহাদিগের দমন জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। হাজী স্বীয় পুত্রকে ভূগর্ভে বারুদ প্রোথিত করিয়া আফগানদিগকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ দেন। (১) কিন্তু জৈনুদ্দীন তাঁহার সে পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের বলবতী আশা হাজী কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবেন? বৃদ্ধ হাজী কেমন করিয়া বুঝিবেন যে, তাঁহার পুত্র মুর্শিদাবাদ সিংহাসনলোভে পূর্ব্ব হইতে সোপান প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, জৈনুদ্দীনের হৃদয়ে ইহা ক্ষণমাত্র স্থান পায় নাই যে, তাঁহার এই উদ্যোগে অবশেষে তাঁহাকে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তিনি যেরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় নরহন্তা, বিশ্বাসঘাতক, শোণিতলোলুপ আফগানদিগকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহার ফলভোগ করিয়া শেষে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবদুল আলির নিকট নবাবের আদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি আফগানদিগের সহিত মিলনের জন্য ব্যগ্র হইলেন।

জৈনুদ্দীন সময়ক্ষেপ না করিয়া আগা আজিমাই, তকী কুলী খাঁ এবং মহম্মদ আস্কার খাঁ নামক তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আফগানদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা জৈনুদ্দীনের প্রস্তাব উত্থাপিত করিবামাত্র আফগানগণ আনন্দসহকারে তাহাতে স্বীকৃত হইল, এবং তাহাদের যাহা যাহা বক্তব্য সমস্তই প্রকাশ করিল। এইরূপে উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা স্থিরীকৃত হইলে, আফগানগণ সমবেত হইয়া গঙ্গার অভিমুখে যাত্রা

(১) Orme Vol II P. 40

করিয়া আজিমাবাদের অপর পারে উপস্থিত হইলে জৈমুদ্দীনের লোক সকল ও আজিমাবাদবাসিগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইল। সমসের খাঁ ও তাঁহার ভাগিনেয় মোরাদ সের খাঁ, সর্দ্দার খাঁ এবং বক্সী বোয়াসিয়া এই চারি জনে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহারা দরবারে গমন করিতে ভীত হইতেছিলেন, কারণ নবাবের ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জৈমুদ্দীনের রাজত্বের প্রারম্ভে আবদুল করীম খাঁ ও রোসেন খাঁর আকস্মিক হত্যায় তাঁহাদের হৃদয় ভয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। জৈমুদ্দীন তাঁহাদের ভীতির কথা অবগত হইয়া এবং তাহারও কিছু মূল থাকায় তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানের জন্য নিজে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আপনার গমনের কথা কাহাকেও অবগত করান নাই। আফগানগণ নগরের নিকট অবস্থিতি করিতেছে জানিয়া নিজের উদার ব্যবহার প্রদর্শনের জন্য তাহাদিগের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন। কেবল মাত্র স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র মির্জ্জা মেহেদী, মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দআলি খাঁ (১) ও স্বীয় প্রিয়পাত্র মহম্মদ আস্কার খাঁকে সঙ্গে লইয়া বিশ ত্রিশটী ক্ষেপণীযুক্ত মনোরম নৌকায় আরোহণ করিয়া আফগানদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত নিজের রক্ষিবর্গ, সৈন্য বা অনুচর কেহই গমন করিতে আদিষ্ট হয় নাই। জৈমুদ্দীন নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সমসের খাঁর শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমসের খাঁ, জৈমুদ্দীনের আগমন শ্রবণ করিয়া নিজ শিবির হইতে বহির্গত হইয়া অবতরণঘাটে তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া নিজের শিবিরে আনয়ন পূর্ব্বক মসনদে উপবেশন করাইয়া রীতিমত নজরাদি প্রদান করিয়া, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সেলাম করিয়া অধীন ভৃত্যের ন্যায় দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই মোরাদ সের খাঁ কতিপয় আফগান কর্ম্মচারীর সহিত

(১) সৈয়দ আলির সহিত জৈমুদ্দীনের এক কন্যার বিবাহ স্থিরীকৃত হয়।

তথায় আগমন করিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে শিবির আফগান সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই জৈনুদ্দীনকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। মোরাদ সের খাঁ উপবিষ্ট হইয়া সমসের খাঁকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই সময়ে জৈনুদ্দীনকে আক্রমণ করা উচিত কি না। সমসের খাঁ নিজ শ্মশ্রু-কণ্ডূয়নচ্ছলে তাহাতে হস্ত প্রদান করিয়া মস্তক ভঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিলেন। জৈনুদ্দীন এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি আফগানদিগের প্রতি এতদূর আসক্ত হইয়া ছিলেন যে, তাঁহার সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি যেন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষের লোকদিগের মধ্যে দুই একজন তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সমসের খাঁ তাঁহার কার্য্যগ্রহণের চিহ্নস্বরূপ জৈনুদ্দীনকে কতিপয় হস্তী ও অশ্ব প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলে, তিনি তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আপনার প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং নৌবিভাগের অধ্যক্ষকে আফগানদিগকে পার করিবার জন্য কতিপয় নৌকাপ্রদানের আদেশ দিলেন।

আফগানগণ নদী পার হইয়া জাফর খাঁর উদ্যানে সমবেত হইল। জৈনুদ্দীন তাহাদিগকে দেখিবার জন্য দুই একজন মাত্র অনুচরসহ শিবিকারোহণে নাজিম উদ্দীনের মহল্লা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে সর্দ্দার খাঁ তাঁহার সৈন্য সহিত উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। সর্দ্দার খাঁ, সমসের খাঁ ও মোরাদ সেরের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন না। তিনি নিজ মুখে সা মহম্মদ জামিন ও সা রস্তম আলি নামক দুই জন ফকিরের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি এই বিষয়ের বিন্দুমাত্র জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু জৈনুদ্দীনের হত্যার পর তিনি কি কারণে তাহাদিগের সহিত থাকিতে বাধ্য হন, তাহার উত্তর এই প্রকার প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদি এক্ষণে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অনিষ্ট হইবার

সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় আফগানগণ তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিবে। আফগাননামের সম্মানরক্ষার জন্যই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে হইতেছে; কিন্তু ইহা তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। সর্দ্দার খাঁ ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইতে না পারেন, কিন্তু জৈনুদ্দীনের হত্যার পর তিনি আফগানদিগের সঙ্গী হইবার যে কারণ প্রদর্শন করেন, তাহা নিতান্ত অযুক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। জৈনুদ্দীনের হত্যার পর নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, যে যদি আফগানগণ আজিমাবাদের সর্ব্বে সর্ব্বা হইতে পারে, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হইবে না। যাহা হউক তিনি সমসের ও মোরাদ সেরের ন্যায় যে নৃশংস ছিলেন না, তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে উপলব্ধ হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা জৈনুদ্দীনের প্রাসাদে গমন করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। ইতিমধ্যে মেহেদী নেসার খাঁ সেরেফ ও কুটুম্বা প্রদেশের জমীদারদিগকে দমন করিবার জন্য গমন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য কাদেম হোসেন খাঁ, আমেদ খাঁ কুলী, রাজা সুন্দর সিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণও গমন করিলেন। আফগানেরা তাঁহাদের গমনে মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। জৈনুদ্দীনের সহিত তাহাদের সাক্ষাতের দিন স্থিরীকৃত হইলে, জৈনুদ্দীন আফগানদিগের প্রতি নিজের বিশ্বস্ততা প্রতিপাদনের জন্য এই-রূপ আদেশ ঘোষণা করিলেন যে, দরবারদিবসে কোন সৈন্য কি সৈনিক-কর্ম্মচারী এবং যুদ্ধসংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। তাঁহার এইরূপ আদেশে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন; তাঁহার নিকট হইতে কেন যে এইরূপ আদেশ বাহির হইল তাহাও বুঝিয়া উঠা যায় না। অথবা তাঁহার যে আয়ুঃ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর যেন তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাইয়াছিলেন। ফলতঃ আফগানদিগের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিতে তিনি যেন অন্ধবৎ আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অনুকরণ

করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু নবাব অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধিশক্তি তীক্ষ্ণ না হওয়ায়, তিনি নিজের সরলতা প্রকাশ করিয়া লোকের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া অনেক সময়ে অকৃতকার্য্য হইতেন। এক্ষণে আফগানদিগের প্রতি এক বিষম অন্ধ বিশ্বাস তাঁহাকে সারল্য প্রদর্শনে প্রণোদিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ আবিষ্কৃত করিয়া তুলিল। আমরা নিম্নে সেই ষড়যন্ত্রকারীদিগের হস্তে কিরূপে তাঁহার নৃশংস হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিতেছি।

দরবারের পূর্ব্ব দিবসে সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ আপন আপন লোক জন সমভিব্যাহারে প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া শাসনকর্ত্তাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলে জৈনুদ্দীন তাঁহাদিগকে রীত্যানুযায়ী তাম্বূল প্রদান করিয়া সে দিবস বিদায় দিলেন। পর দিবস দরবার হইবার দিন। জৈনুদ্দীন চেহেলসেতুনে (১) উপবিষ্ট হইয়া আফগানদিগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আজিমাবাদের চেহেলসেতুন তাঁহার নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়ে নির্ম্মিত হয়। তাঁহার পার্শ্বেই তাঁহার প্রিয়পাত্র মহম্মদ আস্কার খাঁ, মীর মর্ত্তেজা, মীর বেদরালদাহী, প্রধান চর মুরলীধর এবং সেলাখানার দারোগা রমজানী, গোলন্দাজ সেনার খাজাঞ্চী সীতারাম উপবিষ্ট হন। কতিপয় চোপদার ও অনুচর দণ্ডায়মান হইয়া আদেশ-পালনে অপেক্ষা করিতেছিল। এতদ্ভিন্ন মীর আবদুল্লা নামক আজিমাবাদের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সা বন্দেসী নামক একজন ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান, মাতাব রায় নামক মহম্মদ আস্কারের প্রতিপালিত একজন ক্ষত্রিয়সন্তান ও অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত নগরবাসী তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কাহারও হস্তে একখানি তরবারি অথবা কটিদেশে একখানি সামান্য ভূজালি পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল না। কেবল রমজানীর হস্তে তদীয় পদ-গৌরবসূচক একখানি তরবারি মাত্র ছিল। রামনারায়ণ ও কতিপয়

(১) চত্বারিংশ স্তম্ভযুক্ত দরবার গৃহ।

মুৎসুদ্দী চেহেলসেতুনের নিকট মুন্সীখানায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিছু দূরে এনায়েৎ ভাইজান নামক একজন প্রধান ভৃত্য কৌতুক দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান থাকে। আফগানেরা নিকটবর্ত্তী হইলে প্রথমতঃ বক্সী বোয়ালিয়া প্রায় সহস্র আফগানের সহিত উপস্থিত হইয়া দূর হইতে শাসনকর্ত্তাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিল। উক্ত আফগানদিগের বন্দুকাদি সমস্ত বারুদ ও গুলি পরিপূর্ণ ছিল। আফগানগণ ভিত্তির এক-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে বক্সী বোয়ালিয়া কতিপয় ব্যক্তির সহিত অগ্রসর হইয়া জৈমুদ্দীনকে কুর্নিশ করিয়া আপনার নজর প্রদান করিল। তাহার পর পাপিষ্ঠ মোরাদ সের পঞ্চশত আফগানের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা সকলেই সশস্ত্র এবং ঘনকার্পাসপূর্ণ অঙ্গত্রাণে ভূষিত। তাহারা দূর হইতে সম্মান প্রদর্শন করিলে, মোরাদ সেরও কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত অগ্রসর হইয়া কুর্নিশ করিয়া নজর প্রদান করিল।

এই সময়ে শাসনকর্ত্তা, সমসের খাঁর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর দিল যে, তিনি অবিলম্বেই আগমন করিবেন। তাহার অব্যবহিত পরেই সমসের খাঁ কোতোয়ালের চবুতরার নিকট শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার সহিত প্রায় তিন চারি সহস্র দুর্দ্দান্ত আফগান ছিল। তাহারা গৃহ হইতে রাজপথ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রহিল। মোরাদ সের সকলকে পৃথক করিয়া নবাগতদিগের জন্য পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। জৈমুদ্দীন তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য স্বহস্তে তাম্বূল বিতরণ করিতে লাগিলেন। কতিপয় লোকে গ্রহণ করিলে পর আবদুল রসীদ খাঁ নামক এক ব্যক্তির সময় উপস্থিত হইল। ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, এই ব্যক্তিই প্রথমতঃ জৈমুদ্দীনকে আঘাত করিবে। তাম্বূল গ্রহণের সময় আবদুল রসীদের হস্ত কম্পিত হওয়ায় তাম্বূলটী তাহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। পতনকালে জৈমুদ্দীন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বলিলেন, দেখিতেছি যে, এ তাম্বূলটী তোমার অদৃষ্টে নাই।

তাহার পর যেমন তিনি তাম্বূলপাত্র হইতে তাম্বূল গ্রহণ করিবেন, অমনি পাপাত্মা আপনার কাটারী দ্বারা তাঁহার পার্শ্বে আঘাত করিল, কিন্তু তাহার হস্ত কম্পিত হওয়ায় সে আঘাত ব্যর্থ হইয়া যায়। মহম্মদ আস্কার খাঁ উক্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া 'বিশ্বাসঘাতক! কি ভয়ানক বিদ্রোহিতা!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। জৈনুদ্দীন নিজের সম্মুখস্থ তরবারিতে হস্ত প্রদান করিয়া কি ঘটনা দেখিবার জন্য যেমন মস্তক উত্তোলন করিবেন, অমনি আবদুল রসীদ স্বীয় তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া এক আঘাতে তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। জৈনুদ্দীন তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎস্থিত উপাধানের উপর পতিত হইলেন। তাহার মুহূর্ত্ত পরেই উক্ত পাপাত্মা কিংবা অপর কেহ জৈনুদ্দীনের মস্তক ও দক্ষিণ পদ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে।

মীর মর্ত্তেজা জৈনুদ্দীন আহত হইয়াছেন শ্রবণমাত্র যেমন তাঁহার নিকট অগ্রসর হইবেন, অমনি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যান। মহম্মদ আস্কার আপন প্রভুর তরবারি লইয়া কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও অবশেষে দ্বিখণ্ডিত হন। মাতাব রায় আহত হইয়া স্বীয় উপকারকের মস্তক স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া বসিয়া বসিয়া বহুকষ্টে তথা হইতে প্রস্থান করেন। পাতসা নাবেজ খাঁ নামক জনৈক মনসবদার যেমন সেই নরহন্তাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিবেন, অমনি অসংখ্য তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া যান। রমজানী ও সীতারাম দুই জনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়া সেই দুর্দ্দান্তগণের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। মুরলীধর ও মীর বেদেরেলদাহী আপনাদের হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপে পলায়ন করেন। রামনারায়ণ ও অন্যান্য মুৎসুদ্দীগণ এবং মীর আবদুল্লা প্রভৃতি আহত হইয়া অনেক কষ্টে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। সা বন্দেসী সেই স্থানে ধরাশায়ী হন। সকলেই আপন আপন প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর রক্ষিগণ আপনাদিগের

কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেনের ভ্রাতা সৈয়দ আলি অন্তঃপুর মধ্যে পলায়ন করেন। এই সময়ে জৈমুদ্দীনের পত্নী আমিনা বেগম অন্তঃপুরের দ্বাররুদ্ধ করিবার অনুমতি দেন। তাঁহার আদেশে তৎক্ষণাৎ দ্বাররুদ্ধ হইল। আমিনা সৈয়দ আলিকে নিজের উপায় দেখিতে বলিলেন। সৈয়দ আলি বিপন্ন অবস্থায় রাজপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই সময়ে সা আবদুল রসুল বেলগ্রামী নামক একজন পুরাতন সম্ভ্রান্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সেই পথ দিয়া গমন করিতে করিতে একটি বিপন্ন বালককে দর্শন করিয়া তাহাকে আবদুল আলির ভবনে লইয়া উপস্থিত হন। আবদুল আলির সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপারে সকলেই ভীত ও চমকিত হইল। তাহাদিগের রক্তে প্রাসাদ কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। আফগানদিগের জয়ধ্বনি সমস্ত আজিমাবাদকে কম্পিত করিয়া তুলিল। এই প্রকার ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় ও নৃশংস হত্যায় আফগানেরা আলিবর্দ্দী খাঁর অসদ্ব্যবহারের প্রতিশোধ হইয়াছে মনে করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অধিকতর লোমহর্ষণ ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল।

সেই ভীষণ হত্যাস্থলে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সমসের খাঁ হৈয়ৎ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে হাজী আহম্মদকে আনয়নের জন্য আদেশ দিলেন। হৈয়ৎ খাঁ পূর্ব্বেই হাজী আহম্মদের সহিত সাক্ষাৎছলে গমন করিয়াছিলেন, এবং যৎকালে তাঁহার প্রতি আদেশ করা হয়, তখন তিনি সেইখানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। হাজী আহম্মদ এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি অনায়াসে পলায়ন করিয়া রাজা সুন্দর সিংহের ভবনে অথবা অন্য কোন আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারিতেন, কিন্তু অর্থের আসক্তি ও পরিবারবর্গের দুর্দ্দশা মোচন, এই দুই কারণে তিনি পলায়ন করিতে পারিলেন না। অগত্যা বৃদ্ধবয়সে কষ্টভোগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ভাগ্যের উপর নির্ভর

করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দুর্দ্দান্ত আফগানগণ তাঁহার বাটী ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া নিকটস্থ বাটীতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশেষে তিনি ধৃত হইয়া ১৭ দিবস পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিয়া নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করেন। মুস্তাফা খাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য আফগানগণ তাঁহার প্রতি উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। তাঁহাকে রাজপথে সামান্য অপরাধীর ন্যায় কশাঘাত করা হইয়াছিল। তাঁহার মুখের একদিকে চূণ ও অপর দিকে কালীর দ্বারা অঙ্কিত করিয়া একটি গর্দ্দভের পৃষ্ঠে তাঁহার পদদ্বয় বদ্ধ করিয়া অধোমুখে লম্বিত করিয়া রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি করা হয়। এইরূপ কত প্রকার যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। (১) তাঁহার যাবতীয় ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করা হয়। তিনি অবশেষে নিজ ভবনের এক পার্শ্ব হইতে সত্তর লক্ষ ভূগর্ভনিহিত মুদ্রা উত্তোলন করিয়া দুর্দ্দান্তদিগের হস্তে প্রদান করেন, কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। উপর্য্যুপরি অত্যাচারের পর তিনি বাটীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রোথিত নানা প্রকার জহরৎ এবং অনেক গুলি মুদ্রা উত্তোলন করিয়া দিতে বাধ্য হন (২)। শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীনের গৃহ হইতে তাহারা তিন লক্ষ মুদ্রার অধিক প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিকট হইতে তাহারা কয়েক

(১) মুতাক্ষরীণে কেবল মাত্র তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা হয় এইরূপ লিখিত আছে, কিন্তু An Enquiry into our National Conduct পুস্তকে ও অর্ম্মে সাহেবের Indostan এ উপরি বর্ণিত অত্যাচার বর্ণিত আছে।

Vide An Enquiry Chapter II P. 78 also Indostan Vol II. P. 41.

(২) Orme সাহেব কেবল ৫০ লক্ষ মুদ্রার কথা মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সহস্র মাত্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হাজী আহম্মদের দুর্দ্দশায় সকল লোকে দুঃখানুভব করিয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রহীন হইয়া নিজের ভগ্ন শরীরে দস্যুগণের অত্যাচার সহ্য করা তাঁহার পক্ষে যে অতীব ভয়াবহ হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবের ভ্রাতা হইয়া, আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তার পিতা হইয়া কদাচ চিন্তা করেন নাই যে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে দস্যুহস্তে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার জীর্ণ শরীর যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় ষোল সতর দিবস পরে তদীয় প্রাণবায়ুর অবসান হয়। (১) জাফর খাঁর উদ্যানের বহির্ভাগে সামালপুর নামক স্থানের নিকটে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া আজিমাবাদবাসী সকলেই ভীত ও চমকিত হইয়াছিল। কেহই জানিত না যে, নবাব মহবৎ জঙ্গের ভ্রাতার ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম হইবে।

এই নৃশংস হত্যার পর আফগানেরা আজিমাবাদ অধিকার করিয়া নগরবাসিগণের প্রতি অত্যাচার ও জৈনুদ্দীনের পরিবারবর্গের লাঞ্ছনার

(১) হাজী আহম্মদের মৃত্যুসম্বন্ধে মুতাক্ষরীণকার লিখিয়াছেন যে ১৬।১৭ দিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। Vide Mutakherien Vol II. P 553. কিন্তু An Enquiry নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে তাঁহার একজন রক্ষী বিষ প্রদান করিয়া তাঁহার যন্ত্রণা মোচন করে। An Enquiry chapter II. P. 18. Orme সাহেব লিখিয়াছেন যে জৈনুদ্দীনের স্ত্রী আমিনা বেগম স্বীয় শ্বশুরের দুর্গতি দেখিতে না পারিয়া বিষ প্রদানে তাঁহাকে যন্ত্রণা-মুক্ত করেন। Orme vol II P. 41.

হলওয়েল সাহেব বলেন যে প্রথমে হাজী আহম্মদকে ১০১ কোড়ার বাড়ী মারিয়া পরে গর্দ্দভে করিয়া রাজপথে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পর পুনর্ব্বার কশাঘাত করিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ ও জহরতাদির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহাতে উত্তর না পাইয়া যে হস্তীর পৃষ্ঠে মুস্তফা খাঁর মস্তক লইয়া নগর ভ্রমণ করান হয় তাহার পদতলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সমসের খাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁহাকে কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার একজন প্রহরী হাজীকে কিছু বিষ আনিয়া দেয়। তাহা পান করিয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। Holwell Hist Events Pt. I. chapt II P. 169-70)

একশেষ করিয়া তুলে। বলা বাহুল্য আলিবর্দ্দী খাঁ অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়া প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগকে সমরক্ষেত্রেই নিপাতিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার স্নেহভাজন জামাতার নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ হয় নাই।

সিংহ শিশু।

আত্মত্যাগ—স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে এ জগতে কেহ কখন বড় হইতে পারে না; এ জগৎ স্বার্থান্বেষীর জন্য নয়; যদি মহৎ হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে আপনার স্বার্থ পরার্থে মিশাইয়া ফেলিয়া নিষ্কাম ভাবে কাজ করিতে হইবে। শিখেরা ভারতের আজ গৌরব-স্থল। এ গৌরব তাহারা বহুমূল্যে লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য, কর্ম্মের জন্য, পরার্থের জন্য, আতিথেয়তার জন্য তাহারা যেরূপ আত্ম-ত্যাগ দেখাইয়াছে, সেরূপ মহদ্দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। তাহারা উৎসৃষ্ট-প্রাণ গুরুদেব উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের জন্য—ধর্ম্মের জন্য আত্মবলি দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছে। শিখ ইতিহাস অন্বেষণ করিলে তাহার প্রতি পৃষ্ঠাতেই এরূপ আত্মত্যাগের বহুল দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

শ্রীগুরু গোবিন্দ সিংহ আপনার নিস্পৃহতা দ্বারা শিখসমাজে এক নব জীবন প্রদান করেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তদীয় শিষ্যগণ অজেয় বীর হইয়া উঠে। তিনি তাহাদের সাহায্যে পঞ্জাব হইতে মোগল রাজত্বের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সামন্ত নৃপতি কুল অন্যায় ভয়ে ভীত হইয়া ঈর্ষাপরতন্ত্রতাবশতঃ মোগলরাজ ঔরঙ্গজেবের সাহায্য লইয়া গুরুর রাজধানী আনন্দপুর অবরোধ করেন।

এই অবরোধ কালে শিখেরা যথেষ্ট বীরত্ব দেখায়; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহারা মোগল ও সামন্ত রাজদিগকে দূরীভূত করিতে পারিল না। দুর্গে ক্রমেই খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইয়া পড়িল। শিখদিগের মধ্যে একটু একটু করিয়া অসন্তোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। * এই

* এই সকল কাহিনী গত বৎসরের ঐতিহাসিক চিত্রে 'গুরুগোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধে দেখুন।

সব দেখিয়া গুরুমাতা গুজরী বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অতি সাধের পৌত্রদিগকে তিনি কি করিয়া বাঁচাইবেন, এই চিন্তায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শেষে অনেক চিন্তার পর একটি সর্ব্বনাশকর পন্থার আবিষ্কার করিলেন। তিনি গুপ্তভাবে অবরোধকারী রাজাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাকে দুর্গ ছাড়িয়া যাইতে দেওয়া হউক। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। মাতা গুজরী গোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় ফতে সিংহ ও জোরেবার সিংহকে লইয়া গুপ্তভাবে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। সঙ্গে চলিল গঙ্গু নামক পাচক।

গঙ্গু ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণই তাহাতে বিদ্যমান ছিল না। সে নিকৃষ্ট শূদ্রপ্রকৃতিক ছিল। অর্থলিপ্সায় তাহার হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। অর্থের বিনিময়ে সে সকল পাপই করিতে পারিত। তাহার এই অর্থ-লিপ্সাই তাহাকে অত্যন্ত হেয় করিয়াছে।

সরহিন্দে গঙ্গুর নিবাস। গুরুমাতা তাহার সহিত সরহিন্দে উপস্থিত হইলে সে পরম সমাদরে তাঁহাকে স্বীয় কুটীরে লইয়া গেল। গুজরীও পরমানন্দে তাহার আতিথেয়তা স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বসিবার জন্য মাদুর বিছাইয়া দিল।

পথশ্রান্ত বালকদ্বয় অচিরেই সেই মাদুরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছিলেন, যাঁহাদের সেবার জন্য নিত্য শত শত দাস দাসী নিযুক্ত ছিল, আজ তাঁহারা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শয্যাহীন সামান্য মাদুরেই অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। গুরুমাতা গুজরীর চক্ষে কিন্তু নিদ্রা নাই। দুর্ভাবনায় তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত। পুত্রকে তিনি যেরূপ অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা কতই ভীষণ! গোবিন্দের মুখদর্শন আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে কিনা কে জানে! ভাবিতে ভাবিতে গুজরী পৌত্রদিগকে কোলে টানিয়া লইলেন।

পথে অর্থের নানা প্রয়োজন। এই ভাবিয়া গুজরী একটী পিত্তলের

বাক্সে করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে হীরা, মুক্তা ও অলঙ্কারাদি লইয়া দুর্গ ত্যাগ করেন। তিনি বহু যত্নে সেই বাক্সটি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। গঙ্গুর বাটীতে আসিয়া তিনি তাহা মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া শুইয়া রহিলেন; নানা ভাবনায় তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই। তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষণেকের তরে এক একবার তন্দ্রা আসিতেছিল। আবার তখনি তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

গঙ্গুর পাপ দৃষ্টি সেই বাক্সের উপর পড়িল। সে তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। এই অর্থ চুরি করিলে যে, গুরুপুত্রদের নানা ক্লেশের, এমন কি অনশনের পর্য্যন্ত সম্ভাবনা, তাহা তাহার মনে একবারও জাগিল না। সে তাহা অপহরণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সুযোগ মিলিল। মাতা গুজরী অনেকক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া আর পারিলেন না। অজ্ঞাতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই পাপী পাচক ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বালিসের তলদেশ হইতে বাক্সটি সরাইয়া ফেলিল ও তাহার গৃহের এক নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া রাখিল। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইলে সে 'চোর' 'চোর' শব্দে এক বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। সে চিৎকারে মাতা গুজরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বালকেরা শশব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন। মাতা বাক্স খুঁজিতে যাইয়া বাক্স পাইলেন না। বুঝিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। স্তব্ধহৃদয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—চোর কে? কিন্তু কি করিবেন? আজ তাঁহাকে নিরুপায় পাইয়া আশ্রিত কৃতঘ্ন ভৃত্য তাঁহার প্রতি অচিন্তনীয় অত্যাচার করিল। দুঃখে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে অতি শান্ত স্বরে গঙ্গুকে তাহার উপকারের জন্য ধন্যবাদ দিলেন, সে যে দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাক্সটি গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিয়াছে, এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন ও তাহা ফিরাইয়া দিবার জন্য কাতরস্বরে তাহাকে নিবেদন করিলেন।

যে কাপুরুষ, সে কোন মতেই তাহার দোষ স্বীকার করে না। সে নানা ছন্দে তাহার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করে। কখন বা অকারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। গুরুমাতার এরূপ কাতর নিবেদনে বিচলিত হওয়া দূরে থাকুক, গঙ্গু ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। গুরুমাতাকে সে অনর্থক গালাগালি দিল। তাহার এরূপ অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বালকেরা ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে,যদি আর কখন এরূপ অভদ্র ব্যবহার করে,তবে তাঁহারা তাহাকে যথেষ্ট শাস্তি দিবেন। বালকদের কথার প্রত্যুত্তরে গঙ্গু কঠোরস্বরে বলিল--"মূর্খ বালকদ্বয়! তোমরা যে আমার সম্পূর্ণ কৃপাধীন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? সমস্ত জগৎ তোমাদের শত্রু। আমি তোমাদিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় দিয়াছি। আর সে কৃতজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়া তোমাদের পিতামহী কিনা আমাকে চোর অপবাদ দেন? তোমাদের উপকার করার ইহাই কি প্রতিফল? তোমরা আমাকে সামান্য অর্থের চোর বলিয়া মনে কর? কেবল তাহাই নয়, তোমরা নিতান্ত বেয়াদবী আরম্ভ করিয়াছ। ভাল! আমি আর তোমাদিগকে ক্ষমা করিব না। দেখি, তোমাদিগকে কে রক্ষা করে। আমি এখনই মুসলমান কোতোয়ালকে ডাকিয়া তোমাদিগকে ধরাইয়া দিতেছি। তোমাদের পিতা মোগল সরকারের বিদ্রোহী। তোমরা কোন মতেই মোগলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে না। দেখ, তোমাদের বেয়াদবীর ফল কি হয়।" এই বলিয়া সে ক্রোধভরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

তাহার সে কর্কশ বাক্যে সিংহ-শিশুদিগের নয়নাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ফতেসিংহ অসি কোষোন্মুক্ত করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মাতা গুজরী তাহাতে বাধা দিলেন। তাঁহার কথায় বালক স্থির হইলেন। মাতা পাচকের ক্রোধশান্তির জন্য কত অনুনয় বিনয় করিলেন, সমস্ত অর্থ তাহাকে দান করিলেন; কিন্তু তাহাতেও পাপীর ক্রোধ-শান্তি হইল না। রমণীর কাতর ক্রন্দনে তাহার জিঘাংসা আরও প্রবল

হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ সহরের মোগল কোতোয়ালকে তাঁহাদের কথা বলিয়া দিল। আরও বলিল, তাহাকে পুরস্কার দিলে, সে এখনই তাঁহাদিগকে ধরিয়া দিবে।

অনতিবিলম্বে সানুচর কোতোয়াল গঙ্গুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দ সিংহের নিরুপায় মাতা ও পুত্রদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। দুর্গের একটি ঘরে মাতাকে ও আর একটি অতি অন্ধকারময় ভীষণ ঘরে বালকদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

কারাগারে রুদ্ধ বালকদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়—তাহা কেবল বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয়। তাঁহারা সেই অন্ধকারময় গৃহে অবস্থান করিয়াও দুই ভ্রাতায় নানা ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। সিংহ-শিশু সিংহ ত' বটে! পিতার অদম্য হৃদয় ও পিতামহের ধর্ম্মোন্মাদ তাঁহাদিগের মধ্যেও বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা ধীরভাবে এ অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিলেন।

যাহা হউক, পরদিন মহা আড়ম্বরে রাজদরবার বসিল। নবাব বাজিদ খাঁ * সিংহাসনে বসিয়া বিচারকার্য্যে রত হইলেন। বন্দী বালকদিগকে তথায় উপস্থিত করা হইল। বালকদের তেজোময় মূর্ত্তি দেখিয়া সভাস্থ সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহাদের দেহ অনাহারে শীর্ণ,এবং পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বদন চিন্তাক্লিষ্ট হইলেও দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

নবাব কোতোয়ালের অভিযোগ শুনিয়াই তাঁহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে এক আশাময়ী চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইল। তিনি গুরু গোবিন্দসিংহকে চির অন্তর্জ্বালা প্রদানের মতলব আঁটিলেন। এই বালকদিগকে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে, গোবিন্দের মনে যে যন্ত্রণাগ্নি জ্বলিবে, তাহার তুলনায় পুত্রের বিচ্ছেদ-কষ্ট অতি সামান্য। তাই তিনি বলিলেন—"বালকদ্বয়! তোমরা অতি শিশু। তোমাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে আমার বড়ই কষ্ট

* ইনি কোন কোন মতে বাজির খাঁ নামে পরিচিত।

হইতেছে। আমার হৃদয় তোমাদের প্রতি স্নেহে আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে। পিতার পাপে তোমাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, আমি তোমাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে চাহি। তোমাদের পিতা একটি কাফের। সে মোগল-শাসনের বিদ্রোহাচারী। তাহার পুত্র বলিয়া তোমাদের প্রাণদণ্ডই যথার্থ শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তোমাদের অল্প বয়স দেখিয়া আমার বড়ই দয়া হইতেছে। আমি তোমাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু সে দণ্ড পরিহারের জন্য তোমাদিগকে আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। যদি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাদিগকে নিজ পুত্রের ন্যায় পালন করিব। এ জগতে যত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে, আমরা সমস্তই তোমাদিগকে দিব। তোমরা পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গের সুখ উপভোগ করিবে। সর্ব্ব প্রকার আমোদই তোমাদের দাস হইবে। সুন্দরী রমণীগণ তোমাদের সেবার জন্য নিয়োজিত হইবে। তোমাদের পিতা আল্লার ধর্ম্ম গ্রহণ না করায় ও মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, অতলস্পর্শী নরকভোগ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য; কিন্তু নির্দ্দোষ তোমরা তাহার সে পাপের জন্য কষ্ট পাইবে কেন? তাহার প্রচারিত ধর্ম্ম যখন এই জীবনেই সুখ দেয় না, তখন তাহা পরকালের আশা দেয় কি করিয়া? কেবল তাহার কথায় বিশ্বাস করিও না। আমি অতি আদরের সহিত যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে মত দাও। আমি তোমাদিগকে সমস্তই দিব। আমি তোমাদের জন্য সমস্তই করিব। তোমরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর।”

প্রকৃত ধর্ম্মসাধন ঐহিক সুখের নিকেতন নহে। হিন্দু-ধর্ম্ম বা তাহার অংশবিশেষ শিখধর্ম্ম সংযমের পক্ষপাতী; বিলাসিতা বা ঐহিক সুখ-চিন্তা এ ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। মুসলমান ধর্ম্মও প্রকৃত ঐহিক ধর্ম্ম নহে। তাহাও পরকালের মঙ্গলান্বেষী। তাহাও পবিত্রতার ও সংযমের পক্ষপাতী। কিন্তু কালদোষে তাহা অনেকটা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যখন মহম্মদ-পন্থীয়া বিশাল রাজ্যেশ্বর হইয়া উঠিল, তখন তাহাদের সংযম কোথায়

ভাসিয়া গেল, তাহারা ক্রমশঃ বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল, ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া পড়িল, ঐহিক সুখই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া তাহারা মনে করিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে তেমন কোন ধর্ম্মবীর জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি ধর্ম্মের এই অধঃপতনে ক্ষুব্ধ হইয়া ইহাকে উন্নতির—সংযমের চরম সীমায় তুলিয়া ধরেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটি বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সে ক্ষীণ চেষ্টা অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারে নাই। এখনই মুসলমান. ধর্ম্মের নামে, কত অন্যায় আচরণ করিতেছেন, একথা অনেক প্রকৃত মুসলমানই স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দু-ধর্ম্মেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে নানক, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মসংস্কারকগণ জন্মিয়া ইহার প্রাণে নূতন শক্তি দিয়া যান। তাই আজও হিন্দুধর্ম্ম জাগরিত। তাই আজও হিন্দু ঐহিক সুখকেই বড় করিয়া ভাবিতে পারে না। দরিদ্র ধর্ম্ম-প্রাণ ব্রাহ্মণ আজও তাহার দৃষ্টিতে কোটিপতি বিলাসী নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পূজ্য।

যা'ক্ সে কথা। নবাবের এরূপ বাক্যে—এরূপ পিতৃনিন্দায় বালকদের প্রাণে অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাঁহাদের ক্ষীণচক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। উভয়েই ইহার উত্তর দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ফতে সিংহ ভ্রাতাকে নিরস্ত করিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে বলিলেন—তাঁহার সে বাক্যাবলী আজও ভীরুর প্রাণে সাহসের সঞ্চার করে। বালক বলিলেন—

"নবাব! দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ করিয়াও তোমরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দাও! তোমাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনে দেশ উৎসন্ন গিয়াছে। তোমাদের প্রাসাদ সহস্র সহস্র রমণীর দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত। তুমি তাহাদের স্বামিগণের জীবন অন্যায়ভাবে নষ্ট করিয়াছ। সহস্র সহস্র শিশু মাতৃহীন হইয়া কাতর ক্রন্দনে চারিদিক্ মুখরিত করিতেছে। তুমি বলপূর্ব্বক হিন্দু প্রজাদিগের কন্যা ও ভগিনীদিগকে অপহরণ করিয়া তোমার অন্তঃপুর

শোভিত করিয়াছ। কত রমণী তাঁহার সতীত্ব রক্ষার জন্য তোমাদিগকে অভিশাপ দিতে দিতে উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা রক্ষক হইয়া প্রজাদের ধনসম্পত্তি অপহরণ কর। তোমাদের অসির প্রভাবে কাহারও জীবন নিরাপদ নহে। আমাদের পিতা তোমাদের এই সব রাক্ষসজনোচিত ব্যবহারের শাস্তি দিয়া ধর্ম্মভাবে জগৎ প্লাবিত করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তোমাদের এ পাপের জন্য শীঘ্রই তোমাদের অনুশোচনা উপস্থিত হইবে। তোমরা পরকে যে সমস্ত কষ্ট দিয়াছ, সেই সমস্ত কষ্ট তোমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। যখন আর রক্ষার উপায় থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হইবে। কিন্তু তখন সে অনুশোচনা বৃথা হইবে। সময় সময় কত রাজ্য হইয়াছে ও পড়িয়াছে। তোমাদের রাজ্যও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী। তোমাদের সিংহাসন বাদুড়, পেচক ও পারাবতের ক্রীড়া-নিকেতন হইবে। তোমাদের দুর্গ, প্রাসাদ ও ক্ষমতা পরে কেবল উপকথামাত্র হইয়া দাঁড়াইবে—তখন অনেকেই তোমাদের উদ্দেশে বিদ্রূপাগ্নি বর্ষণ করিবে, অতি অল্প লোকেই তোমাদের দুঃখে সমবেদনা জানাইবে। তোমরা ক্ষমতা-গর্ব্বে মত্ত হইয়া অদূরবর্ত্তী মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে পাইতেছ না, তাহা মনোরম সাজে সজ্জিত হইয়া তোমাদের দৃষ্টিভ্রান্তি ঘটাইতেছে। নবাব! তুমি আমাদিগকে যে সব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশা দিতেছ, তাহা অতীব ক্ষণস্থায়ী। মানসিক অশান্তি, শারীরিক রোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা একেবারেই লোপ পাইবে। যদি কখন মৃত্যু না হইত, তবে আমরা তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতাম। যখন একদিন মরিতেই হইবে, তখন সেই ক্ষণিক সুখসম্ভোগে লাভ কি! তোমার অসির আঘাতে মৃত্যু অথবা রোগের করাল গ্রাসে মৃত্যু—একই কথা। যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস এই জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান্ তাহা আত্মরক্ষার্থে কলঙ্কিত হইতে পারে না। তুমি সেই পবিত্র বিশ্বাস ত্যাগ করিতে বলিতেছ। যখন সকলেই জানে, মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন কেন যে লোকে জীবনকে মূল্যবান মনে করে ও তাহা রক্ষার জন্য অন্যায়

চেষ্টা করে, তাহা ভাবিয়া আমরা বড়ই বিস্মিত হই। যিনি ধর্ম্মের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা সেই গুরু তেগবাহাদুরের পৌত্র; যিনিশ্রীগুরু নানক দেবের প্রচারিত ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবতার, আমরা সেই মহাত্মা গুরু গোবিন্দ সিংহের পুত্র। যাহাদের পিতামাতা এরূপ মহচ্চরিত্র,যাহাদের বংশ অতি পবিত্র, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মহিমায় জগৎ গৌরবান্বিত. * যাহারা সর্ব্বদা দেব-দূত দ্বারা রক্ষিত, যাহাদের মস্তকে প্রতিনিয়ত পিতৃগণের শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে, স্বর্গের মোহিনী জ্যোতিঃ যাহাদিগকে জীবনের উচ্চতর সোপানে আকর্ষণ করিতেছে, তাহারা কি সামান্য দেহের জন্য, অথবা কুক্কুর ও গর্দ্দভের ন্যায় ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য এই সব সুখ নষ্ট করিবে? মৃত্যুর ভয় কি দেখাও? আমরা সে ভয় কিরূপ, জানি না। ধর্ম্মজীবনের পবিত্র শক্তি কি কখন নষ্ট হয়? তাহা কি কখন অসির আঘাতে অথবা কামানের গোলার আঘাতে ক্ষয় পায়? আমাদের আত্মা অমর, আর এই দৃশ্যমান্ শরীর ত কেবল তাহার বহিরাচ্ছাদন মাত্র। সুখে বা অসুখে, শান্তিতে বা অশান্তিতে মরা—একই কথা, শরীর থাকুক, আর তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তিত হউক, সে আমাদের নিকট একই অবস্থা। আমরা অমর-আশীর্ব্বাদের উত্তরাধিকারী। আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের হৃদয়ে অবস্থান করি। তুমি যেরূপে ইচ্ছা আমাদিগকে হত্যা করিতে পার। গুরুগোবিন্দের পুত্র হইয়া আমরা কখনই গুরু-নির্দ্দিষ্ট সোণার রাস্তা ছাড়িয়া এক চুলও বিপথে অগ্রসর হইব না।" †

প্রকৃত ধার্ম্মিক দেহের জন্য কখন চিন্তিত হন না। দৈহিক কষ্টের ভয় দেখাইয়া কখন তাঁহাকে সত্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারা যায় না। তিনি সর্ব্বদাই সেই পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পর-

* তৃতীয় বর্ষ স্বদেশীতে 'শিখগুরু' প্রবন্ধাবলীতে এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

† Puran Singh's The Victory of Faith.

মাত্মার কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহার নিকট সয়তান, মার বা কন্দর্প প্রতিহত। তিনি জগতের আদর্শ পুরুষ। আমাদের এই বালকদ্বয় শিখগুরুগণের ধর্ম্মপ্রাণতা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজন্ম সন্ন্যাসী; ধর্ম্ম-তৃষ্ণা তাঁহারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিয়াছেন। বালক হইলেও দৈহিক সুখ সম্পদের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে।

বালকের তেজোগর্ভ বাক্যে নবাবের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল! তিনি কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন—"চুপ রও বদ্‌মায়েস ছেলে: দয়া করিয়া আমি তোদের সহিত এরূপ ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে তোদের দেখিতেছি, কোনই ধারণা নাই। তোদের পিতা কাফের। তোরা বলিস্ যে, তোরা মৃত্যুর ভয় রাখিস্ না। তোদের বয়সের ছেলেরা সামান্য কণ্টকাঘাতে তীব্র চিৎকার করিয়া উঠে, আর তোরা অসির আঘাত এতই নগণ্য মনে করিস্। হয় মুসলমান হ', নয় মর্। ইহাই আমার শেষাজ্ঞা। যাহা ইচ্ছা বল্।"

এইবার বালক জোরবার সিংহ তীব্র স্বরে উত্তর করিলেন—"নবাব। যতবার ইচ্ছা আমাদিগকে অসির আঘাত কর, আমরা কখনই কাঁদিব না। আমরা মৃত্যুর ভয় রাখি না। আমাদের ফাঁসি দাও, অথবা গায়ের চামড়া খুলিয়া লও—যাহা ইচ্ছা কর। আমরা শ্রী অকাল পুরুষের আশীর্ব্বাদে তোমার সকল শাস্তিকেই সামান্য জ্ঞান করি। যেরূপে ইচ্ছা আমাদের হত্যা কর। কিন্তু আমাদের সম্মুখে আমাদের মহানুভব পিতার কখনও নিন্দা করিও না। শীঘ্র তোমার শেষাজ্ঞা প্রতিপালন কর; আমরা তোমার ঘৃণিত সঙ্গ হইতে মুক্তি পাই। যে দেশে তোমাদের রাজত্ব, সে দেশে বাঁচিয়া থাকা বৃথা। আমরা সেই সর্ব্বানন্দময় পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইব - দাও তুমি শাস্তি দাও।"

ক্রোধে নবাবের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিত হইল। তিনি দুইজন পাঠানকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"এই শিশুদ্বয়কে তোমাদিগকে দিলাম।

গুরু-গোবিন্দ সিংহের প্রতি তোমাদের যে প্রতিহিংসা আছে, তাহা এই অবসরে পরিতৃপ্ত কর। ইহারা তাহারই পুত্র।” এই পাঠানদের পিতা এক যুদ্ধে গুরু-গোবিন্দের হস্তে দেহত্যাগ করে। সেই অবধি ইহারা গুরু-গোবিন্দের আন্তরিক শত্রু হইয়া উঠে ও তাঁহাকে শাস্তি দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। নবাব বাজিদ খাঁ এ কথা জানিতেন। তাই তিনি আজ শিশুদিগকে নিহত করিবার মানসে ইহাদের হস্তে শিশুদ্বয়কে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু পাঠান কাপুরুষ নহে। তাহাদের হৃদয়ে বীরের রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। তাহারা নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া বলিল—“আমাদের পিতা যুদ্ধে ইহাদের পিতৃকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। আর আমরা এত দূর হৃদয়হীন কাপুরুষ নহি যে, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এই বালকদিগকে হত্যা করিব। যতদিন না আমরা প্রকৃত সুযোগ পাই, যতদিন না যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের শত্রু গুরু-গোবিন্দের সাক্ষাৎ পাই ও তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করি, ততক্ষণ চুপ করিয়া থাকিব, ইহারা শিশু। ক্ষমা করিবেন—আমরা আপনার আদেশ মান্য করিতে পারিলাম না।”

পাঠানদের এই বীরোচিত বাক্যে নবাব একটু লজ্জিত হইলেন। তাঁহার সভাসদেরা তখন অনেকেই বালকদের মুক্তির জন্য নিবেদন করিলেন। স্বীয় কাপুরুষতা স্মরণ করিয়া নবাবের বদনমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। বালকদিগকে মুক্তি দিতেও তিনি অনেকটা ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু হিন্দু মন্ত্রীর * উত্তেজনায় তাঁহার সে কোমলতা ক্ষণপরেই দূর হইল। সকল দেশেই কাপুরুষ জন্মে। হিন্দুকুলকলঙ্ক সেই কাপুরুষ নবাবকে বলিল—“সর্প-শিশুকে বাড়িতে দেওয়া কখনও রাজনীতি-সঙ্গত নহে। ইহারা মোগল সম্রাটের ভীষণ বিদ্রোহীর পুত্র। ইহাদিগকে

* এই মন্ত্রীর নাম কোন মতে কুলযশ, কোন মতে বা সাচ্চানন্দ।

নষ্ট করাই যুক্তি-সিদ্ধ'।' মন্ত্রীর এই সদ্‌যুক্তিতে নবাব তাঁহার পূর্ব্ব আজ্ঞা বাহাল রাখিবার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। বালকদিগের প্রাণদণ্ডই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। কিন্তু সহসা আজ্ঞা দিতে পারিলেন না।

বালকেরা 'সর্প-শিশু' সন্দেহ কি? তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কালে ভারতেতিহাসের প্রধান নায়ক হইয়া উঠিবেন ও হয়ত' ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দিবেন। এরূপ শিশুদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া কোন মতেই রাজনীতি-সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু নবাব ভাবিলেন, হত্যার পূর্ব্বে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, তাঁহাদিগকে স্বদল-ভুক্ত করিতে পারেন কিনা। এজন্য তিনি আবার বলিলেন—"বালকদ্বয়, যদি আমরা তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিই তবে তোমরা কি করিবে?" জোর-বার সিংহ উত্তর করিলেন—"কেন? আমাদের পিতা এখন যেখানেই থাকুন, আমরা বরাবর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সৈন্যদল সংঘটন করিব ও অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিব। অদম্য সাহস ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞার সহিত 'মরিব কিম্বা জিতিব' এই পণ করিয়া তোমার ন্যায় অত্যাচারীদের সহিত যুদ্ধ করিব।"

এই বাক্যে নবাব অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন—"এখনই তোমাদিগকে নির্য্যাতন করিয়া এমন কষ্ট দিয়া হত্যা করিব যে, সেরূপ মৃত্যুর কথা কেহ কখন শুনে নাই। তার পর সেই শব কাক শকুনের আহারের জন্য ফেলিয়া দিব।"

অদম্য সাহসের সহিত বালকেরা উত্তর করিলেন—"কুচ্‌ পরোয়া নাই! যাহা খুসী তাহাই কর। ধর্ম্মের নামে আমরা এই দেহ শৃগাল কুকুরেরও ভক্ষ্যরূপে ত্যাগ করিতে পারি।"

"বেশ! তবে এ বেয়াদবীর ফল ভোগ কর। আমি কোনরূপে *

* ঔরঙ্গজেবের নিকট বালকদিগের ধৃত হইবার সংবাদ পাঠাইলে, তিনি বালকদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। (vide Griffir's Runjit Singh). তবে যে সির

তোমাদিগকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তোমাদের এরূপ অসহ্য বেয়াদবীর জন্য তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। আমি এখনই মজুর ডাকাইয়া সিরহিন্দের প্রাচীর দুই গজ পরিমাণে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার উপর তোমাদিগকে রাখিয়া গাঁথিয়া ফেলিতে বলিতেছি।"

তখনই রাজমিস্ত্রী উপস্থিত হইল। তখনই নগরের প্রাচীর দুই গজ পরিমাণ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। বালকদ্বয়কে সেই প্রাচীরের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া মিস্ত্রী প্রাচীর গাঁথিতে আরম্ভ করিল। ভ্রাতৃদ্বয়কে পরস্পর হইতে দুই হাত পৃথক রাখা হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে 'চূণ শুরকীর' সাহায্যে পায়ের চেটো হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে হাঁটু, কোমর, বক্ষ, স্কন্ধ ও মস্তক পর্য্যন্ত গাঁথা হইয়া গেল।* এরূপ ভীষণ মৃত্যুতেও বালকেরা কিছুমাত্র কাতরতা দেখাইল না। বালকদের এরূপ হত্যায় অনেকেই স্তব্ধ হইয়া রহিল; কিন্তু সিরহিন্দপতি নবাব বাজিদ খাঁর বদনমণ্ডল পৈশাচিক হাস্যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রধান শত্রুর মনোবেদনা জন্মাইবার উপায় করিয়া তিনি বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

যখন গাঁথুনি হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, তখন নবাব বালকদ্বয়কে তাঁহার প্রস্তাব পুনরায় ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু ফতে সিংহ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন—"কাপুরুষ! এ সময় আমাদিগকে আর বিরক্ত করিও না। তোমার নিজের আমোদে মত্ত হও। ঈশ্বরেচ্ছা ভাবিতে ভাবিতে আমরা বড়ই সুখানুভব করিতেছি। ঈশ্বরেচ্ছাই পূর্ণ হউক। এই কষ্টময় জগতে আর আমাদের বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

যখন গাঁথুনি কোমর পর্য্যন্ত উঠিল, যখন শরীরের অর্দ্ধাঙ্গমাত্র বাহির হইয়া আছে, তখন আবার নবাব তাহাদিগকে সে প্রস্তাব বুঝিয়া দেখিতে

হিন্দপতি বালকদিগকে প্রাণদণ্ড দানে এত বিলম্ব করিতেছিলেন, তাহার কারণ এই মনে হয় যে, যদি বালকদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুত করাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায়, তবে ঔরঙ্গজেব অসন্তুষ্ট হইবেন না। অধিকন্তু গোবিন্দের প্রতি রীতিমত প্রতিহিংসা লওয়া হইবে।

* Puran Singh's The Victory of Faith.

বলিলেন। তাঁহার সে কথায় ধ্যানমগ্ন বালকদ্বয়ের বড়ই বিরক্তি জন্মিল। ফতেসিংহ ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন—'দুরাচার! নিজের চরকায় তেল দাও। আমরা বেশ সুখে আছি।' কনিষ্ঠ জোরবারসিংহ বলিলেন—

"অত্যাচারিন্! মানুষ মারিবার জন্যই জন্মে। জীবন ক্ষণ স্থায়ী, তাহা একটি নিশ্বাস মাত্র। তবে কেন মহজ্জীবন যাপন কর না?"

যখন গাঁথুনি ফতেসিংহের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল, তখন নবাব আবার সেই প্রস্তাব করিলেন। তখন জোরবারসিংহের দেহ একরূপ সম্পূর্ণ গাঁথা হইয়া গিয়াছে, তিনি তখন হাঁপাইতেছেন। তখন তাঁহাদের উত্তর ভাল-রূপ আর শুনা গেল না। কেবল এই শেষ বাণী সকলের কর্ণে আঘাত করিল যে, 'হে ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।' তারপর সমাধিমগ্ন বালকদ্বয় উভয়েই প্রাচীরের মধ্যে গ্রথিত হইয়া পড়িলেন। আর কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। কেবল তাঁহাদের সেই বাণী তখনও সকলের কর্ণে ধ্বনি করিতেছিল—'হে ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

যখন বালকেরা * সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া স্বর্গারোহণ করেন, ঠিক্ সেই সময় এক শিখ গুরু গোবিন্দসিংহের আদেশে তাঁহাদের অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইল। শিখ স্থিরকর্ণে গুরুপুত্রদের আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিল। আর এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আসিতে পারিলে, হয় ত' সে স্বীয় জীবন বিনিময়ে তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে পারিত। এ চিন্তায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তখনি সে স্বীয় অসিতে স্বীয় দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। তাহার অমর আত্মা বালকদের সহিত সব্ব সুখময় সেই অমরলোকে চলিয়া গেল। এই সময়ে আর একজন হিন্দু বহু ধন লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেই ধন-বিনিময়ে গুরুপুত্রদিগকে বাঁচাইবার আশায় সে এত তাড়াতাড়ি

* মৃত্যুকালে ফতেসিংহের বয়স প্রায় দশ বৎসর ও জোরবার সিংহের বয়স প্রায় আট বৎসর হইয়াছিল।

আসিতেছিল। আসিয়া দেখিল, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। সে পাগল হইয়া গেল। *

মাতা গুজরী বড়ই উদ্বেগে বালকদের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সেই ভীষণ সংবাদ উপস্থিত হইল। তাহা শুনিতে শুনিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

অর্থলিপ্সু পাচক গঙ্গু স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধির বশে আজ কতই অনর্থ ঘটাইল। সে আজ তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুর সর্ব্বনাশ করিল। তাহার পাপের ফলে আজ চারিটি নির্দ্দোষ প্রাণী অকালে হত হইল, একটি পাগল হইয়া গেল। আর সেই অবিবেচক নবাবের কথা বলিব না। তিনি মানব-কলঙ্ক।

ইহার কিছু দিন পরে মুক্তসর যুদ্ধে পঞ্জাবের অংশবিশেষ জয় করিয়া বিজয়ী গোবিন্দসিংহ যখন রাজধানী ফিরিতেছিলেন। তখন তিনি এই পাপ সিরহিন্দে একবার উপস্থিত হন। শিখেরা ঐ নগর ধ্বংস করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে। কিন্তু গুরু গোবিন্দের আদেশে তাহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। গুরু সেই পাপ নগরের বহির্ভাগে প্রিয় পুত্র ফতে-সিংহ ও জোরবারসিংহের অদ্ভুত সমাধি-প্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া নানা কথা ভাবিতেছিলেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে তরবারি দ্বারা একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ উন্মূলিত করিলেন। তাহা দেখিয়া শিখেরা এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন—'ইহা ভবিষ্যতের এক প্রধান ঘটনার লক্ষণ বলিয়া জানিও। মোগল রাজত্ব আর বেশী দিন নয়।'

গুরু সিরহিন্দকে 'গুরুমার' নাম প্রদান করিয়া শিষ্যদিগকে আদেশ করেন যে, যে কেহ এই স্থান দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইবে, সেই আসিবার ও যাইবার কালে এখান হইতে এক এক খণ্ড ইষ্টক লইয়া যেন সম্মুখস্থ

* cf. Puran Singh's The Victory of Faith.

নদীতে ফেলিয়া দেয় ; অন্যথা তাহার সে স্থানে কোন ফল হইবে না। আজও শিখ সে প্রথা পালন করিয়া থাকে। *

পাপীর শাস্তি অনিবার্য্য। সিংহ-শিশুদিগের অভিশাপ ফলিয়াছে। এত অত্যাচারের ফলে মোগল রাজ্য আজ কেবল উপকথা মাত্রে পরিণত হইয়াছে। মুগ্ধ বাজিদ খাঁ ও তাঁহার সহকারী সিরহিন্দবাসিগণ ও অর্থ-লিপ্সু পাপী গঙ্গু বাবা বৈরাগী বান্দার প্রবল শিখ অনুচরগণের হস্তে নানা নির্য্যাতন ভোগ করিয়া পাপ দেহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সে কাহিনী বড়ই শোকাবহ। তাহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলেও, সে প্রায়শ্চিত্ত বড়ই ভীষণ হইয়াছিল। †

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* ঐতিহাসিক চিত্রে 'গুরু গোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† দ্বিতীয় বর্ষের চৈত্র সংখ্যার স্বদেশীতে 'বৈরাগীবান্দা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গৌড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:•:—

বাংলা কোট।

'খাজাঞ্চি'র উত্তর-পূর্ব্ব পাঁচ রশি এবং 'খাদেমরসুলে'র উত্তর-পশ্চিম ১৫ রশি ব্যবধানে বাংলা কোট অবস্থিত। মহদিপুরের (ওরফে Mahin-d-dinpur) লোকে এই স্থানকে বাংলা কোট বলিয়া থাকে। এখানে দুর্গ-নিম্নে একটী পুষ্করিণী, পতিতাবস্থায় বহুতর স্তম্ভশ্রেণী এবং প্রস্তরাদি উত্তোলনার্থ খনিত কতিপয় স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রকাণ্ড একটী তিন্তিড়ি বৃক্ষ এবং উহার আট হাত দূরে—দক্ষিণদিকে দুইটী পাকা কবর আছে, তাহাও স্থানে স্থানে খনিত হইয়াছে। মহদিপুরের বৃদ্ধগণের মুখে এবং খাদেম রসুলের খাদিমের নিকট শ্রুত হওয়া যায় যে, এই সমাধি দুইটীর—একটী হোসেন শাহের এবং অপরটী তদীয় পত্নীর। আরো অবগত হওয়া যায় যে, খারি পল্লীর সান্নিধ্যে যে সুবৃহৎ প্রস্তর-শবাধার পতিত রহিয়াছে, তাহা হোসেন সাহের সমাধিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল; তথা হইতে কালক্রমে বর্ত্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। উক্ত সমাধি-দ্বয়ের আট হাত দক্ষিণে প্রাচীর-বেষ্টিত এক সমচতুষ্কোণ স্থান আছে; এই প্রাচীরের ইষ্টকসমূহ নানা বর্ণে চিত্রিত। যোল বর্গহস্ত পরি-মিত এই প্রাচীরাভ্যন্তরে রঞ্জিত ইষ্টক-নির্ম্মিত বহুতর সমাধি বিদ্যমান আছে; ইষ্টকগুলি আঠারো ইঞ্চি পরিমাণের। ইলাহি বক্স বাল্যকালে এই সমাধিসমূহ এই স্থানেই দর্শন করিয়াছিলেন; গ্রন্থ রচনার সময় তৎ সমুদয় অক্ষত না থাকিলেও অন্যান্য সমাধির তুলনায় এক রকম ভালই

ছিল। ১২৬৩ হিজরীর (১৮৪৬ খৃঃ অঃ) সমকালে সমাধিগুলি প্রাচীর সহ বিনষ্ট হয়; এখন বহুকষ্টেও উহাদের নিদর্শন বাহির করা ভার। এই সুপ্রসিদ্ধ বাংলা কোট উহার নানারূপ বাগ বাগিচা সহ বহু প্রাচীনকাল হইতে মহদিপুর নিবাসী মীর দোমনের বংশধরগণের অধিকারে আছে; তাহারা নাকি হোসেন সাহের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। মীর এবং তদীয় পুত্রগণ সমাধিগাত্রের লিপি, খোদিত প্রস্তর এবং চিত্রিত ইষ্টক নিচয় খনন করিয়া বাহির করতঃ অন্যত্র বিক্রয় করিয়া নিজেদের নীচাশয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন!—

"অসৎপুত্র অপেক্ষা একটী সৎকন্যা শ্রেষ্ঠ।"

১২৮১ হিঃ (১৮৬৩ খৃঃ) ইলাহিবক্স মীরদমনের পৌত্র মীরহান্সার নিকট, ১০৭০ হিজরীর (১৬৫৯ খৃঃ) নবাব মোজাম খাঁর দস্তখতি বাংলা কোট গ্রামে ৫০ বিঘা নিষ্কর-ভূমিদানের সনন্দ দেখিয়াছিলেন। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের আজ্ঞায় গৌড়ের নরপতিবৃন্দের সমাধিমন্দির আলোকিত করিবার উদ্দেশ্যে সৈয়দ সুলতানের পৌত্র সৈয়দ অমরিয়াকে সর্ব্বপ্রথমে এই ভূমি প্রদত্ত হয়। হোসেন শাহের সমাধির উত্তরে—বাংলাকোট গ্রাম মধ্যে একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, মীরহান্সা বলিয়া থাকেন যে, ঐ স্থানে প্রায় শতাধিক গৌড় নরপতি ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের সমাধি রহিয়াছে। এই সকল সমাধির অধিকাংশই এখন ভগ্নদশায় উপনীত; কেবল স্থানে স্থানে কবরের গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

মিনার।

খাদেম রসুলের উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় ২৫ রশি, দুর্গের বহির্ভাগে বাংলা-কোটের বিপরীতদিকে 'মিনার' অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানকে পীর (১) আসামন্দিরও বলা হইয়া থাকে। আবিসিনিয়ান্ সুলতান ফিরোজ

(১) ইলাহিবক্স ভুলক্রমে ইহাকে 'তীর আসামন্দির, লিখিয়াছেন।

শাহ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার লিপি-ফলক এবং নিম্নাংশের প্রস্তর-গুলি অপহৃত হইয়াছে। মিনারের উচ্চতা প্রায় ৫০ হস্ত এবং বেধ প্রায় ৫৪ হস্ত; পূর্ব্বদিকে একটী পুষ্করিণী আছে,—তাহাও সম্ভবতঃ ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছে। ফিরোজ শাহ ৮৯৩ হিজরীতে (১৪৮৭ খৃঃ অঃ) রাজত্ব করেন।

দাখিল দরওয়াজা।

খাদেমরসুলের উত্তর-পশ্চিম প্রায় এক মাইল দূরে এই প্রকাণ্ড ফটক অবস্থিত। 'রিয়াজে'র মতে এই 'অত্যুচ্চ ফটক' হোসেন শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার উত্তরদিকে অবস্থিত ও নিকটস্থ এক পুষ্করিণীর পূর্ব্ব-পার্শ্ব হইতে একটী 'আব্‌গির' (জল-প্রণালী) বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভি-মুখে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে;—তাহার উপর বপ্র-প্রাকার ছিল। ফটক হইতে প্রায় কুড়ি রশি পশ্চিম—ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী পথিপার্শ্বে কালো বুনিয়াদের উপর এক বৃহৎ ত্রিবাহু প্রস্তর-শবাধার। অনেকের মতে ইহা হোসেন শাহের সমাধি; খাদেমরসুলের খাদিম বলিয়া থাকেন যে, বাংলাকোট হইতে হোসেন শাহের সমাধি এই স্থলে আনীত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে কঠিন প্রস্তরের আর একটী শবাধার ছিল।

কোতোয়ালী দরওয়াজা।

ইহা 'সালামি দরওয়াজা' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে; সদর রাস্তার বা মহদিপুরের, পূর্ব্বদিকে অতি সন্নিকটে অবস্থিত। দক্ষিণে প্রায় কুড়ি রশি ব্যবধানে 'বালওয়া দীঘী' (২); ফটকের পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় পার্শ্বেই প্রাকারশ্রেণী ও কামান স্থাপনের বুরুজ বিদ্যমান। উত্তরে প্রায় অর্দ্ধ

(২) র‍্যাভেনশা Ballo Dighi লিখিয়া গিয়াছেন।

মাইল দূরে পুরাতন-সেতু-সংলগ্ন সদর রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে অজ্ঞানিত অক্ষরের (harf khafi) লিপি-সমন্বিত এক বৃহৎ প্রস্তর-ফলক ছিল। উহার সমুদয় অংশের পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হইলেও, সুলতান মোহাম্মদ যে ৮৬২ হিজরীতে (১৪৫৭ খৃঃ) এই দুর্গ-ফটক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

গুন্মৎ মস্‌জেদ।

কোতোয়ালী দরওয়াজা হইতে প্রায় এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং মহদিপুরের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বদিকস্থ নিবিড় জঙ্গল প্রদেশে 'গুন্মৎ মস্‌জেদ' অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৭২ হস্ত এবং প্রস্থ ৩৬ হস্ত; সাতটী গম্বুজ ছিল,—তাহার সবগুলিই এখন ভূমিসাৎ হইয়াছে।

রাজবিবি মস্‌জেদ।

কোতোয়ালী দরওয়াজার দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং সদর রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে 'বলিয়া দীঘী' (?) ও 'কহনিয়া দীঘী' নামক দুইটী জলাশয়ের মধ্যস্থানে অবস্থিত। ইহা একটী ক্ষুদ্র মস্‌জেদ, গৌড়বাসিগণ রাজবিবির নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিম ৩৭ হস্ত এবং প্রস্থ ২৯ হস্ত; বড় একটী মাত্র গম্বুজ এবং পূর্ব্বদিকে ছোট ছোট তিনটী গম্বুজ আছে।

দীনকাক মস্‌জেদ।

'দীনকাক মস্‌জেদে'র তিনটী ডোম আছে; উহার নিকটে—উত্তর-পার্শ্বে একটি ভগ্ন গৃহ পথিকের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহা সম্ভবতঃ মস্‌জেদের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও তদীয় পরিবারবর্গের আবাস-ভবন ছিল।

পিঠাওয়ালী মস্‌জেদ।

কোতোয়ালী ফটকের সন্নিকটবর্ত্তী ও উহার উত্তর-পশ্চিমদিকে পিঠা-ওয়ালী মস্‌জেদ। ইহা একটী ক্ষুদ্র মস্‌জেদ; লোকে পিঠাওয়ালী মস্‌-জেদ নামে কেন অভিহিত করে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে এখান হইতে কেহ পিঠা বিতরণ করিত না কি? ১২৭৮ হিঃ (১৮৬১ খৃঃ) উহা খানিত হইয়া বর্ত্তমান কালে দর্শনের সমস্ত নিদর্শনই মুছিয়া ফেলিয়াছে।

বেগ মহম্মদ মস্‌জেদ।

গুন্মৎ মস্‌জেদের প্রায় ত্রিশ রশি উত্তরে পূর্ব্বোক্ত নামের এক ক্ষুদ্র মস্‌জেদ ও তাহার সম্মুখভাগে চিত্রিত ইষ্টকে গঠিত এক বারাণ্ডা দৃষ্টি-গোচর হয়। মস্‌জেদের ডোম প্রভৃতি এখন পড়িয়া গিয়াছে; উহার অপরদিকে বেগ মহম্মদ প্রভৃতির সমাধি বিদ্যমান আছে।

দারাস্ মস্‌জেদ।

মহদিপুর ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একখণ্ড ভূমিকে লোকেরা 'দারাস্ বাড়ী' (বক্তৃতা-গৃহ) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তথায় ইষ্টক-নির্ম্মিত ও প্রস্তরের স্তম্ভযুক্ত একটী বৃহৎ মস্‌জেদ ছিল; তাহার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৬৫ হস্ত এবং প্রস্থ ৩৮ হস্ত। উত্তর-দক্ষিণে সাত সারি এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে চারি সারিতে মোট আঠাইশটী গম্বুজ ছিল। এতন্মধ্যে উত্তরদিকের কতিপয় গম্বুজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১২৯৩ হিঃ (১৮৭৬ খৃঃ) মস্‌জেদের পার্শ্বস্থিত বনজঙ্গল পরিষ্কার করাইবার কালে, ইলাহিবক্সের সাক্ষাতে মৃত্তিকাস্তূপের মধ্য হইতে এক-খানি বৃহৎ প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার ভাবানুবাদ,—

"পরমেশ্বর বলিয়াছেন যে, তিনি সমস্ত মস্‌জেদের অধিকারী ; সুতরাং তাঁহার নামের সহিত কোন মানুষের নাম উল্লেখ করিও না। প্রেরিত পুরুষও বলিয়াছেন যে, যে কেহ পরমেশ্বরের নিমিত্ত মর জগতে একটী মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, পরমেশ্বর তদ্বিনিময় স্বরূপ স্বর্গধামে তত্তুল্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। এই মস্‌জেদ মোহাম্মদ শাহের পুত্র বারবক শাহ তৎপুত্র ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমতাশালী নরপতি—যিনি ইহ ও পর জগতের ভাস্করস্বরূপ, সেই আবুলমোজাঃফরইউসফ্ শাহ (পরমেশ্বর তাঁহার সিংহাসন রক্ষা করুন এবং তাঁহার বদান্যতা যেন সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। সন ৮৮৪ হিজরী।"

কুম্ভীর পীর।

খাদেমরসুলের উত্তর-পূর্ব্বে বৃহৎ একটী পাকা সমাধি-মন্দির এবং তন্নিকটে আরো কতিপয় সমাধি বিদ্যমান। উহার মধ্যে কতিপয়ের এমনি বিধ্বস্ত দশা যে, উপর হইতে কবর-মধ্যস্থিত নরকঙ্কালসমূহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তথায় একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার জল অতি স্বচ্ছ এবং তাহা বহু সংখ্যক কুম্ভীরের আবাস-স্থান (১)। নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই কুম্ভীরসমূহ কোন এক তেজস্বী সাধুর শিষ্য এবং কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, ঐ সকল কুম্ভীরের একটী স্বয়ং সেই সাধু পীর ছাহেব। উৎসব উপলক্ষে ছাগ বা মুরগ জবাই হইলে খাদিম উহাদের অস্থি ও চর্ম্ম একত্র পিণ্ডাকারে জড়াইয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকেন,—'বাবা শাহ খিজির, এই পিণ্ড গ্রহণ করুন্।' তদ্দণ্ডে একটী কুম্ভীর জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া তীরের নিকট আগমন করে এবং মাংসপিণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে পুনঃ প্রস্থান করে। যদিও সর্ব্বদাই উহাদিগের আমন্ত্রণ হইয়া

(১) র‍্যাভেন্‌শা ভিন্নরূপ লিখিয়াছেন।

থাকে, তথাপি সময়ে সময়ে নানা আহ্বানেও একটী কুম্ভীরও তটবর্ত্তী হয় না বা হইলেও পিণ্ড গ্রহণ করে না। সে ক্ষেত্রে পিণ্ডদাতা ভক্ত মনে করিয়া থাকে—তাহার নিজের কোন ক্রটীর জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে। * * * ইলাহিবক্স খাদিমের নিকট পীরের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, তাহার নাম—'বাবা শাহ খিজির (ইলিয়াস)' ছিল।

তাঁতিপাড়া মসজেদ। গৌড়বাসিগণ বলিয়া থাকে যে, ইহা 'উমর কাজি' কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তৎস্থানস্থিত সমাধিদ্বয়ের—একটী তাঁহার নিজের ও অপরটি তদীয় ভ্রাতা জুল কোরাসের।

অতঃপর ইলাহিবক্স চামকাটি মস্‌জেদ এবং ধনপত বা চাঁদ সওদাগরের বাসস্থানের বিষয় বিবৃত করিয়া 'লাটোন্‌কি মস্‌জেদের' উল্লেখ করিয়াছেন। প্রচলিত আছে, ইহা এক নর্ত্তকী বালিকা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

লাটোন্‌কি মস্‌জেদ।

ঘারিখানা (Gong house)। ইহা দুর্গ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে, দাখিল দরওয়াজার দক্ষিণে অবস্থিত। ঐ Gong (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) ইংরেজ বাজার কাচারীতে স্থানান্তরিত হইয়া ১২৭২ হিঃ (১৮৫৫ খৃঃ) ভগ্ন হইয়া যায়। ইলাহিবক্স সাগরদীঘীর উচ্চ তীর হইতে প্রায় ছয় মাইল ব্যবধানে থাকিয়া ঐ gong ভগ্ন হইবার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন।

সৈয়দ শাহ নিয়ামতুল্যা।

সৈয়দ শাহ নিয়ামতুল্যা দিল্লী প্রদেশের করন্‌উল স্থানের অধিবাসী এবং একজন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী। তিনি পর্য্যটন-ব্যপদেশে রাজমহলে উপনীত হইলে সুলতান সুজা কর্ত্তৃক মহাসমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন। অবশেষে তিনি গৌড়ের ফিরোজপুর মহল্যায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন;

সেই স্থানেই তিনি কাহারো মতে ১০৭৫ হিঃ (১৬৬৪ খৃঃ)। কাহারও কাহারও মতে ১০৮০ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তাহার মস্জেদে হোসেন শাহের আমলের ৯১৮ হিজরীর এক লিপি-ফলক আছে (র্যাভেন্‌শা এবং কানিংহাম কর্ত্তৃক তাহা উল্লিখিত হইয়াছে)। এই মস্জেদের সীমানার মধ্যেই আর একখানি লিপি-ফলক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সন ইলাহিবক্সের মতে ৮৭০ হিঃ ১০ই জুল হিজ্জা; কিন্তু র্যাভেন্‌শা ৯৭০ হিঃ ১লা জুল হিজ্জা (২২ জুলাই ১৫৬৩ খৃঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই লিপিতে খাঁ জাহান কর্ত্তৃক এক ফটক নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে ;—

"পরমেশ্বর বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির ঈশ্বরে এবং সেই শেষের দিনে বিশ্বাস আছে, যে উপাসনা করে এবং ভিক্ষা দেয়, যে এক পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় করে না—প্রকৃত প্রস্তাবে যাহারা সৎলোক, তাহারাই পরমেশ্বরের মস্জেদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি ঈশ্বরের একটী মস্জেদ নির্ম্মাণ করে ইত্যাদি···। এই মস্জেদ সদাশয় ও ধার্ম্মিক নরপতি আবুল মোজাঃফর হোসেন শাহের রাজত্বকালে, আবা আলি ওরফে মজলিমুল-মজালিসের—(ভগবান তাঁহাকে ইহ পর জগতে উন্নতিশালী করুন) পুত্র আবু মহাম্মদ কর্ত্তৃক ১৪ই রজব তারিখে (সনের অংশটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে) নির্ম্মিত হইয়াছে।

"পরমেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্য—'মস্জেদ পরমেশ্বরের সম্পত্তি।' এই প্রবেশদ্বারের নির্ম্মাতা—খাঁ জাহান ; ১০ই জুলহিজ্জা ৮৭০ হিজরী।"

আকবরের সময়ে এক খাঁ জাহান ছিলেন কিন্তু ৯৭০ হিজরী (১৫৬৩খৃঃ) তাঁহার গৌড়ে আগমন কিছু অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আসিলেও তিনি নিজের দেশ ছাড়িয়া এদেশে মস্জেদ নির্ম্মাণ করিবেন কেন, বুঝা যায় না।

জামি মস্জেদ বা খোজা মসজেদ। র্যাভেন্‌শা :' ছোট

সোণা মস্‌জেদ' লিখিয়াছেন। এক খোজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত; ইহার দুইটি সমাধিই নকল সমাধি। অপর কাহারো মতে উহা নকল নহে, খোজার আত্মীয়দের সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

অস্‌লৎ খাঁ হফ্‌ত কল্‌মি মস্‌জেদ। অস্‌লৎ খাঁ হফ্‌ত কল্‌মি নামক বণিকের সমাধি; ইনি সুলতান সুজা এবং নবাব জাফর খাঁর সময়ে জীবিত ছিলেন। ইনি সাতটী বিভিন্ন ভাষাক্ষরে লিখিতে পারিতেন।

মুকদুম সেখ আখি সিরাজুদ্দীন। (১)

শুনিতে পাওয়া যায় সেখ আখি সিরাজুদ্দীনই নাকি প্রথম হিন্দুস্থানী ব্যক্তি, যিনি দিল্লীর নিজামুদ্দীন আউলিয়া কর্ত্তৃক সাধু আখ্যায় আখ্যাত হন। তাঁহার মাতা গৌড়ে অবস্থান করিতেন তজ্জন্য তিনি আউদ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। ব্লকম্যানের মতে, ৭৫৮ হিঃ বা ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং ইলাহি বক্‌সের মতে ৭৪৩ হিঃ (১৩৪২ খৃঃ) ১লা সাওল তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সময়-নিরূপক বাক্যের ভাবার্থ এই—"শীঘ্রবল—আজ ইদল—ফতের দিন।"

ফেরিস্তা বলেন যে, সিরাজুদ্দীন, নূরকুতবের পিতামহ হইতেন। তিনি বাল্যকালে অজ্ঞ অবস্থায় দিল্লী হইতে সমাগত হইলে ফখ্‌রুদ্দীন ইরাদি (সম্ভবতঃ জারাদি) স্বহস্তে তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। ইলাহির মতে, নজামুদ্দীনের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ৭২৮ হিজরীতে তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(১) কানিংহাম্ বলেন যে, এই সাধু 'পুরাণ পীর' (old saint) নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু ইলাহিবক্স তাঁহার উপাধি 'পিরানো পীর' '(পীর-পীরাসান'এর সমান) বা সাধুর সাধু উল্লেখ করিয়াছেন। ফেরিস্তা তাঁহার উপাধি—'পারওয়ানা' (দারোগা লিখিয়াছেন।

গঙ্গারামপুর।

ইংরেজবাজারের উত্তর-পশ্চিমে আট মাইল দূরে গঙ্গারামপুর অবস্থিত। প্রাচীন কালে ইহা একটী বৃহৎ নগর ছিল এবং পুরাতন অট্টালিকাদির শেষ নিদর্শন এখনও তথায় বিক্ষিপ্ত আছে। হজরত মুকুদুম শাহ জালালউদ্দীন তাব্রিজির 'তাকিয়া'(বিশ্রাম-স্থান) তথায় ছিল। গ্রামবাসীরা বলিয়া থাকে যে, বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি রাজা বল্লাল সেনের রাজধানী এই গঙ্গারামপুরেই ছিল। ইহাই ক্যানিংহামের লিখিত মালদহের দক্ষিণ দিকৃস্থ সেই গঙ্গারামপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লী।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

কল্যাণেশ্বরী।

(৫)

আজ গৌড় নগরে মহাসমারোহ। বিশাল রাজপথের মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম তোরণসমূহ পত্রপুষ্পে ভূষিত হইয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তোরণের সম্মুখে কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ মাঙ্গল্য চিহ্ন স্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। তোরণের উপরিভাগ হইতে নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুমধুর বাদ্যধ্বনি তরঙ্গায়িত হইয়া সুদূর দিগন্ত-ক্রোড়ে মিলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি আনন্দতরঙ্গ তুলিতেছে। তোরণশীর্ষে নানা বর্ণের মঙ্গল পতাকা হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। রাজ-পথে লোক জন প্রতিনিয়ত ছুটাছুটি করিতেছে। ভারে ভারে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া বাহকগণ চলিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে প্রহরিগণ সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও বা হস্তে কাহারও বা স্কন্ধে স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত দণ্ডাদি শোভা পাইতেছে। সমস্ত নগর যেন মহোৎসবে মগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাজ-প্রাসাদে উৎসবের ঘটা অধিক পরিমাণেই বিদ্যমান। স্বাভা-বিক ও কৃত্রিম উভয়বিধ পত্রপুষ্পে প্রাসাদ সজ্জিত হইয়াছে। নানা পতাকা তাহাকে সুশোভিত করিয়াছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে কারুকার্য্য-যুক্ত বিশাল চন্দ্রাতপ নীলাকাশকে আচ্ছাদিত করিয়াও তাহার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। নানা প্রকারের বাদ্যে প্রাসাদ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির বিরাম নাই। নানাপ্রকার মাঙ্গল্য চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রাসাদ পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতীত হইতেছে। প্রাসাদ-তোরণ হইতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মাঙ্গল্য চিহ্ন

বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজকন্যা সাধনার বিবাহের জন্যই যে, এই উৎসবের অনুষ্ঠান তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

কয়েক দিন হইতেই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আজই তাহার ঘটা অধিক, কারণ আজই সাধনার বিবাহের দিন। বিবাহ আরও কিছু দিন পূর্ব্বে হইত, কিন্তু যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগত না হওয়ায় বিলম্ব ঘটিয়াছে। বল্লালের বার্দ্ধক্যাবস্থায় লক্ষ্মণ সেনই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। পিতার সহিত লক্ষ্মণের তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় তিনি দূরেই থাকিতে ভাল বাসিতেন। গৌড় অবশেষে তাঁহার নামানুসারে লক্ষ্মণাবতী নাম ধারণ করিলেও নবদ্বীপ ও বিক্রমপুর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। লক্ষ্মণ আজই বিক্রমপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি সাধনার বিবাহের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং পথিমধ্যে পত্রবাহকের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া দ্রুতগতিতে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হন। যে দিন উপস্থিত হইবেন পূর্ব্বে তাহার সংবাদ দিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন গৌড়ে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, বল্লাল সেন শ্যামরূপাকে বিবাহের যৌতুক দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া ক্ষোভে ও ক্রোধে তিনি জ্ঞানহারা হইয়া পড়েন। শ্যামরূপা সেনবংশের কুলদেবতা। বল্লাল যখন তাঁহাকে যৌতুক দিতে সম্মত হইয়াছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মতিভ্রম ঘটিয়াছে, লক্ষ্মণ ইহাই স্থির করিলেন। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া পিতামাতার পদধূলি লইলেন। পরস্পর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার পর লক্ষ্মণ পিতাকে বলিলেন, "সাধনার বিবাহ কি আজই হইবে?"

"আজই হইবে বৈ কি, কেন, বিবাহের দিনের কথা তোমাকে ত জানান হইয়াছে।"

"অনেক বার ত দিনের কথা শুনিয়াছি।"

"তা সত্য, তোমার আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া ক্রমাগত দিনের পরিবর্ত্তন হইতেছিল।"

"তবে আজও পরিবর্ত্তন করিলে কি কিছু হানি আছে!"

"তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আর পরিবর্ত্তন করা ভাল দেখায় না। বরপক্ষ দিন পরিবর্ত্তনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

"যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আজই বিবাহ হউক; কিন্তু একটা কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

"কি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

"বিবাহে কি যৌতুক দিবেন স্থির করিয়াছেন?"

"রত্ন, আভরণ, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি যাহা যৌতুক দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই দিতে হইবে।"

"আর কিছুই দিবার কি ইচ্ছা করেন নাই?"

বল্লালসেন একটু বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—

"হাঁ, করিয়াছি।"

"কি করিয়াছেন, শুনিতে পাই না কি?"

"অবশ্য পাইবে, মাতা শ্যামরূপাকে যৌতুক দিব মনে করিয়াছি।"

"আপনার মতিভ্রম ক্রমেই গুরুতর হইতেছে।"

"কি, এত বড় কথা! বল্লাল সেনের সমক্ষে কে তাঁহার মতিভ্রমের কথা বলিতে সাহস করে?"

"তাঁহারই পুত্র, বঙ্গরাজ্যের ভাবী সম্রাট্ লক্ষ্মণ সেন।"

"বঙ্গরাজ্যের ভাবী সম্রাট্?" বলিয়া বল্লাল সেন হাসিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন,—

"কেবল বঙ্গরাজ্যের নয়, অর্দ্ধ ভারতের ভাবী সম্রাট্।"

বল্লাল এবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

"সে কথার তর্ক এক্ষণে আমি আপনার সহিত করিতে চাহি না। আপনি শ্যামরূপাকে যৌতুক দিতে পারিবেন না।"

"বল্লাল সেন যে অঙ্গীকার করিয়াছে কখনও তাহা ভঙ্গ করিবে না।

"অন্যায় অঙ্গীকার ভঙ্গে কোনই দোষ নাই।"

"বল্লাল সেনের অঙ্গীকার অন্যায়, একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে ?"

"আমিই বলিতেছি।"

"কিসে অন্যায় হইল ?"

"কিসে নয় ? যে অঙ্গীকারে কুলদেবতার বিসর্জ্জন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অন্যায়, অসঙ্গত, গর্হিত।"

"কুলদেবতার বিসর্জ্জন ?" বলিয়া বল্লাল সেন 'হা হা' রবে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

"বিসর্জ্জন বৈকি ?"

"বিসর্জ্জন নয় প্রতিষ্ঠা।"

"সেন বংশের কুলদেবতা শিখরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন নূতন কথা বটে! বীর সেন হইতে বিজয় সেন পর্য্যন্ত সেনবংশের মহাপুরুষগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন, সন্দেহ নাই।"

"বল্লাল সেন কাহারও পরিহাসের পাত্র নন। তাঁহার যাহা অভিরুচি তাহাই হইবে।"

"কুলদেবতার সহিত সমস্ত বংশেরই সম্বন্ধ, তাঁহার একের নহে।"

"সমস্ত বংশের যিনি বর্ত্তমান প্রতিনিধি, তাঁহারই ইচ্ছা প্রবল হবে।"

"কে বর্ত্তমান প্রতিনিধি, তাহার বিচার করিবে কে ?"

"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! বল্লাল সেন জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেনবংশের প্রতিনিধি বলিতে চাহে, বিশেষতঃ তাঁহার অযোগ্য পুত্র!"

"অযোগ্য কি যোগ্য, তাহার পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।"

"তোমার যোগ্যতা তোমাতেই থাকুক। অমি কেবল শ্যামরূপা নহে, সমস্ত বঙ্গসাম্রাজ্য সাধনার বিবাহে যৌতুক দিব। দেখি, কে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করে।"

"আমিই করিব" বলিয়া সাধনা সেই সময়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মহারাণী বলিলেন, "তুই এ সময়ে এখানে আসিলি কেন?"

"বেশ করিয়াছি মা। তুমি কাহাকেও থামাইতে পারিলে না?"

"কেমন করিয়া থামাইব, কাহার মুখে হাত দিব মা! পিতাপুত্রের কলহ কে থামাইতে পারে?"

সাধনা লক্ষ্মণ সেনের পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, আমাকে কি একেবারে বিসর্জ্জন দিতে চান?"

"কেন ভগিনি! সে কথা বলিতেছ কেন?"

"শিখরভূমির পাহাড়ে আমাকে পাঠাইতেছেন, আমার সঙ্গে কি কাহাকেও দিবেন না?"

"কেন তোমার সঙ্গে কি দাস দাসী যাইবে না?"

"তাহাতে কি আমার তৃপ্তি হইবে? তাই মা শ্যামরূপাকে আমি চাহিয়াছি।"

"তুমি চাহিয়াছ? না রাজা কল্যাণশেখর চাহিয়াছেন?"

"তাহা আমি জানি না, তবে আমি যে চাহিয়াছি ইহা সত্য।"

"কিন্তু কুলদেবতা কি কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায়?"

"কুলের বাহির করিবেন কেন? আমাকে দিবেন।"

"তোমাকে ত অন্য কুল আশ্রয় করিতে হইতেছে।"

"তাই বলিয়া কি এ কুলের সহিত আমার সম্বন্ধ ঘুচিল?"

"সম্বন্ধ না ঘুচিলেও তোমাকে ত কেহ এ কুলের লোক বলিবে না।"

"না বলিলেও আমি পিতৃকুলের সম্বন্ধ ছাড়িতে পারিব না। আপনি বঙ্গ-রাজলক্ষ্মীকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখুন। আমায় শ্যামরূপাকে ছাড়িয়া দিন।"

লক্ষ্মণ সেন বলিলেন,—

"সে কথার উত্তর এখন আমি দিতে পারিতেছি না।"

মহারাণী বলিলেন,—"তবে কি আজ সাধনার বিবাহ হইবে না?"

"বিবাহ হইবে বৈ কি? আমি এখনই তাহার আয়োজনে চলিলাম"

বলিয়া লক্ষ্মণ সেন তথা হইতে চলিয়া গেলেন। আর আর সকলেই ক্রমে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

যথা সময়ে বিবাহ আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর কল্যাণশেখরকে লইয়া বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত বিবাহমণ্ডপ দান-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছিল। যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণের পর বল্লালসেন কল্যাণশেখরকে সাধনা সম্প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আমি রত্ন, অলঙ্কার, শয্যা, আসন প্রভৃতি দান-সামগ্রীসহ সাধনাকে রাজা কল্যাণশেখরকে সম্প্রদান করিলাম। আর মাতা শ্যামরূপাকে যৌতুক দিলাম।"

লক্ষ্মণসেন পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"শ্যামরূপাকে যৌতুক দিবার অধিকার কাহারও নাই।"

শুনিয়া কল্যাণশেখর সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তাঁহাকে স্থির থাকিতে বলিলেন। সে দিবস নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ-ব্যাপার সংসাধিত হইয়া গেল।

কল্যাণকূট পর্ব্বতমালার পাদদেশে শোভনপুর গ্রাম কয়েকখানি তৃণ-কুটীর বক্ষে লইয়া বিরাজ করিতেছিল। বর্ষার মেঘ আজ যেন শোভন-পুরের আকাশ হইতে সরিয়া কোন্ দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে। মেঘমুক্ত তপনের নবালোকে গ্রামখানি হাসিয়া উঠিতেছিল। এদিকে ওদিকে শ্যামল বৃক্ষপত্রের উপর প্রভাতের রৌদ্র পড়িয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। কিছু দূরে কল্যাণকূটের শিখরস্থ প্রস্তরপুঞ্জের গায়ে সূর্য্যকিরণ লাগিয়া হীরকখণ্ড বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। প্রান্তরে কৃষকগণ গ্রাম্যগীতি গাহিতে গাহিতে ধান্য-রোপণে নিযুক্ত ছিল। গো, মেষ, মহিষ দলে দলে শ্যামল নবীন তৃণরাজি ভক্ষণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিল। রাখালগণ বৃক্ষতলে বসিয়া কাহিনীর স্রোত বহাইতেছিল ও মধ্যে মধ্যে গো-মহিষ-গণকে ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছিল।

৩

শোভনপুরে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস। ইঁহারা বল্লালসেনের কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ না করিলেও আচার ও বিনয়াদিতে বিশেষরূপই অনুরক্ত ছিলেন। শিখরভূমিতে বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রবেশ করে নাই। সেইজন্য ইঁহারা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শিখরভূমির অধিপতিগণ ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতেন। শোভনপুরের ব্রাহ্মণ-বংশে রোহিণীর জন্ম একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রোহিণী বাল্যকাল হইতে নিষ্ঠাবান ছিলেন। দেবতা ও সন্ন্যাসীতে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। আমাদের পরিচিত সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত তাঁহার যে বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন প্রভাতে রোহিণী প্রাতঃ-সন্ধ্যা সমাপন করিয়া আসিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন,—

"ব্রাহ্মণী আজ যেন বোধ হইতেছে, সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেখা পাইব এবং মা শ্যামরূপারও সাক্ষাৎলাভ হইবে।"

"তুমি ত মাঝে মাঝে ঐ কথা ব'লে থাক। কোথাকার এক সন্ন্যাসী এসে তোমাকে কেমন কেমন ক'রে দিয়ে গেল।"

"ও কথা বলিতে হয় না ব্রাহ্মণী, সন্ন্যাসী ঠাকুর সাক্ষাৎ মহাপুরুষ।"

"কি জানি আমরা অত বুঝি সুঝি না। তবে সেনবংশের দেবতা শিখরে আস্‌বেন একথায় কিছুতেই প্রত্যয় হয় না।"

"আসেন না আসেন দেখ্‌তেই পাবে।"

"যখন দেখ্‌তে পাব তখন প্রত্যয় ক'র্‌ব।"

"বোধ হয়, আজই দেখ্‌তে পাবে।"

"যাও, তোমার ও কথা রেখে দেও, কবে আস্‌বেন তার ঠিকানা কি?"

"সত্য ব্রাহ্মণী, শয্যা হইতে উঠিয়াই আমার মনে হচ্ছে, যেন সন্ন্যাসী ঠাকুর আজই মা শ্যামরূপাকে নিয়ে আস্‌বেন আর মা এখানে আসিয়া কল্যাণেশ্বরী হইবেন।"

"এখানে কি ? শোভনপুরে ?"

"তা হ'তেও পারে, মা কল্যাণকুটে থাকিবেন ; কিন্তু সেখানে যত দিন তাঁহার মন্দিরপ্রতিষ্ঠা না হয় তত দিন কোথায় থাকিবেন।"

"তবে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা না হ'লে তাঁহার আসাই হবে না।"

"তা বটে, কিন্তু আজ শয্যা থেকে উঠিয়াই সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে মাকে নিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর আজই আসিবেন। কেন হচ্ছে তা ব'ল্‌তে পারি না।"

"কি জানি, তোমার মনে মাঝে মাঝে ও কি রকম হয় বুঝ্‌তে পারি না।

"যা হউক আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকার প্রয়োজন।"

"আমরা আবার কিসের জন্য প্রস্তুত হ'তে যাব ?"

"যদি তাঁহারা এ দিক্ দিয়া যান্ ; যান্ কি, এ দিক্ দিয়াই ত কল্যাণ-কুটে যাইতে হইবে।"

"ভাল, তাতে আমরা প্রস্তুত হব কেন ?"

"মায়ের পূজার আয়োজনাদি আমরা না করিলে কে করিবে ?"

"সন্ন্যাসী ঠাকুর কি তাহা বলিয়া গিয়াছেন ?"

"না গেলেও আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদিগকে তাহার আয়োজন করিতে হইবে।"

"কেন রাজা বিয়ে ক'রে মা'কে যৌতুক নিয়ে আস্‌ছেন। তাঁর সঙ্গে কি লোক জন নেই ?"

"থাক্‌লেও তাহারা ঠিক পূজার আয়োজন ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমাদিগকেই তার আয়োজন কর্ত্তে হবে।"

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক চিত্র।

আশীরগড় দুর্গ।

(১ম প্রস্তাব।)

মধ্য প্রদেশের (Central Province) অন্তর্গত নিমার জেলার অধীন আশীরগড় নামক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু দুর্গ, এক সহস্র বর্ষাধিক পুরাতন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন প্রখ্যাত ক্ষেত্র, তেমনি প্রয়োজনীয় রাজপ্রাসাদ বলিয়া পরিগণিত। এই সুপ্রাচীন সেনানিবাস ও হিন্দুরাজনিকেতনের ইতিহাস, বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইংরাজ লেখকগণ এতদ্বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিবরণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ফেরেস্তা ভিন্ন আর কেহ আশীরগড় দুর্গ সম্বন্ধে প্রামাণিক বিবরণ লেখেন নাই; পণ্ডিতাগ্রগণ্য ফেরেস্তা মহোদয় এক সময়ে স্বয়ং এই দুর্গাভ্যন্তরে উপস্থিত থাকিয়া ইহার আদিম ইতিহাসের কথা সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং ফেরেস্তার লিখিত বিবরণ যেমন প্রামাণিক তেমনি প্রয়োজনীয়। ইউরোপীয় লেখকদিগের মধ্যে বৃগ (Brigg) সাহেব, কর্ণেল ব্লেকার, লেফ্‌টেনেন্ট্‌ ফোরসাইথ ও ম্যাল্‌কম্‌ মহাশয়দিগের সংগৃহীত বিবরণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু

ইহা বলা বাহুল্য যে, মুসলমান ও ইউরোপীয় লেখকগণের মধ্যে আশীর-গড়ের ইতিহাস কেহই বিস্তৃত ভাবে লেখেন নাই। হিন্দুরাজাদিগের সভাসদ্ গণের মধ্যে দুই এক জন যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এমন জটিল ও সামান্য যে, তাহা পাঠ না করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় বলিয়া বোধ হয় না। আমি ইংরাজি ১৮৮৯ অব্দে সর্ব্বপ্রথম আশীরগড় দুর্গ দর্শন করিয়াছিলাম; কিন্তু সে সময়ে নানা কারণবশতঃ ইহার কোন বিব-রণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। বাঙ্গালা ১৩১০ সালে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারিগণ আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করায় আমি কাগজাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক খাণ্ডোয়া নাম্নী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বঙ্গীয় ১৩১৫ সালের শরৎ ঋতুতে আমি মধ্য প্রদেশের কতকগুলি হিন্দু নরপতির করদ রাজ্য পরিভ্রমণ করিবার সময় তৃতীয় বার এই সুপ্রখ্যাত দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক ইহার প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক বিবরণমালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি এবং মুসলমান ও ইংরাজ লেখকদিগের লিখিত কাগজপত্রাদির সহিত মিলাইয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিয়াছি। সমস্ত প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে এই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে, এক সময়ে আমাদের প্রাচীন হিন্দু জাতি এমন প্রবল পরা-ক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, অতীব নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত তখন রাজনীতির জটিল ও কুটিল বিদ্যায় কেবল পারদর্শী ছিল তাহা নহে, পরন্তু সমর-নীতিতে এমন অভ্যস্ত ছিল যে, তাহারাও মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে পারিত। ঐরূপ অনেক নিম্নজাতীয় বীর পুরুষ, ভারতবর্ষের নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। এবম্প্রকারের বহু প্রাচীন রাজ্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি অদ্যাপি যাহা বর্ত্তমান আছে তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

আশীরগড় দুর্গ যাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তিনি আহীরজাতীয় ছিলেন; আহীরেরা মেষপালন, কৃষিকার্য্য, দাসত্ব, গোপালন, দুগ্ধ-দধি-বিক্রয়, শকট-চালন, পাল্কীবহন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা মধ্য ভারতে দিনপাত করিয়া থাকে।

আশীরগড় দুর্গ সপ্তপুর (সাতপুরা) পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত; সমুদ্রতীর হইতে ইহার উচ্চতা দুই সহস্রাধিক ফিটের অধিক। খাণ্ডোয়া নগরী হইতে ইহা প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। গড়ের উপরাংশ পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিক্ পর্য্যন্ত চব্বিশ শত হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ ছয় শত হস্ত পরিমাণ প্রশস্ত। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সময় দুইটি পথ ভিন্ন অন্য পথ দেখা যায় না, এই দুই পথ যেমন দুর্গম তেমনি সুদৃঢ়। সহজে শত্রুপক্ষীয় লোক ইহাকে অতিক্রম করিতে সাহসী বা সমর্থ হয় না। বর্ত্ম দ্বয় কঠিন প্রস্তরের প্রাচীরের দ্বারা সমাবৃত; তাহার মধ্যে মধ্যে অতি প্রাচীনকালের কামানসমূহ এমন ভাবে সাজান আছে যে, চতুর্দ্দিকস্থ বৈরীচমূনিচয় সহজেই আক্রান্ত ও নিহত হইতে পারে। এই গড়ের উপরে অনেক কূপ, সরোবর ও দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে, তজ্জন্য কখনও জলকষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ গহন বনে সমাচ্ছন্ন, সেখানে এমন সুদৃঢ় প্রস্তরপুঞ্জ দ্বারা প্রবেশ-পথসমূহ বাঁধান যে তাহা ভেদ করিয়া পর্ব্বতের উপরে আগমন করা অনেক সময়ে মানব-সামর্থ্যের অতীত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ দিয়া গড়ের মধ্যে প্রবেশের যে পথ আছে তাহা দ্বিতীয় পথ হইতে সহজ; প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে ৩০ ফিট উচ্চ পাথরের প্রাচীর এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অভ্রভেদী অত্যুচ্চ গিরিমালা। অন্য পথের প্রবেশ-দ্বারে এই রূপ প্রাচীর, কিন্তু তাহার পরে গহন বন। খৃষ্টীয় ১৮১৭ অব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই দুর্গকে আশ্রয় করিয়া বৃটীশ সেনাদলের সহিত যুদ্ধে প্রখ্যাত ইউরোপীয় বীরগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধের বিবরণে কর্ণেল ব্লেকার সাহেব লিখিয়াছিলেন "More than

once we considered the fortress impenetrable and the avenues impassable" *

সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি লেফটেনেণ্ট ফোরসাইথ লিখিয়াছেন, "আশীর-গড় দুর্গ, ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে আহীর নামক এক জাতীয় জনৈক বীরপুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু গড়ের অভ্যন্তরস্থ কামান ও অস্ত্রাদি লক্ষ্য করিলে নিশ্চয় ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে হিন্দুজাতিগণ যখন সমরবিদ্যায় সমুন্নত ছিল এবং প্রকৃষ্টরূপে কামানাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল তখন এই দুর্গ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।" † প্রখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক এবং রোমান্ কাথলিক পাদ্রী মন্‌ৎ কেফেঁ সাহেব খৃষ্টীয় ১৮৪৬ অব্দে আশীর গড় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই দুর্গ যেমন প্রাচীন তেমনি দুর্ভেদ্য; ইহা হিন্দুজাতির রাজনৈতিক সামর্থ্য ও অতুল পরাক্রমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মতে, ফরোকী বংশসম্ভূত নশীর খাঁ কর্ত্তৃক আশা আহীর নামক জনৈক হিন্দুবীর মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইবার পরে ইহা মুসলমানের হস্তগত হয়। নশীর খাঁ খৃষ্টীয় ১৩৯৯ হইতে ১৪৩৭ অব্দ পর্য্যন্ত খান্দেশ প্রদেশে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। "মজ্-মুয়া জুলালী" নামক ইস্‌লামীয় ইতিহাসে লেখা আছে, ধূর্ত্ত নশীর খাঁ বীরবর আশা আহীরকে মল্লযুদ্ধে অন্যায় রূপে পরাজিত করিয়া একেবারে দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। নশীর খাঁএর ভ্রাতা মালিক ইফ্‌তীকার মিঞা, নশীর খাঁএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে অনেক দিবস হইতে সাতপুরা পর্ব্বতের তলে বাস করিতে

* Colonel Blacker's "Mahratta Campaigns" of 1817 and 1819.

† The bastions and the gate defences of the fort evidently belong to a period when the use of fire-arms, and even of heavy artillery had been brought to considerable perfection.—Lieutenant J. Forsyth (Bengal Army).

ছিল, তাহার বাস বাটীর পার্শ্বে আশা আহীরের একটি ছোট দুর্গ ছিল, এই দুর্গে আশা কখন কখন আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিত। মল্লযুদ্ধের পরে একদিন অকস্মাৎ নশীর খাঁ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল "বন্ধু আশা! আমার পরিবারস্থ সকলেই এক্ষণে পীড়িত, অতএব তোমার দুর্গে আমার বাটীর স্ত্রীলোকগণকে কিছুকালের জন্য স্থান দিতে হইবে। এরূপ জল বায়ুর পরিবর্ত্তন ভিন্ন রোগোপশমের অন্য ভরসা নাই।" আশা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া সরল মনে দুর্গ প্রবেশের অনুমতি দিল। পাল্কী বাহকেরা দলে দলে আসিয়া পাল্কী স্কন্ধে লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। আশা মনে করিল, পাল্কীর ভিতরে অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা আছেন, সুতরাং সামাজিক নিয়মানুসারে বেগমগণের সম্মানার্থ দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিয়দ্দূরে পাল্কী থামিলে পর আশা দেখিল, পাল্কীর ভিতরে অস্ত্রশস্ত্রধারী মুসলমান বীরসমূহ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহারা আশা আহীরকে একাকী পাইয়া তাহাকে বধ করিল এবং দুর্গটি যবনাধিকারভুক্ত করিয়া লইল। অনেক দিবস পর্য্যন্ত এই দুর্গ মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া পুনরায় হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়; কিন্তু খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দে ফিরোকী নামক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তাদিগের নানা প্রকার অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ আকবর এই দুর্গ তাহাদের হস্ত হইতে গ্রহণ করেন এবং প্রবল যুদ্ধে ঐ বংশের শেষ নরপতি বাহাদুর সাহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং তাঁহার চল্লিশ সহস্র সেনাকে স্থানান্তরিত করিয়া দেন। এইরূপে বহুসংখ্যক বেতন ভোগী ও বৃত্তিভোগী সেনা এবং সাধারণ জনগণ, জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় এবং তজ্জন্য সম্রাট্ আকবরের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তৃগণ অতি সত্বরে এবং সহজে আশীরগড় দুর্গ ও তাহার নিকটস্থ পরগণাসমূহ অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। আশীর গড়ের যুদ্ধে মোগলকুলতিলক আকবর স্বজাতীয়

মুসলমান নরপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, হিন্দুর সহিত তাঁহার কোন প্রকার মনোবাদ হয় নাই, কিন্তু তথাপি দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ফটকে পারস্য ভাষায় তিনি যুদ্ধ-জয়ের প্রশংসা-সূচক একটি শ্লোক খোদিত করিয়াছিলেন, ঐ শ্লোক অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার অনুবাদ এই——

"আশীরগড় দুর্গ স্বর্গের দ্বারের ন্যায় উচ্চ, ইহা কখন কাহারও দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিজিত বা অধিকৃত হয় নাই। সম্রাট্ আকবর তাঁহার শাসনকালের পঁয়তাল্লিশ বর্ষে ইহা জয় করেন। খালির উল্লা জলালুদ্দীন মহম্মদ আকবর সম্রাটবর ধন্য হউন। পরমেশ্বরের সাহায্যে তিনি ইহা অধিকার করিলেন; অতএব দয়াময় ভগবান ধন্য হউন। পরমেশ্বর, সপ্ত পৃথিবীর কর্ত্তা এবং সমস্ত বিশ্বের নেতা।"

ঐ শ্লোকের নিম্নে আর একটি শ্লোক লিখিত আছে—"সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সম্রাট্ আকবরকে সামর্থ্য দান করায় তিনি ১০০৯ হিজরী বর্ষে এই আশীরগড় দুর্গ অধিকার করিলেন।" এই শ্লোকের রচয়িতা মহম্মদ মাশুন, ইহার নাম শ্লোকদ্বয়ের নীচে খোদিত আছে। ১০০৯ হিজ্‌রী বর্ষ খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দ।

মহারাষ্ট্রীয় বীরদিগের আক্রমণকাল পর্য্যন্ত আশীরগড় দুর্গ মুসলমানদিগের হস্তগত ছিল। সম্রাট্ সাজেহানের সময়ে এখানে যে মনোহর মশিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতেও একটা শ্লোক খোদিত আছে, এই মশিদ একটা প্রকাণ্ড সরোবর-তটে অবস্থিত। এই মশিদে বর্ত্তমান কালের মশিদের মত কোন প্রকার গঠন নাই, দুই পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ আছে। বোধ হয় কোন হিন্দু-মন্দির ভগ্ন করিয়া এই মশিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গের আর এক স্থানে (দক্ষিণ-পশ্চিম ফটকে) একটা শ্লোক এখনও পরিষ্কার ভাবে পাঠ করা যায়। সম্রাট্ আওরংজেব তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করিয়া আশীরগড় অধিকার করেন। এই শ্লোকে যাহা খোদিত আছে তাহা এই :—

"ধর্ম্মরক্ষক যুবরাজ আওরংজেব ঈশ্বরেচ্ছায় চিরজীবন পরাক্রমী থাকুন। ইনি এক্ষণে সম্রাট্ আকবরের সিংহাসনে অধিরূঢ়। তরবারির তেজে ইনি পিতার পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি এই শ্লোকের লেখক, কিন্তু অধিক বিবরণ আর লিখিব না। সম্রাট্ কিশ্‌ বর্‌গীর সমস্ত দেশের বিজয়ী প্রভু। এই দুই অক্ষরে অর্থাৎ "বে" এবং "কাফ্‌" (এই দুই অক্ষরে) তারিখ বুঝিয়া লইবেন।" লেখকের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু মুসলমান পঞ্জিকা মতে (অর্থাৎ আরবা জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে) "বে" ও "কাফ্‌" এই অক্ষর দ্বয়ের দ্বারা ১০৬৯ হিজ্‌রী বুঝায়, ইহা ১৬৫৮ খৃঃ অব্দ। এই শ্লোকের নিম্নস্থ আর একটি শ্লোকে "লেখক ভৃত্যবর আহ-ম্মদ নজুন" এইরূপ খোদা আছে। এই শ্লোক অস্পষ্ট।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফটকে যে প্রকাণ্ড ও পুরাতন কামান অদ্য পর্য্যন্ত সুরক্ষিত আছে, তাহা সম্ভবতঃ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বুর্হানপুর নামক নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুর্হানপুর এক্ষণে হয়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের রাজ্যভুক্ত। ব্লেকার সাহেব লিখিয়াছেন "This large gun is a magnificent specimen of native gun-casting." এই কামান, ভারতবর্ষীয় কামান প্রস্তুত-প্রণালীর অতীব শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন। এই সুবৃহৎ কামানটির নাম "হস্‌ৎ দৎ", ইহা অষ্টধাতুতে নির্ম্মিত অর্থাৎ ইহা সুবর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ, পিতল, দস্তা ও কাঁসা এই কয়েকটি ধাতুর সহযোগে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। কামানটির আকৃতি এইরূপ—

দৈর্ঘ্য	২১ ফিট ৫ ইঞ্চ
প্রস্থ	৬ ফিট ২½ ইঞ্চ
পরিধি	১ ফুট ১১½ ইঞ্চ
ব্যাস	½ ফুট ⅛ ইঞ্চ
ছিদ্রের লম্বাই	৮½ ইঞ্চ
ছিদ্রের গভীরতা	৪½ ইঞ্চ
নলের দৈর্ঘ্য	৫ ফিট ৭ ইঞ্চ

সমস্ত কামানটির ওজন ... ৭২ টন (এক টন প্রায় ২৭॥৴
সেরের সমতুল্য)

এই সুবিশাল কামানের উপর পারস্ত ভাষায় যে শ্লোক খোদিত আছে তাহার অনুবাদ এই—

"মনুষ্য অন্ধ হইলেও ক্ষতি নাই ; অন্ধেরাও যদি এই কামান ব্যবহার করে, তাহা হইলেও পৃথিবী দ্বিখণ্ড হইয়া যাইবে। ইহার শব্দে মনুষ্যের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।" এই কামানের পার্শ্বে আর একটি কামান আছে তাহার নাম "ফলক্ হৈবৎ", ইহার অর্থ দেবত্রাস, অর্থাৎ এই কামানের শব্দে দেবতারাও আশঙ্কিত হয়েন। ইহার উপরে যে শ্লোক খোদিত আছে নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম।

১। আবুল মজঃফর মহীউদ্দীন মহম্মদ আওরংজেব সাহ গাজী ধন্য হউন।

২। ফলক্ হৈবৎ এই কামানের নাম।

৩। বুর্হানপুরে হিজ্‌রী ১০৭৪ বর্ষে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪। এই সময়ে মহম্মদ উমুল হোসেন আরব সাহেব কিলাদার (অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা) ছিলেন।

৫। এই কামানের ওজন ১৩ সের। সাজাহানী ওজনের হিসাবে ১৩ সের।

৬। দাড়িম্ব ফলের ন্যায় এই কামান গোলাকার। এই ছয়টি কথার পরে আর যে কয়েকটি শব্দ পাঠ করা যায় তাহা অস্পষ্ট। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহা অবিকল পারস্ত ভাষায় এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। দর্ আয়ান্-এ-রবি * * * খাক্ * * গোফ্‌ৎ বাসদ * * দর্ হকিকৎ * * * খাতিমা। এই কয়েকটি কথার অর্থ এই—"দর আয়ান্-এ-রবি" অর্থে রাজপ্রাসাদ মধ্যে। খাক্ অর্থে ভস্ম বুঝায়। গোফ্‌ৎ বাসদ—বলিয়াছিল। দর্ হকিকৎ—প্রকৃত পক্ষে। খাতিমা = সমাপ্তি। মধ্যে মধ্যে যে সকল স্থান পড়া যায় না তাহা তারকা চিহ্ন দিয়া বুঝাইয়াছি।

এই কামানের সুবৃহৎ নলের ভিতরে ৩৭ সের ওজনের গোলা প্রবিষ্ট করা যাইতে পারে। এইরূপ আরও একটি কামান ছিল, তাহা এক্ষণে নাগপুর মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে। রাজা আশা আহীরের খুল্লতাত যে বিপুল বপুর লৌহকামান নির্ম্মাণ করাইয়া দুর্গের প্রথম প্রবেশদ্বারে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল "শিবনাদ"; এই সুবৃহৎ কামান ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার গায়ে নানাবিধ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও ফলফুলের চিত্র খোদা ছিল। এই কামানের দৈর্ঘ্য ৩৪ হস্ত এবং প্রস্থ ৬।।০ হাত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

রোহিলা কুমারী।

বাদশাহ আকবর যে সমবেত শক্তিপুঞ্জের উপর মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, কালবশে ও পরবর্ত্তী বাদশাহের শাসনদোষে তাহা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই শক্তিপুঞ্জের একটী স্ফুলিঙ্গ রোহিলা নাম ধারণ করিয়া ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। নাদীর সাহের প্রত্যাগমনের পর, দিল্লীর কতিপয় অত্যাচারগ্রস্ত ও সম্বলহীন অধিবাসী জনৈক আহীরনন্দনের * পরিচালনায় মুরাদাবাদ প্রদেশে রোহিলা রাজ্য স্থাপন করে। এক সময়ে ইহারা এতদূর ক্ষমতাশালী হয় যে, আমেদ আবদালীর অনুগ্রহে রোহিলাসর্দ্দার নাজিবদ্দৌলা ও তৎপুত্র জাবেতা খাঁ দিল্লীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিল। বাদশাহজাদা শা আলম স্বীয় অমাত্য নজব খাঁ ও বীর্য্যবান্ মহারাষ্ট্রীয়দের সহায়তায় রোহিলাদিগকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত ও বহু পরিমাণে উৎসাদিত করেন। ঠিক এই সময়ে মহারাষ্ট্রদেশের পেশোয়া পদ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, মারাঠাগণ স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যস্ত হয়। তখন অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলার মধ্যবর্ত্তিতায় উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির অল্পকাল পরেই সুজা উদ্দৌলা হৃতবল রোহিলাদিগের নির্য্যাতন করিবার জন্য প্রথমতঃ তাহাদিগকে বলিয়া পাঠান যে, অযোধ্যার রাজকোষ হইতে মারাঠাদিগকে যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা অচিরে পরিশোধ করা হউক। রোহিলাগণ ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, সুজা উদ্দৌলা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রেরিত জেনারল্ বার্কার ও তাঁহার অধীন সুশিক্ষিত তেলিঙ্গাসৈন্যের সাহায্যে রোহিলা দলন করেন।

* গোয়ালার ছেলে, জাতিতে হিন্দু; ইনি রোহিলাবংশের কোন পাঠানের গৃহে পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া উত্তর কালে রোহিলা নামে খ্যাত হন।

বিপক্ষ-সৈন্ত কি সংখ্যায়, কি শিক্ষায়, সর্ব্ববিষয়ে রোহিলাদিগের শ্রেষ্ঠ। তথাপি রোহিলাগণ দেশের জন্য দলে দলে ভীষণ রণাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিকে বহু-সমর-বিজয়ী কাপ্তেন মেজর প্রভৃতির দ্বারা সুচালিত ইংরাজের তেলিঙ্গা সৈন্ত, অপর দিকে প্রভুর আজ্ঞাকারী আততায়ীনাশে সিদ্ধহস্ত সুজা উদ্দৌলার ইরাণী সৈন্ত। রোহিলাসর্দ্দার হাফেজ্ রহমৎ দেখিলেন যে, অগণ্য রোহিলা বিপক্ষের তোপের মুখে উড়িয়া যাইতেছে, অগণ্য রোহিলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তের পথে ছুটিয়াছে। হাফেজ রহমৎ ভীত হইলেন না, কতিপয় বিশ্বস্ত সৈন্তে পরিবৃত হইয়া অদ্ভুত রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। পরিশেষে একটী কামানের গোলা হাফেজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। শত্রুসৈন্ত ধরাশায়ী হাফেজের মস্তক ছেদন করিয়া সুজা উদ্দৌলার নিকট লইয়া গেল। সুজা উদ্দৌলার কোনও সৈনিক মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ছিন্ন মুখমণ্ডলের ধূলিরাশি নিজের রুমাল দ্বারা মুছাইতে যাইতেছিল, পিশাচপ্রকৃতি সুজা উদ্দৌলা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"ঐ মুখের ধূলিকর্দ্দম আমার যশোভূষণ। এই শোণিতলোলুপ বর্ব্বর জাতি আমার পিতা, আমার বংশ ও অসংখ্য বিশ্বাসী মুসল্‌মানের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, এতদিনে তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিলাম।" প্রধান সর্দ্দারগণ প্রায় সকলেই হাফেজের দশা প্রাপ্ত হইল; গৃহ-প্রাঙ্গণ ছিন্ন ভিন্ন ও তৈজসাদি লুণ্ঠিত হইল; রোহিলার নাম লোপ পাইল।

বিজয়ী সেনাদল লুণ্ঠন, অপহরণ ও উৎপীড়নে হস্ত কলুষিত করিয়া, বিজয়-গৌরব কালিমাময় করিতেছিল। হাফেজ রহমতের কন্তা ও বনিতা তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কন্তার বয়স সপ্তদশ বৎসর; দেহযষ্টি দীর্ঘ, হস্তপদ কোমল ও সুগঠিত, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি ও লাবণ্যময়, কটিদেশ ক্ষীণ; নবযৌবনসমাগমে দৃষ্টি কথঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেও, রোহিলারমণীর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য-বর্জ্জিত নয়। কুমারীর প্রতি-অঙ্গে সৌন্দর্য্য ও বীরত্ব উছলিয়া পড়িতেছে। কন্তার যৌবনের বিকাশ দেখিয়া,

হাফেজ রহমৎ জনৈক তেজস্বী রোহিলার সহিত ইহার বিবাহ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। স্বাধীন দেশের স্বাধীনা রমণী হাফেজকুমারী ভাবী পতির বীরত্বের কল্পনা করিয়া, উৎসাহে ও অভিমানে দিন যাপন করিতেছিল। তাহার এই সর্ব্বনাশ; পিতা হত, ভ্রাতৃগণ গৃহ হইতে বিতাড়িত। কিন্তু বিপদের চিন্তা করিতেও তাহার অবসর ছিল না। সুজা উদ্দৌলার উন্মত্ত সেনাগণ মাতার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া কুমারীকে লইয়া গেল। জননী অতিকষ্টে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—"মা, মনে রাখিও, তুমি হাফেজ রহমতের কন্যা ও রোহিলা রাজকুমারের ভাবী পত্নী। তুমি কাহারও উপভোগের জন্য, বিশেষতঃ এই পিতৃহন্তা পামরের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ কর নাই। পামর তোমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, সমগ্র পরিবারকে বিপন্ন ও দাসত্ব-দশায় পাতিত করিয়াছে। যাও, মা; সহস্রবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিও, তথাপি রোহিলা নাম কলঙ্কিত করিও না। যদি তুমি প্রকৃত রোহিলাকুমারী হও, পাপিষ্ঠ তোমার কেশ-স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

তখন দেশমধ্যে সুজা উদ্দৌলা একজন প্রধান ব্যক্তি। এমন কি প্রতিপত্তিতে স্বয়ং দিল্লীশ্বর হইতেও ন্যূন নহেন। অযোধ্যার নবাব-প্রাসাদ তখন বিলাসের রাজধানী, দাস দাসী নর্ত্তক নর্ত্তকীতে পরিপূর্ণ। কোথাও সঙ্গীত-চর্চ্চা হইতেছে, কোথাও বা অগুরু আতরের গন্ধে দিক্ সকল মোহিত হইতেছে। সুজা উদ্দৌলা নবার্জ্জিত রমণীরত্নকে সেই বিলাস-সাগরে ডুবাইতে চেষ্টা করিলেন, নানা উপায়ে তাহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোহিলাকুমারীর প্রণয়লাভে সমর্থ হইলেন না। মুসলমান ভারতে রোহিলারমণী বীরত্বে ও সতীত্বে শীর্ষস্থানীয়া, প্রলোভন অথবা ভয়প্রদর্শনে তাহাকে নত করা যায় না। হাফেজকুমারী নবাবের অন্তঃপুরে থাকিয়া বহু যন্ত্রণাসহ্য করিল, কিন্তু বীর নারীর ধর্ম্ম ভুলিল না। একদিন রোহিলাকুমারী সুজার পাপ প্রস্তাবে সত্যসত্যই সম্মতি প্রকাশ করিল। নিশাযোগে বিলাসশয্যায় উপবেশন করিয়া সুজার পার্শ্ববর্ত্তিনী

রোহিলা কুমারী বাক্যে ও হাসিতে তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিল। প্রলুব্ধ সুজা বাহু প্রসারণ করিয়া ভামিনীর করপীড়নে উদ্যত হইলেন, বালিকা ব্যস্তসমস্ত হইয়া কেশগুচ্ছে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার বিষাক্ত ছুরিকা বাহির করিল, মুহূর্ত্তে ছুরিকা সুজার উরুদেশে বিদ্ধ হইল, সুজা পশুর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনজন খোজা কক্ষের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সুজার ইঙ্গিতে হাফেজকুমারীকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া হত্যা করিল।

এই সংবাদ অন্তঃপুরের অনেক মহিলার কর্ণগোচর হইল। সুজার কোন কোন প্রধানা মহিষী ঔৎসুক্যবশতঃ নবাবের নিকট হাফেজ-কুমারীর কথা তুলিলে, নবাব তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে কঠোর ভৎর্সনা করিতেন। ইহাতে রমণীদের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। "চুপ্" "চুপ" বলিতে বলিতে এই প্রসঙ্গ অন্তঃপুরের মহলে মহলে প্রচারিত হইল। পত্নী, নিকাপত্নী ও উপপত্নীতে নবাবের পূর্ণ দ্বিসহস্র রমণী। অন্তঃপুরবাসিনীগণ এই লোমহর্ষণ ঘটনা সম্বন্ধে "ছড়া" রচনা করিয়া পরস্পরে হাস্য পরিহাস করিত। দাসী বাঁদীদের সাহায্যে এই সকল ছড়া বাহিরে প্রকাশিত হইল। নর্ত্তকী ও ভিক্ষুকগণ এই সকল ছড়া দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়াইত।

এদিকে নবাবের ক্ষতস্থান ক্রমেই যন্ত্রণাদায়ক হইতে লাগিল। হাকিম-গণ বলিলেন স্ফোটক হইয়াছে। একজন ইংরাজ সার্জ্জন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ক্ষত দূষিত। পীড়া কিছুতেই সারিল না। চারিমাস মধ্যে ফৈজাবাদ প্রাসাদে নবাবের মৃত্যু হইল।

শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন বি, এ,

গ্রীকদূতের অদ্ভুত উপাখ্যান।

মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে সময়ে ভারতের অধিকাংশ একছত্রাধীন করিয়া পাটলীপুত্র নগরে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন, বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের এসিয়াখণ্ডস্থ অধিকারের উত্তরাধিকারিরূপে তদীয় ভূতপূর্ব্ব সেনানী সিলিউকস্‌ নিকেটর ভারতাক্রমণ করেন। তাহাতে তিনি কতদূর সফলকাম হইয়াছিলেন, গ্রীক ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব। তবে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিকামনায় গ্রাকরাজ মেগাস্থিনিস্‌ নামক যে দূত প্রেরণ করেন, তিনি প্রায় পঞ্চবর্ষ যাবৎ ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক সিলিউকস্‌ সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি যাহা দেখিয়া ও শুনিয়াছিলেন স্বদেশবাসীর অবগতির জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাঁহার সে গ্রন্থ বহুকাল হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে সময়ে প্রচলিত ছিল সেই সময়ে যে সমস্ত গ্রীক গ্রন্থকারগণ তাঁহার লিপি স্ব স্ব গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতে মেগাস্থিনিসের লিপিগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক অনেক নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু বিদেশীয়ের পক্ষে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তথ্য আবিষ্কার সকল সময়ে তত নিরাপদ নহে। তাই আমরা তাঁহার লিপিসমূহে মস্তকহীন মনুষ্য, স্বর্ণ সংগ্রাহক পিপীলিকা প্রভৃতির বিবরণের অস্বাভাবিক অতিশয়োক্তি দেখিতে পাই। কিন্তু এ সমস্ত উপেক্ষণীয় ত্রুটী সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পক্ষে গ্রন্থখানির বিশেষ উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়। গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার আপাত প্রতীয়মান অসার উক্তিতে

অনেক সময়ে সারবত্তা লক্ষিত হয়। কিন্তু নিতান্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াও নিম্নলিখিত গল্প দুটির ভারতীয় কোন আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া, অগত্যা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইলাম। যদি কোন মহানুভব ইহার যাথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া থাকেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিলে বঙ্গসাহিত্য-সমাজ বিশেষ অনুগৃহীত হইবে।

১। "প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ পল্লীনিবাসী ছিল। সেই সময়ে ডিওনিসস্ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারত আক্রমণ করেন। ভারতের কোন স্থানই তাঁহার প্রবল পরাক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারায়, সমগ্র ভারত তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপের প্রাখর্য্যবশতঃ তাঁহার সেনামধ্যে মরক উপস্থিত হয়। সূক্ষ্মবুদ্ধি ডিওনিসস্ পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করায়, শীতলতর সমীরণ সেবনে ও নির্ঝরিণীর নির্ম্মল সলিল সুধাপানে, তাঁহার সৈন্যসমূহ অচিরকাল মধ্যেই সুস্থ ও সবলকায় হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের যে প্রদেশে আরোহণ করিয়া, তিনি সেনাদলের আরোগ্য-বিধান করেন, তাহার নাম 'মেরস'। ডিওনিসস্ ভারতীয়গণকে মনুষ্য-চেষ্টার দ্বারা উদ্ভিদাদি উৎপাদন, সুরাপ্রস্তুত-প্রণালী এবং নানা প্রকার লোকহিতকর কার্য্যের কৌশল শিক্ষা দেন। যে যে স্থলে পূর্ব্বে গ্রাম ছিল, গ্রাম-গুলিকে কিয়দ্দূরে সরাইয়া তত্তৎ স্থলে মহানগরী সংস্থাপন করেন এবং কিরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয় তাহাও ভারতবাসিগণকে শিক্ষা দেন। তিনি অপরাধীর বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক বিচারালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে নানাবিধ মহৎ ও উন্নতিকর কার্য্য সম্পন্ন করায়, ডিওনিসস্ অবিনশ্বর যশোভূষায় মণ্ডিত হইয়া দেবতারূপে সম্পূজিত হইতে থাকেন। তিনি স্বীয় সেনার সহিত রমণীগণকেও লইয়া যাইতেন এবং রণদুন্দুভির আবিষ্কার না হওয়ায় সমরসাজে সজ্জিত হইবার সময় জয়ঢাক ও ভেরীবাদনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি ৫২ বৎসর যাবৎ

রাজত্ব করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র ও বংশধরগণ রাজদণ্ড পরিচালন করেন। কালক্রমে তাঁহার বংশ লুপ্ত হওয়ায় তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হয় এবং রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্রানুযায়ী শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে যাহারা বাস করে, তাহাদের মধ্যে ডিওনিসস্ ও তাঁহার বংশাবলী সম্বন্ধে উক্ত প্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

যে সমস্ত দার্শনিক পর্ব্বতোপরি বাস করে তাহারা ডিওনিসসের উপাসক। ডিওনিসস্ যে সত্যই এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ-রূপে বন্য দ্রাক্ষাফল (আঙ্গুর), 'আইভি লতা', 'লবেল', 'মার্টল', ও 'বক্স' বৃক্ষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত বৃক্ষলতা ইউ-ফ্রেটিস নদীর অপর পার্শ্বে জন্মে না—বহুযত্নে লালিত হইলে কদাচিৎ রাজোদ্যানে জীবিত থাকিতে দেখা যায়।"

২। "হিরাক্লিস্ও ভারতীয়গণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের ন্যায় তাহারাও হিরাক্লিসের দণ্ড ও সিংহচর্ম্মের বর্ণনা করিয়া থাকে। শারীরিক বল ও পরাক্রমে তিনি অন্যান্য সমস্ত মনুষ্যকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং জলচর ও স্থলচর হিংস্র জন্তুগণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি বহুবিবাহ করিয়া বহু পুত্রের পিতা হ'ন; কিন্তু তাঁহার একটি ব্যতীত কন্যা হয় নাই। সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি সমগ্র ভারতরাজ্য তাঁহাদিগের মধ্যে তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া দেন এবং দুহিতাকেও পুত্রদিগের তুল্য অংশ দিয়া তাঁহাকে সেই রাজ্যের অধিশ্বরী করিয়া দেন। তিনি অনেকানেক সুবৃহৎ নগর সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী পালিবোথ্রা * নামে অভিহিত হয়। তথায় তিনি সুবৃহৎ হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে বহুসংখ্যক লোক বাস করান, এবং উক্ত নগরকে সুবৃহৎ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করাইয়া ঐ

* প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরকেই পালিব্রোথা বা পালিবোথ্রা বলিত।

পরিখা নদীর জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রাখিতেন। তাঁহার বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া শৌর্য্য ও পরাক্রমে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন, কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধার্থ কখনও ভারতসীমার বহির্ভাগে পদার্পণ করেন নাই। বহুশতাব্দীর পর পরিশেষে প্রায় সকল নগরীতেই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণকাল পর্য্যন্ত কেবল দুই একটি নগরেই প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল।”

ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, বঙ্গসাহিত্যসমাজ, কাশী।

আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি, পাটলীপুত্র নগর মগধরাজ অজাতশত্রু ও তদীয় মন্ত্রী বর্ষকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পাটলীপুত্র অজাতশত্রুর রাজধানী ছিল না, তাঁহার রাজধানী রাজগৃহ হইতে চম্পাপুরে (আধুনিক ভাগলপুরের নিকটে) স্থানান্তরিত হয়। নন্দবংশের অভ্যুদয়কালে সম্ভবতঃ পাটলীপুত্র মগধের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। অতএব সন্দেহ উপস্থিত হয়,এই হিরাক্লিস বা হারকিউলিস্ কি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি না কেবল প্রবাদমূলক? অথচ একা মেগাস্থিনিস্ নহেন, ডিওডোরসও (Diodorus) বলেন, 'Hercules was born amongst the Indians and like the greeks they furnish him with a club and lions hide. Instrength (bala), He excetted all men and cleared the sea and land of mousters and wild beasts. He had many sons but only one daughter. I is said that he built pabibothra. and divided his kingdom amongst his somi (the Balicaputras, sons of Bali) They never colonised, but in time most of the cities assumed a democratical form of Government (thongh scme moaarchical) till Aleseander's time.

কর্ণেল টডের উদ্ধৃত (Rajasthan Vol. 1. Geoy of Rajasthan ch II. P 28 Footnote Lahivis editou ডিওডোরসের এই উপাখ্যানটি মেগাস্থিনিসের কাহিনী হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন; সুতরাং ইহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। আরিয়ান ও (Arrion) থিবীয় হারকুলিস্ ও ভারতীয় হারকুলিসের কতকটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। এ অবস্থায় হিরাক্লিস বা হারকুলিস কাহিনীকে ভিত্তিহীন গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও অত্যধিক সাহসিকতার পরিচায়ক। কর্ণেল টড্ Herculesকে হরিকুলেশ বা বলদেবের সহিত ঐক্য বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা হইলেই বা উল্লিখিত গ্রীক কাহিনীর সহিত বলদেবোপাখ্যানের সমন্বয় কিরূপে সাধিত হয়? অন্যত্র (P. 39. ibid) টড্ বলেন, 'Toe sons of Baliha founded tus Kingdomes; palibothra on the lower Ganges; and Arore on the eastern bank of the Indns, founded by Sehl. এই সেহলই বা কে? এইরূপে বিষয়টি জটিলভাব ধারণ করায় ইহার সমাধান জন্য অগত্যা বঙ্গগৌরব ঐতিহাসিকগণের শরণার্থী হইতে হইল।

আগাবাকের ও মহারাজা রাজবল্লভ।

১৩১১ সনের বৈশাখ মাসের নবনুর পত্রিকায় আগাবাকের ও আগা সাদেক নামে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; এজন্য লেখক মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু লেখক আগাবাকের ও তদীয় পরিবারস্থগণের জমিদারী রাজা রাজবল্লভের হস্তগত হওয়ায়, রাজাকে যে একটুকু অন্যায় বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, * আমরা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমরা দেখাইব, আগাবাকের কি সাদেকও কোন পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জমিদারী লাভে সমর্থ হন নাই! আর রাজবল্লভও আগাবাকের অপেক্ষা কোন অধিক পাপাবতারণা দ্বারা ঐ জমিদারী আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; বরং ন্যায়ান্যায়ের তুলনায় রাজবল্লভের বেলায় ন্যায়ের তুলা একটু উচ্চে থাকারই সম্ভব।

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর, তদীয় জামাতা সুজাউদ্দীন নবাব নাজিমি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে ২য় মুর্শিদ (লুৎফউল্লা) ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর চাকলার সুবেদারী পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে মীর হবীব নামে একজন হুগলীর দালাল, সুবেদারের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া তৎসহ ঢাকায় আগমন করেন। পরে কতকগুলি কার্য্য সম্পাদন দ্বারা সুবেদারের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করিয়া তুলিলে পর, তদনুগ্রহে ক্রমে প্রধান অমাত্যের পদে বরিত হন (১৭২৫ খৃঃ অব্দে)। এই সময় আগাবাকের ও তৎপুত্র সাদেক ঢাকা প্রদেশে পরাক্রান্ত সামন্ত-শ্রেণীতে উন্নীত ছিলেন। (১)

* বাকেরের মৃত্যুর পর নওয়াজেস: রাজা রাজবল্লভকে বাকেরের ত্যাজ্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন। এই সুযোগে ধূর্ত্ত মসীজীবিরূপে কৌশলে সুবিস্তীর্ণ বুজুর্গ উমেদপুর ও সেলিমাবাদ জমিদারী হস্তগত করিয়া লইলেন। নবনুর ১৩১১ বৈশাখ। (১৪ পৃষ্ঠা)

(১) সইর মোতাক্ষরিণ, মস্তাফার অনুবাদ ২য় ভাগ ৬৪৬ পৃষ্ঠা।

সুবেদারের প্রিয় পাত্র হইয়া মীর হবীব, কাণ্ডজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া পড়েন। কিরূপে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হইবেন, নিয়ত সেই চিন্তাতেই অভিভূত থাকিতেন, ন্যায় অন্যায় বিচার একরূপ তিরোহিত হইয়াছিল। সুজাউদ্দীনের জামাতা বলিয়া মুর্শিদের সাহস অত্যধিক ছিল, এই সুযোগে ধূর্ত্ত হবীব তাঁহার দ্বারা বহু অন্যায় কার্য্য সম্পাদন করিবার অনুমতি বাহির করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতেন। আগাদের মান, সম্ভ্রম ও ক্ষমতা তৎসময়ে ঢাকাতে যথেষ্ট ছিল, হবীব তাঁহাদিগের সহিত প্রণয় রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় আগা বাকের ও আগা সাদেকের সহিত সর্ব্বদা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন।

ঢাকা নেয়াবতীর অধীনে, জালালপুর ও বুজর্গ উমেদপুর দুইটী বৃহৎ জমিদারী ছিল। উহার প্রথমটীর মুরুল্লা * এবং দ্বিতীয়টীর দয়াল চৌধুরী মালিক ছিলেন। তাঁহাদের বিস্তর অর্থ সঞ্চিত আছে বলিয়া রাষ্ট্র ছিল। হবীবের উৎক্রোশদৃষ্টি সেই দুই শিকারের প্রতি নিপতিত হইল।

প্রথমতঃ হবীবের আজ্ঞামত মুরুল্লা, নজরানা ও উপঢৌকন বলিয়া বহু অর্থ ঢাকার সুবেদারের নামে প্রেরণ করেন। পুনরায় তাঁহার নিকট অর্থ চাহিয়া পাঠান হইল, এবার কিন্তু আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল না। এই অপরাধে কতিপয় সেনানায়ক তদ্‌বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। পরে মীরহবীব প্রিয় মিত্র আগা বাকেরকে সঙ্গে করিয়া বহুসৈন্যসহ জালালপুরে উপস্থিত হন। মুরুল্লা সহজে বশীভূত হইলেন না, উভয় পক্ষের শোণিতপাতে পদ্মার স্বচ্ছ

* ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা নেয়াবতীর অধীন জালালপুরের রাজস্ব ১১৩৫ সনে ছিল ১০৩৩৫ ও ১১৭০ সনে ছিল ১৫৩০০৫ টাকা। মালিক স্থানে মুরুল্লা ও রুহিতুল্লার নাম উল্লেখ আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ৫ম রিপোর্ট ঢাকা নেয়াবতী দেখ।

সলিলরাশি লোহিতবর্ণ ধারণ করে। কিন্তু পরে আর সুবেদারী সৈন্যের সহিত জমিদার পারিয়া উঠেন না; তাঁহাকে ধৃত করিয়া ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়; সুবেদার, হবীব ও বাকেরের প্ররোচনায় সেই নির্দ্দোষ মুরুল্লার প্রাণদণ্ড বিধান করেন।

এই উপলক্ষে বহু মণিমাণিক্য ও স্বর্ণ, রৌপ্যমুদ্রা হবীব ও বাকেরের হস্তগত হইয়াছিল। উহার কতক সুবেদার মুর্শিদও প্রাপ্ত হন, কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাব নাজীমের নিকট একটা বিদ্রোহের দমন করা হইল, এইরূপ কৈফিয়ত প্রেরিত হয় মাত্র।

মুরুল্লার জমিদারী জালালপুর হইতে খারিজ করিয়া কতকস্থানব্যাপী একটা পরগণার সৃষ্টি করিয়া পাট পাসার (১) নাম করা হইল, উহা পাইলেন আগা বাকের। আর কতক স্থান লইয়া হবীবপুর নাম করা হইল। ইহা মীর হবীবের জমিদারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল (২)। এইরূপে একটী প্রাচীন মুসলমান ভূম্যধিকারীকে উচ্ছেদ করিয়া, হবীব ও বাকের আপনাদের পুণ্য সঞ্চয় করিবার উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ করিলেন (৩)।

অতঃপর বুজর্গ উমেদপুর (৪) পরগণার জমিদার দয়াল চৌধুরীর

(১) এই পরগণা বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও সংলগ্ন। রিয়াজ গ্রন্থে সাদেককে পাটপাসারের জমিদার দেখা যায়।

Riaz, Text – As. soc. Edition; p, 300.

(২) এই পরগণা বর্ত্তমানে বরিশাল জিলার অন্তর্গত। অধুনা এই পরগণা হবীবের সহকারী দেওয়ান নিধিরাম দাসের বংশধরগণের করায়ত্ত।

(৩) ১১৭০ বঙ্গাব্দের ঢাকা নেয়াবতী কাগজে জালালপুরের জমিদার বলিয়া মুরুল্লার ও রোহিতুল্লার নাম দৃষ্ট হয় কিন্তু উহার বহু পূর্ব্বে মুরুল্লা ঢাকাতে হত হন (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ৫৪৮ পৃষ্ঠা ও ষ্টুয়ার্ট হিষ্টরী দেখ) রুহিতুল্লা বোধ হয় মুরুল্লার বংশধর হইবেন। অবশিষ্ট জালালপুর ১১৭০ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার করায়ত্ত ছিল।

(৪) নবাব সায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজর্গ উমেদ খাঁর নামানুসারে সরকার বাকলার অন্তর্গত সমুদ্রতীর লইয়া এই পরগণার নামকরণ হয়।

গ্রহবৈগুণ্য আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান বাথরগঞ্জের অন্তর্গত এই বৃহৎ পরগণা নন্দপাড়া-নিবাসী বৈশ্যবংশীয় দয়াল চৌধুরীর হস্তগত ছিল। তৎসময়ে উহা ঢাকলে জাহাঙ্গীর নগরের অন্তর্ভূত। অচিরে বলদৃপ্ত সুবেদারের প্রিয়পাত্র মীর হবীবের দৃষ্টি তদুপরি নিপতিত হয়। বারংবার উপঢৌকন ও নজরানা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ আদায় করিয়া লওয়া সত্বেও হবীবের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন হইল না। এ দিকে কিন্তু দয়াল চৌধুরী প্রজার যথাসর্ব্বস্ব ও আপন সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোন রূপে হবীবের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতেছিলেন। ঘৃতভুক্ বহ্নির ন্যায় দুর্জ্জনের লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন ক্ষয় হয় না; এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। পুনরায় যখন তাঁহার নিকট অর্থ চাহিয়া পাঠান হয়, তৎসময়ে জমিদার ঘৃণার সহিত সুবেদারের প্রেরিত লোককে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আর কি রক্ষা আছে? অমনি বাকলার ফৌজদার আগাবাকের *, হবীবের নিকট দীর্ঘ রিপোর্ট লিখিয়া জানাইলেন, দয়াল চৌধুরী বিদ্রোহী হইয়াছে (১৭৩৭ খৃঃ অব্দে)।

যেমন সংবাদপ্রাপ্তি, অমনি সুবেদারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মীর সাহেব দয়ালের বিরুদ্ধে বহু ফৌজসহ বাকলার দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বাকেরের সহিত মিলিয়া একেবারে নন্দপাড়া বেষ্টন

* এই সময়ে কিম্বা ইহার কিছুকাল পরে বাকের সেলিমাবাদের "ওয়েদাদারী" প্রাপ্ত হন। এই সময়েই সম্ভবতঃ তিনি বাখরগঞ্জের ফৌজদার নিযুক্ত হন। কারণ ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর "যোগীদীয়া" কুঠীর তদানীন্তন কুঠীয়াল ঢাকা নগরীস্থিত সদর কুঠীতে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি বাকেরকে ফৌজদার বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

"August, 1737-Aga Bakar, Foujdar, is said to have taken Rs. 3000, as hush-money, from the Choudhury of a Pargana in connection with a theft of cloth from the Jogdia Factory.

Revenue Consultations of the Dacca Factory, for 1737. Mss. in the India office Library. (Beveridge.).

করেন। দয়াল চৌধুরী কিছু দিন তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু যখন আর নিস্তারের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন সপরিবারে নৌকারোহণে সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে বিপক্ষদল পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার উপক্রম করিলে, তেজস্বী জমিদার, স্বয়ং কুঠার ধারণ করিয়া নৌকার তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, তদ্দ্বারা ক্রমে জল উত্থিত হইয়া অচিরে তরী জলমগ্ন হওয়ায়, তৎসহ দয়াল ও তদীয় পরিজনগণও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, বংশের আর কেহ বিদ্যমান ছিল না। দয়াল আততায়ীর হস্তে পতন অপেক্ষা মৃত্যুকেই প্রিয়জ্ঞানে তদাশ্রয়াবলম্বনে ভবযন্ত্রণার দায় হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া, অত্যাচারী রাজার কলঙ্ক-কাহিনী চিরদিনের জন্য স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দেবধামে চলিয়া গেলেন। অদ্যাপি বুজর্গ উমেদপুর-বাসীরা সমস্বরে বলিয়া থাকেন যে—

"আপন ক্ষতি পরের নাশ।
তার সাক্ষী দয়ালদাস॥"

অর্থাৎ সমুদয় প্রজার যথাসর্ব্বস্ব আহরণ ও আপনার সমুদয় সঞ্চিত সম্পত্তি প্রদানান্তর দেশ অর্থশূন্য করিয়াও দয়াল পরিত্রাণ পাইলেন না, ইহাতে পরকেও নষ্ট করিলেন, স্বয়ংও নষ্ট হইলেন।

যাহা হউক, সরকারী কাগজপত্রে এই ঘটনা বিদ্রোহমূলক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইত গেল, মীরহাবীব ও আগাবাকেরের দ্বিতীয় পুণ্য-কাহিনী।

অতঃপর ফৌজদার বাকেরের দৃষ্টি সেলিমাবাদের ও সাহাবাদপুরের জমিদারগণের উপর পতিত হয়। রায়ের কাঠির সম্ভ্রান্ত কায়স্থ চৌধুরীরা সেলিমাবাদ পরগণার জমিদারী বহুকাল যাবৎ ভোগ করিতেছিলেন *।

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে জানা যায়, ১১৩৫ হইতে ১১৭০ সন পর্য্যন্ত জয়নারায়ণ রায় ও ভবানীচরণ রায় প্রভৃতি এই পরগণার জমিদার ছিলেন।

বাকের তাঁহাদের নিকট নজরানা ও উপঢৌকন বলিয়া অর্থ চাহিয়া পাঠা-ইলে, তাঁহারা মহাবিপদ গণিতে লাগিলেন। কি করেন, চারিদিকের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন, এই সর্ব্বভুক্ হাবীব বা বাকেরের নিকট পরিত্রাণের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই, বরং প্রতিকূলাচরণ করিতে গেলে তাঁহাদের ক্রোধানলে একেবারে ভস্ম হইয়া যাইতে হইবে, তখন তাঁহারা দয়ার প্রার্থী হইয়াই দাঁড়াইলেন। বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, জমিদারগণ তাঁহাদের সম্পত্তির সাড়ে এগার আনা অংশ পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা নজরানা ও উপঢৌকনের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। অন্যথায় তাঁহাদিগকেও নুরুল্লা বা দয়াল চৌধুরীর পথে প্রেরণ করা হইবে। জমিদারগণ অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। *

উহার রাজস্ব প্রথমে ১৩০৫৭৪ টাকা ছিল, পরে ৪০১৯০ টাকায় পরিণত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, নুরুল্লা জীবিত না থাকিলেও ১১৭০ সন পর্য্যন্ত নেয়াবতীর তৌজীতে তাঁহার নামেরই উল্লেখ ছিল। এইস্থানেও দেখিতেছি ১১৭০ বঙ্গাব্দ বা ইংরাজী ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়নারায়ণ ও ভবানীচরণ নামেরই উল্লেখ তৌজিতে রহিয়াছে। আগাবাকের বা সাদেকের নাম নাই। এইরূপ বুজর্গ উমেদপুর পরগণার মালিক স্থলে এখন পর্য্যন্ত মহম্মদ সাদেক নামেরই উল্লেখ আছে, রাজবল্লভ ভবানীচরণ নামের উল্লেখ নাই, প্রত্যেক মহালের জমা ১১৩৫ সন হইতে বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু সেলিমাবাদ পরগণার জমা হ্রাস হয়। ইহার একমাত্র কারণ, বাকে-রের হস্তগত হইলে ঐ পরগণার সদর রাজস্ব মীরহাবীবের কৃপায়, ন্যূন করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহাও যে একটা প্রকাণ্ড জুয়াচুরি তাহাতে সন্দেহ নাই!

* মিঃ বিভারিজ বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ১১৫৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে সুবেদারের নিকট আবেদন করিয়া সেলিমাবাদের জমিদারেরা পরগণার সাড়ে চারি আনা অংশ বাহির করিয়া লন। এজন্য অনুমান হয় আগাবাকের ঐ পরগণা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়া জমিদারগণকে উৎসাদিত করেন। কিন্তু আমাদের হাতে যে দলিল আছে তাহাতে দেখিতে পাই ১১৪৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪২ সন পর্য্যন্ত ঐ পরগণার সাড়ে চারি আনা অংশের মালিক রায়েরকাঠীর চৌধুরীগণ ছিলেন। জমিদারদত্ত পাট্টা ও মুক্তি-পত্র মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে আমরা দুইখানা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার একখানা জমিদার মনোহর রায়, রঘুপ্রসাদ সেন ডাহুকের অন্তর্গত গালুয়া কিসমতের প্রজাগণকে এই ডাহুকের মালিকগণকে খাজনা দিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন উহার তারিখ ১১৪৯ সন ১০ শ্রাবণ

এই উপায়ে সাহাবাদ পরগণার জমিদারের নিকট হইতে কতকস্থান লইয়া আবহুল্লাপুর নামে একটি পৃথক তপ্পা ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর পরগণার জমিদারের নিকট হইতে যেন্দিয়াবাদ নামে এক তপ্পা বাহির করিয়া লন। এই সময় উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার জমিদার বৈষ্ণবংশীয় শ্রীরাম রায় এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর পরগণার জমিদার ভূষণ উল্লা প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিলেন (১)।

এইরূপ পাশব অত্যাচারে জমিদারগণকে জর্জ্জরিত করিয়া আগাবাকের পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পরে, বুজর্গ উমেদপুর পরগণা মধ্যে স্বীয় নামে একটী গঞ্জ বা হাট সংস্থাপন ও একটী গ্রামের পত্তন করেন। বন্দরের নাম হইল বাখরগঞ্জ ও গ্রামের নাম

(১৭৪২ খৃঃ অব্দ)। আব্বার খানা জমিদার গন্ধর্ব্ব নারায়ণ রায় গঙ্গারামপ্রসাদের ভাগিনেয় হরিরাম রায় নামে এক তালুকদারী পাট্টা প্রদান করেন উহা বাঙ্গলা ১১৫০ সন (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) সম্পাদিত হয়। প্রথম খানার মূল দলিল ও দ্বিতীয়টীর সহিমোহরের নকল যাহা ১৮১১ খৃঃ অব্দে ৩১ ডিসেম্বর বরিশালের কালেক্টরী হইতে লওয়া হয়, তাহা আমাদের নিকট বর্ত্তমান আছে। যাঁহারা মনে করেন, রাজবল্লভের জমিদারী লাভের পর লাবা রামপ্রসাদ, এই বিষয় অর্পণ করেন তাঁহারা এখন জানিতে পারিবেন, রাজবল্লভের সেলিমাবাদ জমিদারী হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই রামপ্রসাদ ওয়েদাদারী পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে এই সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আগার মৃত্যুর পর ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে বুজর্গ উমেদপুর ও সেলিমাবাদ রাজার হস্তগত হয়। গঙ্গারামপ্রসাদের পিতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায় উহার বহু পূর্ব্বে সিলেমাবাদ মধ্যে তাহা করিয়া লন।

আগাবাকের যখন বাকলার ফৌজদার পদে নিযুক্ত থাকিয়া বুজর্গ উমেদপুর পরগণা ও সেলিমাবাদ পরগণা আয়ত্ত করেন, তৎসময়ে রামপ্রসাদ ওয়েদাদার ছিলেন, রাজবিধানানুসারে ঐ উভয় পরগণা প্রথমতঃ ওয়েদাদারের হস্তে পতিত হয়। রাজবল্লভের পূর্ব্বে রামপ্রসাদের হস্তে বুজর্গ উমেদপুর পরগণার ভারার্পণের কথা যাহা শুনা যায় তাহা এই বিবরণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হইতে পারে পরাক্রান্ত বাকের ১৭৪৩ খৃঃ অব্দের পরে সেলিমাবাদের সাড়ে চারি আনা অংশও হস্তগত করিয়াছিলেন। পরে জমিদারেরা উহা পুনঃ প্রাপ্ত হন।

(১) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ৫ম রিপোর্টে ঢাকা নেয়াবতি দেখ।

হইল/বাকেরকাটী। এতদ্ভিন্ন স্বীয় ভ্রাতা আগা বা মীর্জা মেহেন্দীর নামে একটী বন্দর ওপ্তে আবদুল্লাপুর পরগণায় সংস্থাপন করিয়া উহার নাম রাখিলেন মেহেন্দীগঞ্জ ও ঐ পরগণায় স্বীয় পুত্র সাদেকের নামে একটী গ্রামের পত্তন করিয়া সাদেকপুর নাম প্রদান করেন। কালে এই বাখর গঞ্জ নামে একটী জেলার ও মেহেন্দীগঞ্জ নামে একটী থানার পত্তন হইয়া আজি পর্য্যন্তও ঐ নামে চলিয়া আসিতেছে।

এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যে উপায়ে মীর হবীবের অনুকম্পায় আগা বাকের জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন, সেই উপায়েই নাটোরের রঘুনন্দন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কৃপায় প্রধান জমিদারী প্রাপ্ত হন। লালা উদয়নারায়ণের রাজসাহী, রাজা সীতারাম রায়ের ভূষণা প্রভৃতিও ঠিক এইরূপে হস্তান্তরিত হইয়া নাটোরের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই স্থলে ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে, তৎসময় পর্য্যন্ত জমিদারগণ ভূমির প্রকৃত মালিক ছিলেন না, নবাব বা বাদসাহগণের ইচ্ছার উপর তাঁহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। কোনরূপ ক্রটী ধরিয়া তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা উচ্ছেদ করিয়া অন্যের হস্তে জমিদারী সমর্পণ করিতে পারিতেন। এক ভূষণার দ্বারাই আমরা এই কথার প্রমাণ করিতে পারিব। প্রথম উহা মুকুন্দরামের বংশধরগণের করায়ত্ত ছিল, ঔরঙ্গজেব বাদসাহের অনুকম্পায় সংগ্রাম সাহ উহা প্রাপ্ত হন। পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ সংগ্রামের উত্তরপুরুষ হইতে উহা হস্তগত করেন। আবার মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহে সীতারামকে ধ্বংস করিয়া রঘুনন্দন উহা স্বীয় ভ্রাতা রাম-জীবনের নামে জমিদারী করিয়া লন। সুতরাং এই সকল কার্য্যপরম্পরা দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, তখন নবাব বা বাদসাহের অনুগ্রহের উপরই ভূম্যধিকারীর স্থায়িত্ববিধান ছিল। ছলে বলে যখন ইচ্ছা, প্রয়োজনমত কাড়িয়া লইলেই হইত। কিন্তু তখনকার জমি-দারগণও সামান্য বলসম্পন্ন ছিলেন না। এই উপলক্ষে প্রায়ই রক্তপাত

না হইয়া কার্য্যের মীমাংসা হইত না। সাধারণতঃ এই জমিদারীলাভ রাজভৃত্যগণের ভাগ্যেই সংঘটিত হইত। যে স্বার্থপর স্বজাতির প্রতি যতটা উৎপীড়ন করিয়া রাজার কিঞ্চিৎ লভ্য দেখাইতে পারিতেন, সেই স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহীরাই কালে জমিদার সংজ্ঞায় গণনীয় হইতেন। বাঙ্গালী স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহিতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তবে পূর্ব্বে উহাতে লাভ হইত রত্ন, এখন ছাইমুষ্টি পাইয়াই বাবুরা কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

নবাব করতলব জাফর মুর্শিদকুলী খাঁর বংশ নিপাত করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব নাজিমী পদ গ্রহণ করিলে পর, একমাত্র নবাব সুজাউদ্দীনের জামাতা ২য় মুর্শিদ (লুৎফউল্লা) ব্যতীত আর কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রহিলেন না। এই সময়ে মীর হবীব সহ মুর্শিদ উড়িষ্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। আলীবর্দ্দী তাঁহাকে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব হইতে পদচ্যুত করিয়া দেশপরিত্যাগ করিবার অনুমতি প্রেরণ করেন। মুর্শিদ স্বীয় বনিতা সরফরাজ খাঁর ভগিনীর প্ররোচনায় কোনমতে ঐ কথায় স্বীকৃত হন নাই। এজন্য তাঁহার সহিত আলীবর্দ্দীর ভয়ানক যুদ্ধ হয়; উহাতে পরাস্ত হইয়া মুর্শিদ স্বীয় পরিবারসহ মসলীবন্দরে প্রস্থান করেন*। সরফরাজ খাঁর পুত্রপরিবার মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকায় প্রেরিত হয়।

এদিকে ধূর্ত্ত বাকের আলীবর্দ্দীর নবাবনাজিমী পদ-প্রাপ্তিসংবাদ অবগত হইবামাত্র বিবিধ উপচারে উপঢৌকন ও নজরানা প্রদান করিয়া তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনে ত্রুটী করিলেন না। তৎকালে পূর্ব্বপ্রভু সরফরাজ বা সুবেদার মুর্শিদের এবং প্রিয়মিত্র মীর হবীবের কথা তাঁহার স্মরণপথে একবারও উদিত হইল না। মীর হবীব শেষ পর্য্যন্ত প্রভুবংশের জন্য পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদানান্তর বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করেন নাই। কিন্তু স্বার্থপর হিংস্র বাকের সমুদয় পূর্ব্বকথা

* তারিখ বাঙ্গালা। মুতাক্ষরীণ প্রথম খণ্ড ১ম অনুবাদ ২৮০ পৃষ্ঠা।

বিস্মৃতিসাগরে ভাসাইয়া দিয়া আলীবর্দ্দীর পাদুকাবহনে কৃতার্থ বোধ করিতে লগিলেন। কয়েক বৎসর উপাসনার পর তাঁহার আশা সফল হয়, বাকের ফৌজদারের পদ হইতে উন্নীত হইয়া চট্টগ্রামের শাসনকর্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন (১)।

তৎসময়ের প্রথানুযায়ী বাকের কচিৎ চট্টগ্রামে গমন করিতেন, প্রায়ই তৎপুত্র সাদেক প্রতিনিধিরূপে তথায় অবস্থান করিতেন *। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আগা বাকের পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন।

রাজবল্লভ ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় ভ্রাতা রাজারামের পরিত্যক্ত পদে কানুনগোর সেরেস্তায় প্রবেশ লাভ করেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রাজারাম কতকাল এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া বিক্রমপুরের তহশীলদারী পদ প্রাপ্ত

(১) 1. Taylor's Topography of Dacca.

2. Revenue History of Chittagang p. 3, by S. Cotton.

* মুসলমান রাজত্বের এই একটী প্রথা ছিল যে, একবার রাজকীয় খাতায় নাম রেজেষ্টরী করিয়া কোন কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারিলে, তজ্জন্য আর তাহাকে বড় খাটিতে হইত না। পরিবারস্থ বা অন্য একজন লোককে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ কার্য্যসম্পাদন জন্য রাখিয়া দিলেই চলিত। নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁর উপর ঢাকার সুবেদারী ভার অর্পিত হয়, কিন্তু সরফরাজ স্বীয় প্রতিনিধিরূপ গালেব আলীকে রাখিয়া দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের সহায়তায় ঐ কার্য্যসম্পাদন করাইতেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নবাবী সময়ে জামাতা নোয়াজেস মহম্মদের প্রতি ঢাকা সুবার ভার অর্পিত হয় কিন্তু নোয়াজেস স্বয়ং তথায় না যাইয়া স্বীয় প্রতিনিধি হুসেনকুলী খাঁর দ্বারা দেওয়ান গোকুলচাঁদের সহায়তায় ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এমন কি পরে আবার হুসেনকুলীর প্রতিনিধি স্বরূপ তদীয় ভ্রাতুপুত্র হুসেনদীন দ্বারাও ঢাকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এই সময়ে রাজবল্লভ তাঁহার প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ বা দেওয়ান ছিলেন।

হন *। রাজবল্লভের জীবনীলেখক ৺চন্দ্রকুমার রায় মহাশয় বলেন, রাজারাম বাল্যকালে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিয়া নবাব সরকারে কানুনগোর সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন। রাজবল্লভ অধ্যয়ন শেষ করিয়া ঢাকা নবাব-সরকারে এক কার্য্যে নিযুক্ত হন (১)। রাজা রাজবল্লভের দ্বিতীয় জীবনীলেখক ৺উমাচরণ রায় কানুনগো, গুরুদাস গুপ্তের রচিত এক প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে লেখেন যে, "ক্রমে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা লাভ করিয়া ১৯ বর্ষ বয়োগতে ঢাকার নায়েব নাজেম মুরাদ আলী খাঁর অধিকারকালে রাজবল্লভ স্বীয় পিতার পরিত্যক্ত পদ লাভের বাসনায় ঢাকা গমন করেন। * * * তথায় যাইয়া অভীষ্ট পদলাভে কৃতকার্য্য হইলেন (২)।" এস্থলে লেখক মহোদয় মুরাদ আলীর অধিকার বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল, এই স্থানে ঘালেব আলী হইবে। অতঃপর ১৭৩৩।৩৪ খৃঃ অব্দে আমরা রাজবল্লভকে নাওরার মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই, এই সময়ে সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ ঘালেব আলী ঢাকার সুবেদার নিযুক্ত হন, যশোমন্ত রায় তাঁহার দেওয়ান এবং সুজার জামাতা মোরাদ আলী নাওরার দেওয়ানী কার্য্য করিতেছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ৫ম রিপোর্টে দেখা যায়, এই সময়ে রাজবল্লভ রাজনগর নামে একটী জমিদারী সৃজন করিয়া স্বীয় বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণের নামে মালিকি স্বত্ব লিখিয়া দেন। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বা বাঙ্গালা ১১৩৫ সনের বন্দোবস্তে পরগণার সদর রাজস্ব ৮৬২৯৮৲ টাকা

* ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ৫ম রিপোর্টে দেখা যায়, রাজারাম বিক্রমপুরের তহশীলদার ছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেরেস্তায় গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণেও ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, এই রাজারাম, জপসাবাসী দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়ের ভ্রাতা, রাজবল্লভের ভ্রাতা রাজারাম নহেন।

(১) রাজা রাজবল্লভ জীবনচরিত ৫ পৃষ্ঠা।

(২) মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত। নবনূর ১৩১১ সন পৌষ ৪০৪ পৃষ্ঠা।

স্থির হয়। পরে ১১৭০ সনের বন্দোবস্তে উহার জমা ৮৮৩৮৯৲ টাকা ধার্য্য হয়। রাজবল্লভের প্রথম কার্য্যারম্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ জমিদারী অর্জ্জনও বিনদায়নীয়া নামের পরিবর্ত্তে রাজনগর নামকরণ করিয়া উহাকে নানাবিধ হর্ম্ম্যাবলীতে পরিশোভিত করা কম অর্থের সম্ভাবনা নয়। পরে ঘালেব আলীর পরিবর্ত্তে মোরাদ আলী খাঁ ঢাকার শাসনকার্য্য প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীয় প্রিয়পাত্র রাজবল্লভের প্রতি নাওরার কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করেন। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্টের মতে নাওরার কার্য্যকালে রাজবল্লভ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন *। যাহাহউক অতঃপর আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব সময়ে হুসেনকুলী ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে পর, পূর্ব্ব দেওয়ান গোকুল চাঁদের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। সেই সূত্রে দেওয়ান রাজ্যচ্যুত হইলে (১) রাজবল্লভ তৎপদে নিযুক্ত হন। (১৭৪৩ খৃঃ অব্দে) (২)।

ঢাকাতে হুসেনকুলীর ও রাজবল্লভের আধিপত্য ক্রমে বাড়িতে থাকিলে, আগাবাকের ও দেশস্থ লোকেরা তাঁহাদের প্রতি যার পর নাই ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠেন। প্রাচীন আগাবাকেরও তাঁহাদিগকে ত গ্রাহ্যই করিতেন না; অন্যান্য সকলকেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া

* ষ্টুয়ার্ট বঙ্গবাসী এডিসন ৫৬৪ পৃষ্ঠা।

(১) ঢাকার দেওয়ান গোকুলচাঁদের হুসেনকুলীর ষড়যন্ত্রে অবমানিত ও পদচ্যুত হইবার পর হইতেই রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠা। (১১৫৫ হিঃ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ) মুতাক্ষরীণ ১ম খণ্ড। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস। ১৯১ পৃষ্ঠা।

(২) এই সময়ে ঢাকায় হুসেনকুলী খাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র গোকুলচাঁদ পেস্কার হন। কিন্তু গোকুলচাঁদ স্বীয় প্রভু হোসেনকুলীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আলীবর্দ্দীর নিকট অভিযোগ করিলে হুসেনকুলী পদচ্যুত হন। শেষে আলীবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠতনয়া নিবাইস মহম্মদের পত্নী ঘেসেটি বেগমের সহায়তায় ও ভালবাসায় হুসেনকুলী আবার স্বীয় পদলাভ করেন। তিনি হিসাবনিকাশের দায়িত্বে ফেলিয়া গোকুলচাঁদের সর্ব্বনাশ করিয়া তৎপদে রাজবল্লভকে নিযুক্ত করেন।

বিশ্বকোষ রাজা শব্দ দেখ, ৪০৩ পৃষ্ঠা।

দিতেন। বুদ্ধিমান রাজবল্লভ বৃদ্ধ ও ক্ষমতাশালী বাকেরের এই তুচ্ছ তাচ্ছল্য দেখিয়াও দেখিতেন না। ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, আগার তরফ হইতে চট্টগ্রামের রাজস্ব ও জমিদারীর কর উভয়ই বন্ধ হইল। তখন আর রাজবল্লভ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হুসেনকুলীকে বলিয়া তদ্বারা যাবতীয় বিবরণযুক্ত আবেদনপত্র আগাদের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ নিজামত দরবারে প্রেরণ করিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর নিজামত দরবার আগা বাকেরকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তৃত্ব হইতে পদচ্যুত করিলেন (১১৬০ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৪ খৃঃ অব্দ)।

সাদেক চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা প্রত্যাগমন করিয়া পিতার উপদেশ মত ঢাকার রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতিকূলে আপীল করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ গমন করেন। কিন্তু হুসেনকুলী খাঁর চক্রান্তে তথায় বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হন (১৭৫৫ খৃঃ অব্দে)।

এই সময় নবাব নাজিম আলীবর্দ্দী ও বাঙ্গালার দেওয়ান ঢাকার সুবেদার নোয়াজিস উভয়েই রোগশয্যায় শায়িত। একদিকে সিরাজ উদ্দৌলা অপর দিকে হুসেনকুলীই একরূপ কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। হুসেনকুলীর প্রতিনিধি হইয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনদ্দীন ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজবল্লভ অধিকাংশ সময় ঢাকায় থাকিতেন ; কখন কখন মুর্শিদাবাদে ও নোয়াজিসের আজ্ঞামত অবস্থান করিতেন। তৎকালে তৎপুত্র কৃষ্ণদাসের প্রতি ঢাকার কার্য্যভার অর্পিত থাকিত।

পূর্ব্ব হইতেই হুসেন কুলীর প্রতি সিরাজের দ্বেষভাব ছিল ; কিন্তু মাতামহকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারায় এতদিন তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ রাজবল্লভের বুদ্ধিমত্তায় হুসেনকুলী ঢাকাতে এমন একটী দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, সিরাজ হুসেনের গাত্রস্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। সাদেকের কারারুদ্ধ হইবার সংবাদ অবগত হইয়া সিরাজ তদ্বারা স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের উপায় করিয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হন।

নিশীথে সিরাজউদ্দৌলা কারাগারে গমন করিয়া সাদেকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরস্পর সৌজন্য পরিদর্শনের পর, সিরাজ আপন মনোগত ভাব সাদেককে জানাইলেন। সাদেক তাঁহার কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, কিন্তু পরিণামে এজন্য বিপদে পড়িতে না হয় তজ্জন্য সিরাজকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন। কথা থাকে—সাদেক ঢাকা গমন করিয়া হুসেনের প্রাণবধ করিবেন ও স্বয়ংঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্বপদে বরিত হইবেন, সিরাজ তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। সাদেক আরও মনে করিলেন যে, দু'দিন পরে ত সিরাজউদ্দৌলাই নবাবীপদে বরিত হইবেন, অতএব তাঁহাকে নিশ্চয় সিরাজ রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন।

সাদেক ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ঢাকাতে উপনীত হন। কেহ তাঁহার আগমনের বিন্দুবিসর্গও পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই। স্বীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া তিনি পিতা বাকের ও পিতৃব্য মেহেন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মুর্শিদাবাদের যাবতীয় বিবরণ সাদেক তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া হুসেনকুলী খাঁর উপর বাকের ও মেহেন্দী যার পর নাই উত্তেজিত হইয়া, সিরাজের আদেশ পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন; পরে দ্বাদশজন অনুচরসহ অতর্কিতভাবে নিশীথ সময়ে হুসেনদ্দীনের নবাবগঞ্জের বাসভবনে উপনীত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। হুসেনদ্দীন ইতিপূর্ব্বে এতদ্বিষয় কোনরূপ অবগত হইতে পারেন নাই, কাজেই অসতর্ক অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া এত শীঘ্র হত্যা করিল যে, রাজকীয় সৈন্য বা কর্ম্মচারীরা কেহ হুসেনদ্দীনের মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ব্যাপার অবগত হইতে পারেন নাই (১)।

(১) ইতিপূর্ব্বে সিরাজের পরামর্শে ঢাকায় হুসেনকুলীর ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনদ্দীন খাঁর প্রাণবধের কথার উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস ১৮০ পৃষ্ঠা মোতাক্ষরীণ ট্রেঞ্জলেসন ১ম ৬৪৬ পৃষ্ঠা ও বিভারেজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ৯৪ ও ১১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

অরুণোদয়ের সহিত বাকের সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন, হুসেনদ্দীনের বধকার্য্য নিজামত দরবারের আদেশমত সম্পন্ন এবং ঢাকার সুবেদারী ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে ৺গুরুদাস গুপ্তের অনুসরণকারী ৺উমাচরণ রায় কানুনগো মহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ঢাকা নগরে আগা মেহেদী ও আগা বাকের নামে দুইভ্রাতা (১) অতি প্রধান ভূম্যধিকারী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি বসতি করিত। তাহারা মিলিত হইয়া দিল্লীশ্বরের কৃত্রিম নিয়োগপত্র ও কৃত্রিম পাঞ্জা প্রস্তুত করতঃ আপনাদিগকে সুবেদার প্রকাশ করিয়া হঠাৎ অতি সুশীল ধার্ম্মিকবর ঢাকার নবাবের (২) শিরশ্ছেদন করিয়া ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে আগা মেহেদী স্বয়ং সুবেদারীপদ গ্রহণ করে। দেওয়ান কৃষ্ণদাস বাহাদুর কর্ত্তৃক উহা মুর্শিদাবাদের প্রধান-নবাব-সদনে ব্যক্ত হইলে, নবাব ঐ ঐ দুরাত্মাদিগের শিরশ্ছেদন ও যথাসর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠনের আদেশ দিয়া

(১) কেহ কেহ পিতাপুত্র বলেন, বাস্তবিক ভ্রাতা সম্পর্কই যথার্থ।

(২) লেখক এস্থলে "সুশীল ধার্ম্মিকবর ঢাকার নবাব" বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনি হুসেনদ্দীন। নোয়াজেস মহম্মদ বা হুসেনকুলী নহেন। কিন্তু কি গুরুদাস গুপ্ত কি উমাচরণ রায় তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। "সিরাজের জ্যেষ্ঠতাত নোয়াজিস্ মহম্মদ নামে ঢাকার ডিপুটী নবাব হইলেও মহারাষ্ট্রীয় হাঙ্গামার সময় হইতেই তিনি ঢাকায় পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার প্রিয়পাত্র হোসেনকুলী খাঁ দেওয়ান হইয়া তাঁহার নামে ঢাকার শাসনকার্য্য করিতেন, খ্যাতনামা বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার ছিলেন। কালক্রমে হোসেনকুলী নোয়াজিসের গৃহে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন ক্রমে এই কর্ত্তৃত্ব অনেক দূর গড়াইল। আলীবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা নোয়াজিস-পত্নী ঘেসিটী বেগমের সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয়-কথা ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল; সিরাজের মাতা আমিনাবেগমের নামেও শেষে ঐ কলঙ্ক রটিল।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস ১৭৮ পৃঃ।

পাঠকগণ এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে নোয়াজিস্ ও হুসেন-কুলী মুর্শিদাবাদেই অবস্থান করিতেছিলেন, হুসেন মুর্শিদাবাদের বিলাস পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় থাকিতে ভালবাসিতেন না। কাজেই স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনদ্দীনকেই প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় রাখিয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঢাকার সুবেদার ও তৎকালীন নবাব বলিলেই সকলের মনে নোয়াজিসের কথা স্মরণ হয়।

সেনা, সেনানী সহিত মহারাজাকে ঢাকা নগরে প্রেরণ করেন। তদনুসারে সসৈন্যে মহারাজ ঢাকানগরে আসিয়া দুরাত্মাদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া সপরিবারে বন্ধনপূর্ব্বক যৎসামান্য ধনসম্পত্তি যাহা পাওয়া গেল, তন্মাত্র বিলুণ্ঠন করিয়া অবশিষ্ট গুপ্তধন প্রকাশার্থ আগার দেওয়ান রামকেশব সেনকে ধৃত করিয়া শিরশ্ছেদের ভয় দর্শাইয়া অনেক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তথাচ রামকেশব আপন প্রভুর গুপ্তধনের তত্ত্ব ব্যক্ত করিল না। অনন্তর কেশবের কনিষ্ঠভ্রাতাদ্বয় শ্রীনাথ ও রঘুরাম, যাহারা ঢাকার নবাবের অধীনে কোন কর্ম্মচারিত্বে ছিল, তাহারা মহারাজা সন্নিধানে আসিয়া অনেকানেক বিনয় কৌশলক্রমে আপন ভ্রাতার নিষ্কৃতি ও প্রাণরক্ষা করে। পরে অশেষ অনুসন্ধানে আগার শয়নাগারের পশ্চাৎভাগের গুপ্তপ্রকোষ্ঠে যে মূল্যবান হীরা, চুণী, মণি এবং স্বর্ণ রৌপ্যমুদ্রাদি প্রোথিত ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়া আগা মেহেদী ও আগা বাকেরের বংশ ধ্বংস করিয়া সত্বর বিলুণ্ঠিত ধনরত্নাদিসহ মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবকে প্রদান এবং আগাদ্বয়ের সবংশে ধ্বংসকরণ বৃত্তান্ত বিদিত করেন। তাহাতে নবাব সন্তোষ হইয়া আনীত দ্রব্যাদির অর্দ্ধ এবং আগাদ্বয়ের জমিদারী বুজের্গ উমেদপুর মহারাজকে প্রদান করেন।" (১)

আমরা উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারিলাম, হুসেনদ্দীনের বধসাধন সময়ে রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় ছিলেন না। উহার প্রধান কারণ এই যে, তখন নোয়াজিস মহম্মদ মৃত্যুশয্যায় পতিত। উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের পরামর্শ জন্য রাজবল্লভকে এজন্য মুর্শিদাবাদে ডাকিয়া আনা হয়। আবার রাজবল্লভের শত্রুগণ এই সময়ে তৎকর্তৃক রাজসরকারী তহবিলতশ্রুপের অভিযোগও উপস্থিত করে। তৎকালে নিকাশ

(১) মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত। ৺উমাচরণ রায়-প্রণীত। নবনূর ১৩১১ সন ফাল্গুন ৫০২ পৃষ্ঠা।

দিবার জন্যও তাহাকে মুর্শিদাবাদে আসিতে হয় (১)। তৎকালে রাজপুত্র কৃষ্ণদাস পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকার রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। অতএব হুসেনদ্দীন খাঁর বধবৃত্তান্ত তাহাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিতে হয়। (২) হুসেনকুলী এতৎবিবরণ অবগত হইয়া শোকে ও ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন, কিন্তু চতুর ও সাহসী রাজবল্লভ উহাতে অনুমাত্র বিচলিত হন না। তিনি নোয়াজিস্‌কে বলিলেন, অনুমতি পাইলে আগাদিগকে তিনি অনায়াসে দমন করিতে সমর্থ হইবেন। তৎপর নোয়াজিসের অনুমতি লইয়া রাজবল্লভ ঢাকায় প্রত্যাগমন করিয়া আগাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। কিন্তু লেখক আগাবংশ ধ্বংসের শেষ বিবরণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত। এই ব্যাপারে প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

রাজবল্লভ ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হইবামাত্র রাজস্ব ও সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীরা সমবেত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আগাবাকের মুর্শিদাবাদের দরবারের অনুমতি মত ঢাকার কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্তির কথাও হুসেনদ্দীর প্রাণবধের অনুমতির কথা যাহা প্রচার করিয়াছে, তাহা যে সমুদয় মিথ্যা তাহা রাজবল্লভের বাচনিক সকলেই অবগত হইতে পারিলেন, তখন কতকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পাঞ্জা ও নিয়োগ পত্র দেখাইবার জন্য বাকের নিকট গমন করেন। তাহার নিকট এই

(১) নবাবের অন্তিমকালে রাজবল্লভ শত্রুপক্ষের অভিযোগে নিকাশ দিতে মুর্শিদাবাদে আসিতে বাধ্য হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস ১৯১ পৃষ্ঠা।

সেরাজের মহম্মদের মৃত্যু ঘটনার সময় তিনি (রাজবল্লভ) মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস ১৯৩ পৃষ্ঠা।

(২) কৃষ্ণদাসকে সাধারণে "নবাব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এসময়ে মীর আবুতালেব কৃষ্ণদাসের নায়েব স্বরূপে বিদেশীয় বণিক্‌দিগের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন করেন। তাঁহার আদেশে একজন সম্ভ্রান্ত ওলন্দাজ বণিক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। (বিশ্বকোশ রাজা শব্দ ৪০৩ পৃষ্ঠা)

প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্র বাকের তরবারি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দেন। পরে উভয় পক্ষের যুদ্ধ বাধিয়া গেল, অসীম সাহসের সহিত বৃদ্ধ বাকের মেহেদি ও যুবক সাদেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিল, কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যেই বাকের বিপক্ষের তরবারি আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মেহেন্দী ও সাদেক অনন্যোপায় হইয়া বিক্রমের সহিত শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া দ্রুতগতিতে পলাইয়া যান (১)। তাঁহাদিগকে আর ধৃত করিবার সুবিধা হইল না। সিরাজউদ্দৌল্লা এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, কিন্তু তখন স্বয়ং রাজা নন; বিশেষতঃ এই সময়ে রাজবল্লভের দ্বারা নোয়াজিসের পক্ষে এমন একটী প্রবল বাহিনী ঢাকাতে প্রস্তুত হইল যে, নিজামত দরবার ইচ্ছা করিলেই তদ্বিরুদ্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ অন্তিমকালে রাজবল্লভকে ডাকিয়া সিরাজের সহিত সম্মিলন জন্য শপথ করাইয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজ আগাবাকেরের এই অবমাননার জন্য চিরকাল রাজবল্লভের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

অতঃপর যে প্রথা অবলম্বনে, নাটোরের অভ্যুদয় ও আগা সাহেবদের ভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রতিষ্ঠা হয়; রাজবল্লভের অদৃষ্টেই তাহা ঘটে। অতঃপর আগাবাকের সমুদয় সম্পত্তি রাজবল্লভের নিকট গচ্ছিত হইল এবং মেহেদি স্বীয় জমিদারী মেদিরাবাদ আবদুল্লাপুর ও মেহেদিগঞ্জ প্রভৃতি, রাজা

(১) ঢাকা হইতে পলায়ন করিয়া সাদেক মুর্শিদাবাদ গমন করেন (সইর ৬৪৬ পৃষ্ঠা) ও তৎপর দুইতিন বৎসর যাবৎ তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১১৬৪ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মীরজাফরের শাসনকালে তিনি ঢাকাতে প্রত্যাগমন করেন এবং নবাব জাফরআলী খাঁ হইতে স্বীয়পুত্র মোহম্মদ সালেবের নামে বুজের গো উমেদপুর পরগণার ওয়েদাদারী" প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পৈতৃক জমীদারীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন ১১৬৬ বঙ্গাব্দে বা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নব্যভারত ১৩১২ সন বৈশাখ ১৪ পৃষ্ঠা।

রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র লালা রামপ্রসাদের নিকট বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করেন (১) আমরা এই বিক্রয় কবালা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। (২) সম্ভবতঃ রাজবল্লভ ও রামপ্রসাদ স্বস্ব পদের অনুপাতানুসারে আগাদের জমিদারী বণ্টন করিয়া লন।

রাজা রাজবল্লভ যে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আগার জমিদারীর স্বত্বাধিকারী হন নাই, তাহা মীরজাফরের সময়ে পুনরায় সাদেকের পুত্রের জমিদারী লাভের ব্যাপার হইতেই প্রতিপন্ন হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ বা বাঙ্গলা ১১৭০ সন পর্য্যন্ত ঐ পরগণার মালিকের স্থানে সাদেক নামই স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণীতেও উহাই দৃষ্ট হয়। ১১৩৫ বঙ্গাব্দের বন্দোবস্তে এই জমিদারীর রাজস্ব ছিল ৫৯৩১ টাকা; কিন্তু ৭০

(১) মির্জ্জা মেদী (মির্জ্জা মেহ্‌দি) নামক সাদকের এক ভ্রাতা তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি ও তাহার বংশের কটিসা (খতিজা) খাজান নাম্নী এক রমণী আপনাদিগের হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কল্পে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৬ মে তারিখে কলিকাতা কৌন্সিলে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। নবনুর ২য় বর্ষ ১৩১২ সন বৈশাখ ১৪ পৃষ্ঠা।

Petition from Mirza Meudi and Kattisa Khanam to the Calcutta Council, dated 6th May 1774, quoted in Beveridge's Backergunge.

(২) মিঃ বিভারিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এই পরগণা বা তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। উহাতে জানা যায় তৎকাল পর্য্যন্ত জপ্‌সার লালাবংশীয় হরনাথ রায় প্রভৃতি উক্ত পরগণার সত্বাধিকারী ছিলেন। পরে উহা তাঁহাদের হস্তভ্রষ্ট হইয়া অন্যান্য লোকের হস্তগত হইয়াছে। আগা মেহেদীর প্রদত্ত কবলা ভোজেশ্বরবাসী পাল ভূম্যধিকারিগণের গৃহে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। লালা রামপ্রসাদ মুর্শিদাবাদ নবাবের অধীনে কার্য্য করিতেন যথা "পরে বিক্রমপুর জপ্‌সা নিবাসী লালা রামপ্রসাদ সেন। যিনি জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র অথচ মুরশিদাবাদের নবাব সরকারের এক কর্ম্মচারী ছিলেন ইত্যাদি। পরে রাজবল্লভের আগ্রহে ঢাকা নেয়াবতীতে পরিবর্ত্তিত হন।

নবনুর ১৩১১ সন ৪০৬ পৃষ্ঠা। ৺উমাচরণ রায় কাননগোর প্রণীত মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত আবদুলকরিম প্রকাশিত।

সনের বন্দোবস্তে উহার জমা ধার্য্য হয় ২০১২৭৪ টাকা। মীরজাফরের রাজ্যচ্যুতির সহিত পুনরায় উহা রাজবল্লভের হস্তগত হয়।

হুসেনকুলীর দোষবশতঃ তদীয় অন্ধ ভ্রাতা হায়দর কুলীকে ও তৎ পুত্র হুসেনদ্দীনকে হত্যা করিয়া সিরাজ যে মহা পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একজন খ্যাতনামা লেখক এস্থলে বলিয়াছেন হুসেনকুলীর সম্বন্ধে উল্লিখিত কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার অন্ধভ্রাতা হায়দর বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষয়ে অবশ্য কিছু বলিবার নাই। অন্য সময়ে না হউক, তাঁহার শোচনীয় শেষ মুহূর্ত্তে সিরাজকে এজন্য বড়ই অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। গোলাম হোসেন্ জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—এই নির্দ্দোষের রক্তপাত চির দিনের জন্য আলীবর্দ্দীর বংশে কলঙ্ক লেপন করিয়া রাখিয়াছে, এবং ইহাই তাহার ধ্বংসের মূলীভূত কারণ। (১)

লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব সত্য কথা। গোলাম হোসেনের উক্তিও এস্থলে উপযুক্তই হইয়াছে। এই অত্যাচারের মূলে থাকিয়া বিশেষ স্বহস্তে যে একজন নিরপরাধ শাসনকর্ত্তাকে সমন সদনে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, চোরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিয়া গলায় ছুরি বসাইয়া দিতে পারি, তাহার বা তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় পাপী কি আর জগতে আছে? ইতি পূর্ব্বে আগাবংশের সাহায্যে মীর হবীব কি অত্যাচারই না করিয়া গিয়াছেন, শতশত লোক তাহাদের উৎপীড়নে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার আত্মহত্যা দ্বারা উহাদের কঠোর শাসন হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই মঙ্গল-

(১) অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস ১৮০ পৃষ্ঠা।

The innocent blood spilt on that occasion proved as fertile in trouble as that of SIAVUSH of old, &c. Mut. pp. 649.

হোসেনকুলী প্রভৃতির হত্যার জন্য সিরাজ যে সম্পূর্ণ দোষী, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। (সম্পাদক।)

জনক জ্ঞান করিয়া সেই শোচনীয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া ভূম্যধিকারীর ভূমি গ্রহণ ত তাহাদের নিত্য ব্যাপার ছিল। এইরূপ লোকের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া যিনি তদপেক্ষা বহু গুণে উজ্জ্বল তাহাকে ম্লান করিতে যাওয়া একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই। আমরা রাজবল্লভের বহু দোষের বিষয় পরিজ্ঞাত আছি বটে, কিন্তু সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বলিতে পারি পাপের তুলনায় আগাবংশ হইতে রাজবল্লভ বহু পরিমাণে ন্যূন ছিলেন।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

শিখ-সাধনা। (১)

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্ত।

প্রজার ইচ্ছানুসারে যে রাজ্য পরিচালিত হয়, তাহাই স্থায়ী হয়। প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে সে রাজ্যের মঙ্গল নাই—ইতিহাস কঠোর স্বরে এই সত্য ঘোষণা করিতেছে। যখন রাজা মদগর্ব্বে মুগ্ধ হইয়া প্রজার স্বত্ব ভুলিয়া যান, প্রজাকে সামান্য কীট বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তখনই সেই রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতায় ও ক্ষমতাপ্রিয়তায় অতি মাত্র মুগ্ধ হইয়া মোগল রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যে সকল নরপতি একে একে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অকর্ম্মণ্য তামসিক জীব মাত্র। বিলাসিতায় মগ্নপ্রায়, নিষ্ঠুরতায় সিদ্ধহস্ত, কাপুরুষতায় কলঙ্কিত হইয়া তাঁহারা মোগল রাজ্যের সমূহ অনিষ্ট করিয়াছেন। আপনার আপাত সুখবিধানের জন্য পিতামাতাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া ভ্রাতৃগণের রক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া, নির্দ্দোষ পুরবাসিগণের নির্য্যাতনে ও অনাবশ্যক হত্যায় যে রাজ্য পরিচালিত হইতে চলিল, তাহার উন্নতি ও মঙ্গল কোথায়?—তাহা ত পতনের মুখে দ্রুত চলিয়াছে।

বর্ত্তমান নরপতি ফিরুখশিয়র একটি মানব-কলঙ্ক। তাঁহার রক্ত-পিপাসা বড়ই প্রবল। ভ্রাতৃগণের রক্ত পান করিয়া, পুরবাসিগণের ও কর্ম্মচারিবৃন্দের শোণিতপাত করিয়াও তাঁহার পাপ তৃষ্ণা মিটে নাই।

(১) শিখসাধনা—'শিখ সম্প্রদায়' গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

তাঁহার পিপাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য সহস্র সহস্র শিখকে অকালে ঘাতক-হস্তে দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা আমরা "শিখগুরু" অংশে * দেখিয়াছি, বীরপ্রধান বান্দাকে শাস্তি দিতে গিয়া সম্রাট যেরূপ নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা চিরকালই কৃষ্ণমসিতে ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

যখন মৃত্যুর কাল ঘনাইয়া আসে, তখন পাপীর পাপপ্রাণ নিরাশায় উন্মত্ত হইয়া উঠে —তখন তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান একেবারে লোপ পায়। তখন সে আপনাকে বিলাস-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া অধীন প্রজাগণের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। সুদৃঢ় রোমরাজ্য এই দোষে দুষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছিল; আর আজিকার এই মোগল রাজ্য ইতিহাসের কঠোর ইঙ্গিত জানিয়াও, তাহা উপেক্ষা করিল। ভাবিল, দেশের অসন্তোষ-বহ্নি নিবাইতে হইলে, প্রজাগণকে রাজভক্ত করিতে হইলে, তাহাদিগের উপর নির্য্যাতন করা দরকার; তাহাদিগকে দেখান চাই, রাজশক্তি কত বৃহৎ, কত কঠোর। ফিরূখশিয়ার মোগল রাজ্যের এই মৃত্যুকালে এই চিরন্তন প্রথা অবলম্বন করিতে ভুলিলেন না। তিনি প্রজাগণকে নিপীড়িত করিয়া মোগল রাজ্য স্থায়ী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তুরানী বীর আবদুল সম্মদ খাঁনের পরাক্রমে পরাজিত হইয়া বান্দা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন শিখদের বশীভূত করিবার জন্য সসৈন্য বান্দাকে যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা শিখেরা কখন ভুলিবে না। এ অত্যাচারে শিখেরা, কতকটা দমিল বটে; কিন্তু হতাশ্বাস হইল না। গোবিন্দ সিংহের উৎসাহ-বাণী এখনও তাহাদের কর্ণে বাজিতেছিল। তাহারা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল।

* শিখগুরুর অংশ ইতিপূর্ব্বে 'স্বদেশী' ও 'ঐতিহাসিকচিত্রে' প্রকাশিত হইয়াছে।

এমন সময় মোগল রাজ দরবার হইতে এক কঠোর রাজবিধি প্রচারিত হইল। সর্ব্বত্র ঘোষণা করা হইল, যে যেখানে শিখ দেখিবে, কোনরূপ রাজদণ্ডের ভয় না রাখিয়া নির্বিচারে তাহাকে হত্যা করিবে। যে একজন শিখকে হত্যা করিবে, সেই মোগলরাজের নিকট পুরস্কৃত হইবে। কেবল এইরূপ আদেশ করিয়াই বাদশাহ ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি জানিতেন, কেশ শিখগণের নিকট অতি পবিত্র। কেশ মুণ্ডন তাহাদের বিধি-বিগর্হিত কার্য্য। তাই আদেশ করিলেন—পঞ্জাবের হিন্দু মুসলমান প্রত্যেক প্রজাকেই 'মুণ্ডিত-কেশ-শ্মশ্রু-গুম্ফ' হইতে হইবে। যে কেহ এ বিধি লঙ্ঘন করিবে, তৎক্ষণাৎ সে নিহত হইবে।

এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র শিখদের উপর অমানুষিক অত্যাচার-স্রোত বহিল। হঠাৎ এরূপ বিপদে জড়িত হইয়া তাহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল। অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেকেই স্ত্রী-পুত্র লইয়া পঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব্ব দিক্‌স্থিত জঙ্গল সমূহে পলাইয়া গেল। যাহারা গৃহের মায়া কাটাইতে পারিল না, তাহারা বাধ্য হইয়া কেশাদি মুণ্ডন করিয়া রাজার চক্ষে ধূলি দিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম বড় কেহ একটা গ্রহণ করিল না। *

মোগলেরা সানুচর গোবিন্দের উপর যেরূপ অযথা অত্যাচার করিয়াছিল, বান্দা তাহার প্রতিশোধ লইতে যাইয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়া-

* The few Sikhs, that escaped this general execution fled into the mountains to the N. E. of the Panjab, where they found a refuge from the regorous persecution by which their tribe was pursued; while numbers bent before the tempest which they could not resist, and abondoning the outward usages of their religion, satisfied their conciences with the secret practice of its rites.—Malcolm's sketch. Vide every other histories relating the accounts of the sikhs.

ছিলেন, আজ সমস্ত শিখগণকে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। শিখেরা মোগলের নিকট রাজদ্রোহী। প্রকাশ্য রঙ্গস্থলে তাহাদের আবির্ভাবের আর উপায় নাই। সর্ব্বতোভাবে আজ তাহারা বশীভূত।

আবদুল সম্মদ খাঁ বড়ই ভীষণ লোক ছিলেন। তাঁহার শাসনে শিখেরা নির্ব্বীর্য্য হইল, পঞ্জাব হইতে শিখের দৌরাত্ম্য কিছুকালের জন্য লোপ পাইল। রাজসম্মানে সম্মদ খাঁ বিভূষিত হইলেন। * সবিশেষ গৌরবের সহিত প্রায় সপ্তদশ বর্ষ কাল শাসন-কর্তৃত্ব করিয়া সম্মদ খাঁ ইহলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে আবার পঞ্জাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সে কথা এখন থাক্, সম্মদ খাঁনের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে পঞ্জাবে আবার অশান্তির বহ্নি বহিয়াছিল। এ অশান্তির কর্ত্তা হিন্দু বা শিখ নহে। পাঠানেরা রাজ-ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া রাজদ্রোহী হয়। সে দ্রোহ বড়ই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা তাহার বিবরণ দিতেছি।

হোসেন খাঁর অধীনে পাঠানেরা মোগল রাজের বিরুদ্ধাচরণে ব্যাপৃত হয়। তাহারা কসুর ও লাহোর জিলার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি উর্ব্বর প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। হোসেন মোগল রাজকর্ম্মচারী ও অর্থ-সংগ্রহকারদের উপর নির্য্যাতন করেন ও যথেষ্ট সৈন্য-সংগ্রহ করেন। হোসেনের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য পঞ্জাবের মোগল রাজপ্রতিনিধি দিলার জঙ্গ আবদুল সম্মদ খাঁ কুতবুদ্দিনের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু কুতবুদ্দিন হোসেন খাঁর বীর্য্যের প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সৈন্যেরা রণস্থল ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। হোসেন মোগল সৈন্যের রসদাদি লুণ্ঠন করিয়া লই-লেন। অল্পকালের মধ্যে হোসেনের ছত্রতলে আট নয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমবেত হইল। হোসেন তাহাদের সাহায্যে পঞ্জাবের বিভিন্ন অংশ

* বান্দাকে বন্দী করার পর সম্মদ খাঁ 'দিলার জঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন। হোসেনের ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া সম্মদ খাঁ সাত আট সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। চুনান ক্ষেত্রে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। উভয় পক্ষই বেশ সুন্দরভাবে স্ব স্ব সৈন্য সমাবেশ করিলেন। উভয় দলের নেতৃগণ সকলেই বীর পুরুষ। বারে বারে সংঘর্ষ হইল। সে সংঘর্ষে রাজসৈন্য অত্যন্ত বিচলিত হইল। মোগলদের পরাজয় হয় আর কি, এমন সময়ে রাজ-পক্ষীয় অকৃঘর খাঁ প্রবল ভাবে পাঠানদের উপর আপতিত হইলেন। পাঠানেরা সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না। পাঠানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। হোসেন খাঁর মাহুত গত-প্রাণ হইয়া হস্তিপৃষ্ঠ ত্যাগ করিল। তাঁহার গুরু শাহবজ বেগ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। মোগলেরা তাঁহাকে নিহত করিল। একটি বন্দুকের গুলি আসিয়া হোসেন খাঁর ললাট ভেদ করিল। হোসেন তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলেন। পড়িতে না পড়িতে শত্রুর অসিতে তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। নেতার পতনে পাঠানেরা নিরুৎসাহ হইল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। এ যুদ্ধে উভয়পক্ষে যথেষ্ট হতাহত হয়। যুদ্ধে সম্মদ খাঁ বিজয়লাভ করিয়া বিজয়-দুন্দুভি বাজাইতে বাজাইতে লাহোরে ফিরিয়া গেলেন। এই সময় দিল্লীতে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের প্রবল প্রতাপ। তাঁহারা সম্মদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া পাদশাহের নামে তাঁহাকে সেফ-উদ্-দৌলা (রাজ্যের কৃপাণ) উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। *

এই সময় কাশ্মীরে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। এখানে সে কাহিনীর বর্ণনা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে এমন এক একটি অসভ্য মোল্লার আবির্ভাব হয় যে, তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের ভেদ না কমাইয়া বরং বাড়াইয়া তুলেন। আবদুল নবী এইরূপ একজন মোল্লা। তিনি ইতিহাসে মোতাবি খাঁ নামে সুপরিচিত

* Vide Latif's History of the Panjab. p. 192.

মোতাবি খাঁ কতকগুলি কাশ্মিরী মুসলমানকে উত্তেজিত করিয়া তথাকার হিন্দুর উপর প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করেন। তিনি ওজর করেন, হিন্দুরা অশ্বারোহণ করিতে পাইবে না, সাদা জামা ব্যবহার করিতে পারিবে না, কোনরূপ পাগ্ড়ী বা বর্ম্ম ব্যবহার করিবার অধিকার তাহাদের থাকিবে না। নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতিরেকে তাহারা কখন শিকারে ব' ভ্রমণে বাহির হইতে পারিবে না, এমন কি নির্দ্দিষ্ট দিন ব্যতিরেকে স্নানের অধিকার হইতেও তাহাদের চ্যুত করা চাই। * তাঁহার এ সমস্ত প্রস্তাবে তথাকার শাসনকর্ত্তা বিরক্ত হন ও এরূপ সংস্কারে অস্বীকার করেন। এ জন্য মোতাবির রোষাগ্নি অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠে। তিনি কাশ্মীর হইতে মোগল শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য দৃঢ়কর হন। তিনি শাসনকর্ত্তার বাটী আক্রমণ করিয়া ঢিল, পাট্কেল, গুলি ও তীর ছুড়িতে থাকেন। শাসন-কর্ত্তা শেষে বাধ্য হইয়া সৈন্য লইয়া মোতাবির দলকে দূরীভূত করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হয়। শাসনকর্ত্তার পরাজয়ে মোতাবি আনন্দে হতজ্ঞান হন ও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর ভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। হিন্দুদের ধরিয়া নাক কাণ কাটিয়া দেন। † তাহাদের হস্তপদ ছেদন করেন ও আরও নানারূপে

* ঔরঙ্গজেব মুসলমানদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য হিন্দুদের প্রতি অনেক অকথ্য অত্যাচার করেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি জিজিয়া কর প্রবর্ত্তন করেন। এই কর প্রত্যাহার করিবার জন্য পঞ্চাশ সহস্র হিন্দু অশ্রুপূর্ণলোচনে সম্রাটকে অনুরোধ করে। সম্রাট প্রজাদের সে কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাতও করেন নাই। তিনি হিন্দুদিগকে নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি এই যে,—বাদশাহের আদেশে হিন্দুদের ডুলিতে অথবা আরবীয় অশ্বে আরোহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল! ঐ আদেশটি তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাকি খাঁর পুস্তকে দেখা যায়। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ধর্ম্মান্ধ মোল্লারা হিন্দুদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চাহিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

† গোবিন্দসিংহের আমলের ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে দেখা যায় যে, মোগলেরা অনেক স্থানেই বন্দী শিখদের নাক কাণ কাটিয়া শাস্তি দিত। নাক কাণ কাটিয়া শাস্তি যেন এই যুগের মুসলমানদের মধ্যে একটা চিরপ্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল!

তাহাদের কষ্ট দেন। শেষে মোতাবি শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত করিয়া আপনাকে কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজা হইয়া মোতাবি দিস্কর খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন। অচিরে এ সংবাদ দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, মহিম খাঁ মোতাবির দর্প চূর্ণ করিবার জন্য প্রেরিত হন। মোহিম খাঁর আগমনে মোতাবি অত্যন্ত ভীত হন, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্য তখন তাঁহার অনুশোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু এখন আর সে অনুশোচনায় লাভ কি? অচিরে মোগলে পাঠানে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে মোতাবি খাঁ পরাজিত হইলেন। তাঁহার সমক্ষে তাঁহার শিশুপুত্র দুইটীর উদর বিদীর্ণ করিয়া নিহত করা হইল ও নানারূপ নির্য্যাতন করিয়া মোতাবিকে হত্যা করা হইল। মোতাবির হত্যায় তাঁহার পাঠান অনুচরেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা রাজধানীর তিন সহস্র শিয়া মোগলদের খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল, বহু সংখ্যককে অন্ধ করিয়া দিল। তাহারা কয়েক লক্ষ মুদ্রা এবং শিয়া মোগলদের রমণী ও শিশুদের লুঠিয়া লইয়া গেল। এই সময় অনেক গুলি মোগল পরিব্রাজককেও পাঠানদের হস্তে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে হয়। তার পর তাহারা তথাকার বড় বড় মোগল, রাজকর্ম্মচারীদের বাটী আক্রমণ করিয়া তাহা ধূলিতে পরিণত করে। ইহাদের কেহ লুকাইয়া, কেহ বা পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এই উন্মত্ত পাঠানদের দমন করিবার জন্য মোগলরাজকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। যথেষ্ট রক্তপাতের পর কাশ্মীরে শান্তি সংস্থাপিত হয়। কাশ্মীরে এই অশান্তিতে মোগলরাজের দৌর্ব্বল্য কতকটা বৃদ্ধি পায়। তথাকার হিন্দুরা মর্ম্মে মর্ম্মে পাঠান ও মোগলবিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল। এই অশান্তির ইহাই কুফল। *

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বীরবর আবদুল সম্মদ খাঁর ইহলীলার

* সায়র মুতাক্ষরিণ পুস্তকের প্রথম ভাগ ১৫৯-১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। Cf. Latif's History of the Panjab. p 192-193.

শেষ হয়। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে বাদশাহ সম্মদের ভ্রাতা উজীর কমরুদ্দীন খাঁকে সান্ত্বনা-সূচক একটী খিলাৎ উপহার দেন। সম্মদবংশের অনেকেই এই সময় সম্রাটের নিকট উক্তরূপ খিলাৎ প্রাপ্ত হয়। সম্রাট সম্মদের জ্যেষ্ঠপুত্র জকারিয়া খাঁকে খান্ বাহাদুর উপাধিতে বিভূষিত করিয়া লাহোর ও মুলতানের রাজপ্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত করিলেন।

জকারিয়া খাঁ পিতার পদাঙ্কানুসরণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুদের প্রীতির চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই মনে হয়। অপক্ষপাত শাসনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার অনেক সুখ্যাতি শুনা যায়। দেশের অবস্থা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণের জন্য তিনি ছদ্মবেশে পঞ্জাবের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সময়ে লাহোরের ধর্ম্মান্ধ মোল্লারা সামান্য সামান্য ঘটনা লইয়া হিন্দুদের সহিত কলহের সূত্রপাত করিতেন, কিন্তু জকারিয়া খাঁর সুশাসনের গুণে সে কলহ অল্পেই মিটিয়া যাইত, তিনি সেগুলি এমন ভাবে বিচার করিয়া দিতেন যে, কোন পক্ষই কথা কহিতে পারিত না। তাঁহার সম সাময়িক কোন ঐতিহাসিক তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণকালে বলিয়াছেন, লাহোর সহরে একটি হিন্দুর একটি পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ছিল। সহরবাসী কোন মোগল সেই রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রমণীকে তাহার সতীত্ব হইতে স্খলিত করিবার জন্য নানারূপ প্রয়াস পায়। প্রথম প্রথম সে নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া রমণীর মন হরণে চেষ্টা করে, কিন্তু সতী নারী পাপীর কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তখন মোগল তাঁহাকে স্বামী হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য এক মতলব আঁটিল। সে কোন উপায়ে সেই রমণীর শয়ন গৃহে একটি মুসলমানের ব্যবহার্য্য পোষাক রাখিয়া দিল। কিন্তু মোগলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। রাজপ্রতিনিধি জকারিয়া খাঁ এই সময় ফকিরের বেশে লাহোরের সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। মোগলের কাণ্ড তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি যথাসময়ে মোগলকে ধরিয়া

ফেলিয়া সকল কথা প্রচার করিয়া দিলেন ও মোগলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। * এইরূপ আরও অনেক কাহিনী তাঁহার মহত্ত্বের ও অপক্ষপাতিতার পরিচায়ক।

এত গুণ সত্ত্বেও জকারিয়া খাঁকে বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরা সম্মদ খাঁর দুর্ব্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারী বলিয়াছেন। যে কঠোরতা থাকিলে মানুষ অপরের প্রতি নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করিতে পারে, জকারিয়া খাঁর সে কঠোরতার মাত্রা সম্মদ অপেক্ষা যথেষ্ট অল্প ছিল, সন্দেহ কি? কিন্তু কেবল এ জন্যই তাঁহাকে অযোগ্য শাসনকর্ত্তা বলা যায় না।

লখপত রায় লাহোর নিবাসী ক্ষত্রিয়। তিনি সম্মদ খাঁর দেওয়ান ছিলেন। জকারিয়া খাঁ তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্মানিত করেন। তাঁহার ভ্রাতা যশপত রায় দেওয়ান ও মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। দুই ভ্রাতাই কার্য্য-গুণে রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন; কিন্তু বিনয়াধিক্য বশতঃ তাঁহারা সে উপাধি কখনও ব্যবহার করেন নাই। †

তাঁহার শাসন সময়ে শিখেরা আবার রঙ্গস্থলে দেখা দেয়। পঞ্জাবের জমীদারবর্গ মোগলের অধীনতা ছিন্ন করিয়া ফেলেন। রাজসরকারে কর দিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন ও প্রজাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন। এই সব প্রজাদের অনেকেই জাঠবংশীয়। তাহারা এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া শিখদের সহিত যোগ দিল। এই সময় শিখেরা বারিদোয়াব ও মঞ্ঝা জঙ্গলে বাস করিত। ‡

শিখেরা প্রতি ষষ্ঠমাসে অমৃতসরের পবিত্র হরমন্দির ও অমৃতসর সন্দর্শনে গমন করিত। তথায় তাহাদের সাম্প্রদায়িক সভা হইত। সে সভা গুরুমঠ নামে পরিচিত। গুরুমঠে শিখদের নানা বিষয়ে আলোচনা

* Vide Latif's History of the Punjab. 212.

† Ibid. p. 193.

‡ M' Gregory's History of the Sikhs. Chapter VIII.

হইত। পূর্ব্বে তাহারা প্রকাশ্যভাবে গুরুমঠে যোগ দিত। কিন্তু সম্মদের কঠোর শাসন প্রভাবে তাহাদের সে সাহস হইত না, তাহারা গুপ্তভাবে তথায় সমবেত হইত। কিন্তু এখন সম্মদের সে কঠোর শাসন নাই। তাই তাহারা আবার প্রকাশ্যভাবে অমৃতসর যাত্রা আরম্ভ করিল।

এই সময় শিখেরা যথেষ্ট সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সকলেই প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে আপনাপন ধর্ম্মালোচনা করিত ও ভবিষ্য উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিত। তাহাদের অনেকেই শিল্পাদিতে ও কৃষিকার্য্যে মননিয়োগ করিয়াছিল। অনেকে দস্যুবৃত্তি করিয়াও জীবিকার্জ্জন করিত। মোগলেরা তাড়া করিলে, জঙ্গলপ্রদেশে পলাইয়া যাইত। তথাকার জমীদারেরা সাদরে তাহাদের আশ্রয় দিত। শিখেরা দুই তিন জন মাত্র এক একটা গ্রামে আশ্রয় লইয়া সহজেই লুকাইয়া থাকিত, মোগলেরা সহজে তাহাদের সন্ধান পাইত না। * এই সমুদয় কারণে দেশে শিখের দস্যুতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। শেষে জকারিয়া খাঁকে বাধ্য হইয়া পিতৃপন্থাবলম্বন করিতে হইল। শিখদস্যুদের ধরিবার জন্য তিনি যথেষ্ট পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। ফলে ক্রমে শিখেরা ধরা পড়িতে লাগিল। † ধৃত শিখেরা লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া লাহোরের প্রকাশ্য রাজপথে নীত হইতে লাগিল ও তথায় সর্ব্বজন সমক্ষে নিহত হইতে লাগিল। এরূপ দণ্ডের পরিণামে শিখেরা যথেষ্ট শান্ত হইল। তাহারা

* Many of the Zamindars in the Monja cract of country were related to the Sikhs, and concealed the latter when pursued by the Mussalmans ; and in every village of this jungly cract, there were two or three Sikh horsemen quartered, and supported by the Zamindars unless when they chose to provide for themselves by robbery and pillage Thus protected, there apprehension became impracticable—M'Gregor's Sikhs chap. VIII.

† He (Zakaria Khan) sent detachments of troops to guard the high ways and protect travellers from predatory incursions

আবার সংযতভাবে বাস করিতে লাগিল। পঞ্জাবে শিখদস্যুতা একরূপ লোপ পাইল।

এই সময় দিল্লীর বড়ই দুরবস্থা। সে কাহিনী অন্যত্র বর্ণিত হইবে। দিল্লীরাজের এরূপ দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া জকারিয়া খাঁ পঞ্জাবে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য চালনা করেন। * বর্ত্তমান লাহোরের দেড়ক্রোশ দূরে বেগমপুর নামক স্থানে তিনি একটি প্রকাণ্ড রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নির্লিপ্ত ভাবে মোগলের পতন ও মহারাষ্ট্রের উত্থান দেখিতে লাগিলেন।

জকারিয়া খাঁর রাজত্বকালে নাদীরশাহের ভারতাক্রমণ ঘটে। এই সময় শিখেরা আবার জাগিয়া উঠে। তাহারা নাদির শাহের রসদ ও পলাতক দেশবাসীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। জকারিয়া খাঁ আর তাহাদের দমন করিতে পারিলেন না, তাহারা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে কথা পরে আলোচনা করা যাইবে। সম্প্রতি নাদির শাহের ভারতাক্রমণ ব্যাপার আলোচনা করা যাউক।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

of the Sikhs. Munificent rewards were offered for the arrest of notorious Sikh robbers and plunderers, and they were daily brought in chains and executed in the streets of Lahore—Latif's. Histry of the panjab p. 193.

* Ib id.

নলডাঙ্গার রাজবংশ।

—:*:—

যশোহর জেলার জমীদার শ্রেণীর মধ্যে নলডাঙ্গার রাজবংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিঞ্চিদধিক ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলায় ভাবরাসুবা নামক স্থানে হলধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। হলধর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে বহুসম্মানিত আখণ্ডল ভট্টাচার্য্যবংশসম্ভূত। দান, ধ্যান, ক্রিয়াকর্ম্ম, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বসমাজে নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হলধরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য। বিষ্ণুদাস যোগবলে অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। কথিত আছে, তিনি একাদিক্রমে সহস্রদিবস ধরিয়া কোন এক কঠোর ব্রত পালন করায় সমসাময়িক লোকে তাঁহাকে সাধারণতঃ 'বিষ্ণুদাস হাজরা' নামে অভিহিত করিত। বিষ্ণুদাস পরিণত বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে নলডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী ক্ষত্রসুনির জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। ক্ষত্রসুনির বর্ত্তমান নাম হাজরাহাটী *। এই জঙ্গলে লোকালয় হইতে অনেকদূরে থাকায় নির্জ্জন তপস্যার অনুকূল মনে করিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করতঃ বিষ্ণুদাস এখানে বাস করিতে লাগিলেন।

তখন দেশে মোগলশাসন বদ্ধমূল হইয়াছিল। বাঙ্গলার তদানীন্তন মোগল-প্রতিনিধি নবাব কার্য্যব্যপদেশে ঢাকায় গিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে ফিরিবার সময় নৌকাযোগে নদীপথে ক্ষত্রসুনির জঙ্গল পর্য্যন্ত

* স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, যোগী বিষ্ণুদাস হাজরার নাম হইতেই ক্ষত্রসুনীর নাম 'হাজরাহাটী' হইয়াছে।

লেখক।

আসিতে না আসিতেই তাঁহার খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। সঙ্গে অনেক লোকজন—নিকটে জনপদ বা হাটবাজার কিছুই ছিল না; সুতরাং খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নবাব বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সঙ্গীয় লোকদের পরামর্শে কয়েকজন লোক খাদ্যদ্রব্যের অনুসন্ধানে প্রেরিত হইল। তাহারা ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে যোগী বিষ্ণুদাসের সাক্ষাৎলাভ করিল। লোকজনের নিকট, নবাবের খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যোগী আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। যোগীর সাক্ষাৎ পাইয়া নবাবের লোকজনের মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু আশ্রমের সামান্য পর্ণকুটীর দেখিয়া তাহাদের আর সে আশা রহিল না। যোগী তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া যোগবলে তাহাদের প্রত্যেককেই ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য প্রদানে পরিতৃপ্ত করিলেন। নবাব ও সঙ্গীয় অন্যান্য লোকজনের জন্যও প্রচুর খাদ্য প্রেরিত হইল। বিপন্মুক্ত কৃতজ্ঞ নবাব প্রত্যুপকার চিহ্নস্বরূপ নিকটস্থ পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়া যোগীকে সম্মানিত করিলেন—ইহাই নলডাঙ্গার রাজবংশের সর্ব্বপ্রথম ভূমিসম্পত্তি।

বিষ্ণুদাস বিষয় বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত ভাবরাসুবা হইতে আসিয়া পিতার আশ্রম নিকটস্থ নলডাঙ্গায় বাসস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নবাবদত্ত পঞ্চগ্রাম শাসন সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত অসীম সাহসী ও অসাধারণ বীর ছিলেন। ছোটই হউন, বড়ই হউন কোন দেশের কোন ভূস্বামীই শুধু নিজের সম্পত্তিটুকু লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না—সুবিধা পাইলেই তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সম্পত্তি দখল করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াস পান। পঞ্চগ্রামের অধিপতি শ্রীমন্ত নিজের পাঁচখানি গ্রাম লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না—তিনি সর্ব্বদাই নিকটস্থ অন্যভূস্বামীর অধিকৃত সম্পত্তির উপর লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিলেন।

এই সময় কোটচাঁদপুরের নিকটস্থ স্বরূপপুরে একঘর আফগান

জমীদার আধিপত্য করিতেছিলেন—সমগ্র মামুদশাহী পরগণা তাঁহারই শাসনাধীন ছিল। শ্রীমন্তের দৃষ্টি এই দিকেই পড়িল। শ্রীমন্ত যে একজন অসীমসাহসী যোদ্ধা ছিলেন একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার বীরপ্রতাপের নিকট আফগান জমীদারগণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শ্রীমন্ত তাঁহাদিগের অধিকৃত ভূভাগ অধিকার করিলেন। আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে শ্রীমন্ত যে অসীম বীরত্বপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি 'রণবীর খাঁ' এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। 'দেবরায়' উপাধিও সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্তই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীমন্তের পুত্রের নাম গোপীনাথ দেবরায়। গোপীনাথ ধার্ম্মিক নিরীহ ও জনপ্রিয় ছিলেন। ইনি অনেকগুলি দেবালয় নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর ও অনেক সাধু ফকির পীরোত্তর পাইয়াছেন। গোপীনাথের পুত্র চণ্ডীচরণ দেবরায় তদানীন্তন বাঙ্গালার নবাবের দরবার হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন।

রাজা চণ্ডীচরণ দেবরায়ের পুত্র রাজা শূরনারায়ণের উদয়-নারায়ণ, রামদেব, ঘনশ্যাম, নারায়ণ, রাজারাম ও রামকৃষ্ণ এই ছয় পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন। শূরনারায়ণের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ উদয়-নারায়ণ রাজা হয়েন। উদয় নারায়ণ নিরীহ, কিন্তু রামদেব অতি কৌশলী ও চতুর ছিলেন। উদয় নারায়ণ রাজা হইলে রামদেবের প্ররোচনায় তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ সম্পত্তির অংশ দাবী করিয়া বসিলেন। ইহাতে এক গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। ইহার ফল যাহা হয়, তাহাই হইল। রাজভ্রাতাদের গৃহবিচ্ছেদের সুবিধা পাইয়া নান্দাইলের বৈশ্য জমীদার শচীপতি মজুমদার মামুদশাহী পরগণার কতক অংশ দখল করিয়া লইয়া তাহা স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। নানা বিশৃঙ্খলতায় প্রজার নিকট হইতে কর আদায় হইত না কাজেই

নবাবের রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। তখনকার দিনে যে জমীদারের রাজস্ব বাকী পড়িত তিনি নবাব দরবারে বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। উদয় নারায়ণই নলডাঙ্গার রাজা ছিলেন, সুতরাং রাজস্ব বাকী পড়ায় তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য নবাব দরবার হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। ভ্রাতৃ-প্রভুত্ব-ঈর্ষ্যা-কাতর কৌশলী রামদেব নবাব সৈন্যের সহিত গোপনে মিলিত হইয়া উদয়নারায়ণের ধ্বংসসাধনে মনোনিবেশ করিলেন—অবশেষে :তাঁহারই চক্রান্তে হতভাগ্য উদয়নারায়ণ নবাবসৈন্য-হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন।

উদয়নারায়ণ নিহত হইলে চতুর রামদেব নবাব দরবারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গকে মুক্তহস্তে উৎকোচ প্রদান করিয়া অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করতঃ ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে জমীদারী অধিকার করিয়া বসিলেন। জমীদারী হাতে পাইয়া রামদেব প্রথমেই নন্দাইলের শচীপতিকে দমন করিতে অভিলাষী হয়েন। বঙ্গের সুসন্তান রাজা সীতারাম রায় এই সময় মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজতক্তে সমাসীন। শচীপতি সীতারামের আশ্রিত ও অনুগৃহীত ছিলেন, সুতরাং শচীপতিকে দমন করিতে গিয়া রামদেব প্রকৃতপক্ষে সীতারামের সহিতই বিবাদ বাধাইয়া ফেলিলেন। সীতারামের তখন অখণ্ড প্রতাপ তাঁহার সহিত সংঘর্ষে রামদেবই পরাজিত হইলেন এবং অবশেষে মামুদশাহী পরগণার কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন ; কিন্তু সন্ধি করিলে কি হইবে, তাঁহাদের মধ্যে মনের মিল হয় নাই, তাঁহারা উভয়ে উভয়ের পতনের জন্যই আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতৃহত্যা সাধন করিয়া রাজ্যলাভ করিলেও শেষ বয়সে রামদেব অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ পূর্ব্বকৃত পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। ইনিই মাগুরা উপবিভাগের অন্তর্গত স্বীয় শাসনাধীন শৈলকুপায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ তাহাতে নারায়ণের অন্যতম মূর্ত্তি 'রামগোপাল' বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ভগবৎ ভক্তির পরিচয় দিয়া

গিয়াছেন। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে রাজা রামদেব মানবলীলা সংবরণ করেন।

রামদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রঘুদেব রাজা হয়েন। ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন নবাব সুজাউদ্দীন খাঁ কোন সরকারি কার্য্যের জন্য রাজা রঘুদেবকে মুর্শিদাবাদ দরবারে উপস্থিত হইবার আদেশ দেন কিন্তু নিতান্ত গ্রহবৈগুণ্য বশতঃই রঘুদেব নির্দ্দিষ্ট সময় নবাবদরবারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাই নবাব সুজাউদ্দীন কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই আদেশ অমান্য জনিত অপরাধে নিরপরাধ রঘুদেবের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া নাটোররাজ রামকান্তকে অর্পণ করিলেন। বকাউল্লা নামক একজন মুসলমান নলডাঙ্গার রাজার মোক্তাররূপে মুর্শিদাবাদ দরবারে থাকিতেন। রাজার রাজ্য গেল, সঙ্গে সঙ্গে মোক্তার বকাউল্লাও স্বীয় পদ হইতে অপসৃত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মোক্তার বকাউল্লা মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে অবস্থিতি করিতেন; কার্য্য ব্যপদেশে নবাব সরকারের বড় বড় কর্ম্মচারি ও আমীর ওমরাহ প্রভৃতির সহিত তাহার বিশেষ জানাশুনা হইয়াছিল। এই সৌহার্দ্দবলেই তিনি নাটোররাজের নবপ্রাপ্ত জমিদারী মামুদশাহী পরগণার দেওয়ানী পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বকাউল্লা এখন ভিন্ন রাজার কর্ম্মচারি হইলেও রাজা রঘুদেবের নিমকের গুণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই তিনি নবাব সরকারের কর্ম্মচারিবর্গের নিকট বিত্তশূন্য নলডাঙ্গা রাজার বর্ত্তমান দুরবস্থার কাহিনী বর্ণন করিয়া তাহাদের করুণা ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই সময়ে বাঙ্গালার নবাবী পদ লইয়া বড়ই বিপ্লব বাধিয়া উঠিয়াছিল। নবাব সরফরাজ খাঁর ব্যবহারে রাজকর্ম্মচারি ও প্রজা সাধারণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন; সময় ও সুযোগ পাইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ বাসনার লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ্ গ্রাস করিতে ধাবিত হইলেন। দুর্ব্বল সরফরাজ খাঁর হস্ত হইতে রাজদণ্ড খসিয়া পড়িল—১৭৪০ খৃষ্টাব্দে

আলিবর্দ্দী বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। সময় বুঝিয়া বকাউল্লা নবাব দরবারে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বস্বামীর বিত্তপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। নূতন নবাব আলিবর্দ্দী প্রজাসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ ও মনস্তুষ্টি সাধন জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন, সুতরাং বকাউল্লার প্রার্থনা উপেক্ষিত হয় নাই। নবাব আলিবর্দ্দী নাটোররাজকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া মামুদশাহী পরগণা নলডাঙ্গার রাজাকে প্রত্যর্পণ করিলে, ব্রাহ্মণ রাজা রঘুদেব দুই হাত তুলিয়া ভগবান সমীপে নবাবের মঙ্গল কামনা করিলেন দেশে তাঁহার জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

কৃতজ্ঞ রঘুদেব প্রভুভক্ত বকাউল্লাকে নিজ দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিয়া তৎপুত্র গরিবউল্লার নামে ডিহি সাতগাছি নামক বার্ষিক ১৬০০০ সহস্র মুদ্রা আয়ের এক জায়গীর প্রদানে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। *

রাজা রঘুদেবের পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদেবের ঔরসপুত্র মহেন্দ্র শঙ্কর ও রামশঙ্কর প্রত্যেকেই জমীদারীর দুই পঞ্চমাংশ ও দত্তকপুত্র গোবিন্দ-শঙ্কর এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্ত হয়েন। গোবিন্দশঙ্করই প্রথম ভ্রাতাদিগের সহিত পৃথক হইয়া যান। যাহাকে লোকে ‘তে আনি রাজা’ বলিত।

রাজা গোবিন্দশঙ্কর অমিতব্যয়ী ছিলেন। নিজাংশের জমিদারীর আয় হইতে তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলন হইত না বলিয়া গরীবউল্লা চৌধুরী নামক একজন ধনীমুসলমানের নিকট তিনি একটী তালুক বিক্রয় করেন। কিন্তু গরিবউল্লা খরিদা তালুক দখল করিতে আসিলেই তিনি রূপনারায়ণ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সহিত যোগ দিয়া তাহাতে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রূপনারায়ণের নিকট গোবিন্দশঙ্কর অনেক টাকার ঋণী ছিলেন। এখন গরীবউল্লাকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে নিজের সমস্ত

* এই বিষয়ক সম্যক বিবরণ “পল্লীচিত্রে” প্রকাশিত আমাদের লিখিত “মুরহাদির পুরীর ঐতিহাসিক তত্ব” শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

লেখক।

জমিদারীর সহিত তাঁহার পুত্রের নামীয় তালুকখানাও আবদ্ধ রাখিয়া ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বের তারিখ দিয়া রূপনারায়ণের পিতা বারাণসী ঘোষের নামে এক খত লিখিয়া দিলেন। রূপনারায়ণের সহিত কথা থাকে যে, তিনি কখনও এই বন্ধকী সম্পত্তির জন্য নালিশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু রূপ-নারায়ণ সে কথা রাখেন নাই। তিনি বন্ধকী খতের জন্য নালিশ করিয়া সম্পত্তি নিলাম করিলে পীতাম্বর বসু নামক তাঁহারই জনৈক আত্মীয় এই সম্পত্তি খরিদ করেন। পীতাম্বর আবার তাহা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিলেন। এইরূপে গরীবউল্লাকে ঠকাইতে গিয়া রাজা গোবিন্দশঙ্কর নিজেই ঠকিয়া গেলেন। তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কেবলমাত্র তাঁহার বৃত্তির মহাল ও দেবোত্তর সম্পত্তি-টুকু অবশিষ্ট রহিল। গোবিন্দশঙ্করের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার আশায় বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

রাজা গোবিন্দশঙ্কর পৃথক হইয়া গেলে মহেন্দ্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর কিছুদিন পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী ছিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে বাঙ্গলায় লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রবর্ত্তিত দশশালা বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। এই বন্দোবস্তের ফলে বাঙ্গলার জমীদার শ্রেণী ভূমি সম্পত্তির উপর কায়েমী স্বত্ব লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সদর জমা বৃদ্ধি হওয়ায় নিয়মিত সময় লাটের টাকা দাখিল করিতে না পারায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পক্ষে জমীদারী রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। নিজ সম্পত্তির আদায় তহশীল নিজের হাতে লইলে পৃথক ভাবে নিজ নিজ অংশের সদর খাজনা দাখিল করিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া রাজা রামশঙ্কর সম্পত্তি বিভাগ জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু মহেন্দ্র শঙ্কর ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করায় ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে রামশঙ্কর বাটোয়ারার জন্য পুনঃ প্রার্থনা করিলে যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট এবার তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর

করিয়া বাটোয়ারার হুকুম দিলেন। তাহাদের সম্পত্তি সমান দুই অংশে বিভক্ত হইল। এই বাটোয়ারার গোলযোগে জমীদারীর সদর খাজনা বাকী পড়িয়াছিল, সুতরাং বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই তাঁহাদের উভয়ের সম্পত্তি ক্রোক্ হইল। জমীদারী রক্ষা করিবার অভিপ্রায় রাজা মহেন্দ্র শঙ্কর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার আনন্দ শঙ্করকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—যথাসময়ে মহেন্দ্র শঙ্করের অংশ সেরিফ্ সেলে বিক্রয় হইয়া গেল। রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি উহা ক্রয় করিলেন। মহেন্দ্র শঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ পিতৃ-সম্পত্তিপ্রাপ্তিজন্য ১৮০৯ খৃঃ অব্দে রাধামোহনের নামে এক মামলা আনয়ন করেন—আদালতের বিচারে কুমার বাহাদুরগণ সম্পত্তির ।৶০ সাত আনা ও রাধামোহন ॥৴০ নয় আনা অংশ পাইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ।৶০ আনা অংশও তাঁহারা অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। দেনার দায়ে ১৮১৪ খৃঃ অব্দে আবার উহা বিক্রয় হইয়া গেল। এবার নড়াইলের বাবুরা উহা খরিদ করিলেন।

রামশঙ্কর ও মহেন্দ্র শঙ্করের জমীদারী একই সময়ে নিলামে উঠিয়াছিল। মহেন্দ্র শঙ্করের সম্পত্তির পরিণাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাজা রামশঙ্কর অতিকষ্টে খাজনা পরিশোধ করিয়া দিয়া এ যাত্রার মত নিলামের দায় হইতে উদ্ধার হইলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে আবার জমিদারীর খাজনা বাকী পড়িল; এবারও রাজা খাজনা মিটাইয়া দিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার পর বৎসর ১৮০০ খৃঃ অব্দে দেশে জলপ্লাবন হওয়ায় প্রজামহলে হাহাকার পড়িয়া গেল—বহুচেষ্টায়ও রাজা লাটের কিস্তির টাকা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফলে ১৮০১ খৃঃ অব্দে তিনি ২৫০০০ হাজার টাকা বকেয়া খাজনার দায়ী হইলেন। যশোহরের তৎকালীন কালেক্টর একজন প্রকৃত হৃদয়বান রাজপুরুষ ছিলেন। নলডাঙ্গার রাজবংশের অন্য দুইটী শাখা সম্পত্তি হারাইয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন

এখন রামশঙ্করকেও বিপদাপন্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করতঃ রাজা রামশঙ্করের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বোর্ডকে এক পত্র লিখিলেন। সহৃদয় কালেক্টর সাহেবের অনুরোধে বোর্ড রাজার বাকী খাজনার মধ্যে ১৫০০ হাজার টাকা মাপ করিলেন। রাজা কোন প্রকারে বক্রী ১০০০০ হাজার টাকা দাখিল করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে আবার একবার খাজনা বাকী পড়িয়াছিল। সেবারও কালেক্টর সাহেব মধ্যে পড়িয়া জমীদারী রক্ষা করিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামশঙ্কর দেবরায়ের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র কুমার শশিভূষণের কোন অভিভাবক না থাকায় নলডাঙ্গার জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে আইসে। এই সময় হইতে জমিদারীর প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয়। নাবালক শশিভূষণ সাবালক হইয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্ত হইতে জমিদারী নিজ হস্তে লইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাহা শাসনসংরক্ষণ করিতে থাকেন।

রাজা শশিভূষণের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই, তাই তিনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন; এই দত্তক পুত্রের নাম ইন্দুভূষণ। ইন্দুভূষণও নাবালক ছিলেন বলিয়া সম্পত্তি আবার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে যায়। ইন্দুভূষণ একজন বিচক্ষণ ও উদারহৃদয় ভূম্যধিকারী ছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ভারতে যে ভীষণ সিপাহীবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। রাজভক্ত ইন্দুভূষণ তখন বিপন্ন ইংরেজ রাজকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন— বিপন্মুক্ত গভর্ণমেণ্ট পুরস্কারস্বরূপ ইন্দুভূষণকে ‘রাজা’ উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত ও অভিনন্দিত করেন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে রাজা ইন্দুভূষণ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

রাজা ইন্দুভূষণেরও কোন ঔরসপুত্র ছিল না—তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ইন্দুভূষণের দত্তকপুত্র রাজা প্রমথভূষণ দেবরায়ই নলডাঙ্গার বর্তমান অধীশ্বর। প্রমথভূষণ সুশিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী। উদার

হৃদয় সমাজ সংস্কারক বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত নিয়মে তিনি একবার স্বসমাজে বাল-বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সামাজিকগণের সহানুভূতি ও সাহায্য না পাওয়ায় রাজা বাহাদুর তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

গত তিন বৎসর ধরিয়া দেশীয় কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা ও উন্নতিকল্পে ভারতব্যাপী যে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে আমরা তাহাতেও রাজা বাহাদুরকে অগ্রণী দেখিতে পাই। তিনি তাঁহারই অন্যতম বন্ধু কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কুষ্টিয়ায় সূতার কল স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

রাজা বাহাদুর একজন প্রসিদ্ধ শিকারী। আবার শিকারী প্রমথভূষণই খুলনা দৌলতপুর কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি। আজকালকার দিনে জমীদার শ্রেণীর মধ্যে একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ বিরল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, রাজা প্রথমভূষণ সুশাসনগুণে প্রকৃতিরঞ্জন করিয়া 'রাজা' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হউন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

প্রেমের জয়।

গভীর রাত্রি, চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বর্ষার মেঘ অন্ধকার-রাশিকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। নৈশ পবন থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিতেছিল, মাঝে মাঝে মেঘবক্ষে বিদ্যুল্লেখা চমকিয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছিল। এই সময়ে রাজমহলের নিম্নস্থ গঙ্গাবক্ষে কয়েকখানি তরণী ভাসিতে ভাসিতে পরপারে যাইতেছিল। ক্রমে বাতাস প্রবল হইয়া নদী-হৃদয়ে তুফান উঠাইল। মেঘমালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে হইতে ধারাকারে পড়িতে লাগিল। বিদ্যুৎ বজ্রে পরিণত হইয়া সহস্র কামানের শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। বজ্র, বৃষ্টি, বাতাস তিনে মিলিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রলয়ের সূচনা করিল, অন্ধকার তাহাদের সহায় হইয়া বিভীষিকার সঞ্চার করিতে লাগিল। তরণী কয়েকখানি সেই তুফান অতিক্রম করিয়া কোন-রূপে পরপারে আসিয়া লাগিল। আরোহিগণ তীরভূমি দেখিয়া যেন জীবন ফিরাইয়া পাইলেন।

তরণী তীরে লাগিল বটে, কিন্তু বাতাস ও বৃষ্টি একেবারে থামিল না। তাহাদের বেগ কিছু মন্দীভূত হইলে আরোহিগণের কেহ শিবিকায়, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ হস্তিপৃষ্ঠে, কেহ বা গো-শকটে আরোহণ করিয়া কোনরূপে টাঁড়াদুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনসংবাদ পাইবামাত্র দুর্গরক্ষকগণ দ্বার খুলিয়া দিল, ঝন্ ঝন্ শব্দে দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। আরোহিগণ দ্রুতবেগে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আর্দ্রবস্ত্রে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হন। নববর্ষা সকলকেই কিছু না কিছু পরিমাণে সিক্ত করিয়াছিল, আরোহিগণ কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র

লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহারা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আবার ঝন্ ঝন্ শব্দে দুর্গের দ্বার পড়িয়া গেল।

এই আরোহিগণের পরিচয় জানিবার জন্য সম্ভবতঃ সকলের কৌতূহল হইয়া থাকিবে। আমরা এক্ষণেই তাঁহাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি করিয়া দিতেছি।

মণিমাণিক্যখচিত ময়ূরাসনের ঔজ্জ্বল্যে বিমোহিত হইয়া সাজাহান বাদসাহের পুত্রগণের মধ্যে মহাসমরাভিনয় আরম্ভ হয়; অবশেষে আরঙ্গজেব জয়ী হইয়া ময়ূরাসন লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ দারার নিপাতসাধন করিয়া আরঙ্গজেব মধ্যম ভ্রাতা সুজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এলাহাবাদের নিকট কজওয়া নামক স্থানে সুজাকে পরাজিত করিয়া আরঙ্গজেবের সৈন্য তাঁহাকে বাঙ্গালাভিমুখে বিতাড়িত করিয়া দেয়। সুজা সেই সময়ে বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। তিনি রাজধানী রাজমহলে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। আরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদ ও সেনাপতি মীর জুম্লার অধীন বাদসাহী সৈন্য দুই দিক্ হইতে রাজমহল আক্রমণ করিয়া বসিল, তাহাদিগের গোলাবৃষ্টিতে রাজমহলের প্রাচীর ভগ্ন ও সমস্ত নগর কম্পিত হইতে লাগিল। সুজা রাজধানী রক্ষা করিতে পারিলেন না, কাজেই পরিবারবর্গ ও ধন সম্পত্তি লইয়া অন্ধকারময় রাত্রিতে গঙ্গাপার হইলেন এবং টাঁড়ায় গিয়া আশ্রয় লইলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে সেই ঘটনারই উল্লেখ করিতেছিলাম।

টাঁড়ার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সা সুজা, তাঁহার বেগম পিয়ারী বানু ও আর আর সকলে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। পিয়ারী বানুর সৌন্দর্য্যের তুলনা তৎকালে হিন্দুস্থানে ছিল না, তাঁহার বুদ্ধিও অতুলনীয় ছিল। শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া সুজা ও বানু আপনাদের ভাগ্যের কথা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"পিয়ারী, সমস্ত আশা ভরসা ত একবারেই অতল জলে ডুবিয়া গেল, এক্ষণে উপায় কি?"

"উপায় ত কিছুই দেখিতেছি না।"

"ভাগ্যে আরও যে কি আছে কেমন করিয়া বলিব? তক্তা তাউসের আশা * ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন বুঝি বাঙ্গলার মসনদও যায়।"

"রাজমহল গিয়াছে বলিয়া কি আমাদিগকে সমস্ত বাঙ্গলার আশা ছাড়িতে হইবে?"

"অবশ্য বাঙ্গলার আশা এখনও একেবারে ছাড়ি নাই বটে, কিন্তু তাহা রক্ষার উপায় কি?"

"তা বটে, বিশেষ উপায় ত দেখিতেছি না, কিন্তু আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে কি হয় না?"

"কি চেষ্টা করিব? সৈন্যসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আরঙ্গজেব এখন বাদসাহ, সে ইচ্ছা করিলে পঙ্গপালের দ্বারা বাঙ্গলা ছাইয়া ফেলিতে পারে। মহম্মদ ও মীর জুম্লার সহিত যে সৈন্য আসিয়াছে তাহারই বেগ রোধ করিতে অনেক সৈন্যের প্রয়োজন।"

"আচ্ছা তাহারা কি গঙ্গাপার হইয়া আমাদের এখানেও আসিবে?"

"বলিতে পারি না, তবে শীঘ্র সম্ভব নয়।"

"কেন?"

"আজ হইতে বর্ষা পড়িল, নদীর জল দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, বর্ষার মধ্যে তাহারা বোধ হয় নদী পার হইতে পারিবে না।"

"তাহা হইলে ত আমরা ইহার মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারি।"

"চেষ্টা করিলে পারা যাইতে পারে।"

"চেষ্টা হইবে না কেন?"

"হইবে বৈ কি, চেষ্টা করিতেই হইবে। প্রথমে ফিরিঙ্গীদের সাহায্য লইতে হইবে। তাহাদের গোলা ব্যতীত মীরজুম্লা বা মহম্মদকে হটান যাইবে না।"

* ময়ূরাসন।

"তবে তাহারই ব্যবস্থা হউক।"

"তাহাই হইবে পিয়ারী, কিন্তু আর যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার ত কিছুই উপায় দেখি নাই।"

"কিসের কথা বলিতেছ?"

"মহম্মদ ও আয়েসার মিলনের আশা কি একেবারে ছাড়িয়া দিব?"

"বালাই, তাই বা ছাড়িব কেন?"

সুজা হাস্য করিয়া উঠিলেন, ও পরে বলিতে লাগিলেন,—

"তোমার কথা শুনিয়া হাসি পাইতেছে। এদিকে আমরা মহম্মদের সহিত লড়াই করিব, আবার তাহার সহিত আয়েসার মিলনও ঘটাইব?"

পিয়ারী বানু সুজার দিকে ঈষৎ কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন,—

"তুমি পুরুষ মানুষ তাহার কি বুঝিবে?"

"আচ্ছা ও সব তোমাদের একচেটিয়া থাকুক, তবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে ত হইবে?"

"যখন সময় হইবে অবশ্যই বুঝাইয়া দিব।"

"সময় কি নূতন করিয়া আসিবে? এই ত ঠিক সময়, মহম্মদকে কি আর কখনও নিকটে পাওয়া যাইবে?"

"তাহার জন্য কোনই চিন্তা নাই, আমি তাহার উপায় করিব।"

"কি উপায় করিবে পিয়ারী?"

"পরে জানিতে পারিবে।"

"এখন কি জানিবার কোন বাধা আছে?"

"না, এখন জানিয়া কাজ নাই, তবে একটা কথা জানিয়া রাখ, জগতে প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে। যিনি যত বড় বীর হউন না কেন, প্রেমের নিকট তাঁহাকে মাথা নুয়াইতে হইবেই হইবে।"

"এ প্রেম কোন্ দিকের?"

"প্রেম এক দিকের হয় না; দুই দিক্ হইতে স্রোত না বহিলে তাহা টিকে না।"

"তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মহম্মদ ত একবার বিবাহ করেছে।"

"তা করুক, তাতে কিছু আসিয়া যাইবে না, প্রেমের জয় হইবেই হইবে।"

"কি জানি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ?"

"তোমার আজিও ভাল করিয়া প্রেমশিক্ষা হয় নাই, কাজেই বুঝিতে পারিতেছ না।"

"পিয়ারী বানুর কাছে থাকিয়া আজিও কি তাহা শিখিতে পারিলাম না ?"

"কাছে থাকিলে অবশ্যই শিখিতে পারিবে, কিন্তু খোদা থাকিতে দেন কৈ ?"

"সে কথা সত্য, ভাগ্য যেন একদণ্ড স্থির থাকিতে দিতেছে না। সে যাহা হউক, তুমি আয়েসার সহিত কিরূপে মহম্মদের মিলন ঘটাইবে, আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমি ত বলিলাম, পরে বুঝিবে ; দেখিবে, প্রেমের জয় হইবেই হইবে।"

"আচ্ছা তাহাই হউক, প্রেমেরই জয় হউক। এস, আজ তবে আমরা একটু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করি।"

এই বলিয়া তাঁহারা সে দিনের মত বিশ্রামের ইচ্ছা করিলেন।

আমরা এইখানে শেষোক্ত কথোপকথনের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। সুজার কন্যা আয়েসার সহিত আরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদের অনেক দিন হইতে বিবাহের কথা হইতেছিল। আয়েসা রূপে গুণে অনুপমা ছিলেন। যখন তাঁহারা আগরায় মিলিত হইতেন, তখন পরস্পরে অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতেন। যদিও মহম্মদ গোলকুণ্ডাধিপের কন্যা রিজিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি আয়েসার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সমভাবে বিদ্যমান ছিল। আয়েসাও মহম্মদকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পিয়ারী বানু তাহা বিশেষরূপে জানিতেন, তাই তিনি সাহস-

সহকারে সুজার সহিত ঐরূপ কথা বলিতেছিলেন। যদিও আরঙ্গেব ও সুজার মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল, তথাপি তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মহম্মদ ও আয়েসার যেরূপ গাঢ় অনুরাগ, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদের মিলন ঘটিবে। তাই তিনি বলিতেছিলেন যে, প্রেমের জয় নিশ্চয়ই হইবে। পিয়ারী বানুর অনুমান যে মিথ্যা নহে, সকলে পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

২

বর্ষকাল, গঙ্গা দুকূল ছাপাইয়া চারিদিক্ ভাসাইয়া দিয়াছেন, যে দিকে তাকাও সেই দিকই জলময়, কলকল শব্দে অবিরত জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে, আকাশ হইতেও অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে। রাজমহলের নিম্নে গঙ্গা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া ভীতি জন্মাইতে লাগিলেন, নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে প্রবলবেগে জলস্রোত আসিয়া তাঁহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সুল্‌তান মহম্মদ ও মীরজুম্লা আপন আপন সৈন্য লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের শিবিরাদি সিক্ত হইয়া সৈন্যগণের বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিল, এই দারুণ বর্ষায় রসদেরও যার পর নাই অভাব ঘটিয়া উঠিল।

বর্ষা বাদসাহী সৈন্যের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সুজার যার পর নাই অনুকূল হইয়া উঠিল। বাদসাহী সৈন্যের গঙ্গা পার হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সুজা সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে সৈন্য আনিতে লাগিলেন। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ নদীবক্ষ বাহিয়া তাঁহার রণতরীসমূহ সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। সুজার উদারতায় মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ফিরিঙ্গীগণ তাঁহার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, সুজা তাহাদিগকে গোলন্দাজ সৈন্যদলে নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের হস্তে সুজার কামান বিশ্বধ্বংসকর গর্জ্জন করিয়া বাদসাহী সৈন্যদিগকে কাঁপাইয়া তুলিল।

বর্ষার বেগ কিছু প্রশমিত হইলে, সুজা মধ্যে মধ্যে কতকগুলি রণতরী লইয়া গঙ্গা পার হইতে থাকেন, এবং বিপক্ষ-শিবির লক্ষ্য করিয়া অবিরত

গোলাবর্ষণ আরম্ভ করেন। ফিরিঙ্গীর হস্তনিক্ষিপ্ত অব্যর্থ গোলা বাদসাহী সৈন্যশিবিরে পড়িয়া সকলকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। কোন কোন দিন নৈশ আক্রমণে সুজার সৈন্যগণ বাদসাহী সৈন্যগণের মনে বিভীষিকা জন্মাইতেছিল। অন্ধকারময়ী রজনীতে সহসা বজ্রসম্পাতের ন্যায় যখন সুজার কামাননিঃসৃত অগ্নিবর্ণ গোলা আসিয়া বাদসাহী শিবিরে পড়িতে লাগিল, তখন তাহারা জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন জীবন লইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বর্ষার বেগ প্রশমিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার শেষ হয় নাই। কাজেই মীরজুম্লা বা মহম্মদ আপনাদের সৈন্য লইয়া গঙ্গা পার হইতে বা সুজাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই, বিশেষতঃ তাঁহাদের রণতরীরও অভাব ছিল। কাজেই তাঁহারা নদীপারের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুজা সেই সুযোগে স্বীয় রণতরীসমূহের সাহায্যে রাজমহলে অবিরত গোলাবর্ষণ করিয়া বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যক্ষয়ে প্রবৃত্ত হন। ফিরিঙ্গীর গোলায় দিন দিন বাদসাহী সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকে।

সৈন্য-সংখ্যার হ্রাস দেখিয়া মীরজুম্লা ও মহম্মদ পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। মহম্মদ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সেনাপতি, সৈন্য রক্ষা ত কঠিন হইয়া উঠিল, এক্ষণে উপায় কি ?"

"বর্ষা শেষ না হইলে বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করাও কঠিন।"

"তাহা ত বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু এখন কি করা যায় ?"

"অবশ্য কোন উপায় করিতেই হইবে।"

"আর বিলম্ব করিলে আপনার ও আমার একটি মাত্রও প্রাণী বাঁচিবে না।"

"আমি পূর্ব্ব হইতেই তাহা চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু সুল্‌তান সুজা ইহার মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন কিরূপে ?"

"তিনি বাঙ্গালার সুবেদার, নিজের রাজ্যে পঁহুছিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।"

"দেখিতেছি ফিরিঙ্গীরা গোলা চালাইতেছে, ফিরিঙ্গীদিগকে তিনি কি করিয়া বাধ্য করিলেন? বুড়া বাদসাহ ত তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইবার হুকুম দিয়াছিলেন।"

"কিন্তু যাহারা বহুদিন হইতে একদেশে আছে, তাহাদিগকে কি সহজে তাড়ান যায়? ক্রমে ক্রমে আবার তাহারা দল বাঁধিয়াছে।"

"কিন্তু এই দুসমনদিগকে সুল্‌তান হাত করিল কিরূপে?"

"শুনিয়াছি তাহারা সুল্‌তানের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছিল, সেই জন্য তিনি আহ্বান করিবামাত্র তাহারা আসিয়া হাজির হইয়াছে।"

"এই দুসমনদিগকে দেশ হইতে আবার না তাড়াইলে বাঙ্গলা হাতে রাখা কঠিন হইবে।"

"সে বিষয় আপনি পরে চিন্তা করিবেন, এক্ষণে আপনাদের সৈন্যরক্ষার উপায় করুন।"

"সাজাদা, আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি পূর্ব্ব হইতে সে সমস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছি।"

"যদি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছেন, তবে অনর্থক সৈন্যক্ষয় হইতে দিতেছেন কেন?"

"আমি দেখিতেছিলাম যে, যদি বর্ষা কমিয়া যায় তাহা হইলে বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করা যায় কি না?"

"বর্ষা কমিলেও নদীর বেগ সহসা কমিবে না। সুল্‌তানের ন্যায় আমাদের রণতরী কৈ? গঙ্গা পার হইতে রণতরীরও প্রয়োজন হইবে।"

"বাদসাহ আরঙ্গজেবের সৈন্যের সাহায্যের জন্য কি রণতরীর অভাব হইবে আপনি মনে করেন?"

"না হইতে পারে, কিন্তু এক্ষণে ত সম্পূর্ণ অভাব দেখিতেছি।"

"আমি পূর্ব্ব হইতেই তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।"

"বাঙ্গলার রণতরী আপনি পাইবেন বলিয়া মনে হয় না, সুল্‌তান্ সুজা সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছেন।"

"করুন, কিন্তু বাদসাহী সৈন্যেরও তাহার অভাব ঘটিবে না।"

"তবে কি আপনি গঙ্গাপার হওয়ার অভিপ্রায় করিতেছেন?"

"না, যখন বর্ষা কমিল না, তখন আর এক্ষণে তাহার অভিপ্রায় নাই।"

"তবে সৈন্য রক্ষার কি উপায় স্থির করিয়াছেন?"

"আমি রাজমহল হইতে দূরে শিবির স্থাপন করিব। আপনি রাজমহলের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করুন। একজনের সৈন্য অনায়াসে রাজমহলে সুরক্ষিত ভাবে থাকিতে পারিবে, আপনার সৈন্যদিগেরই একটু ভাল আশ্রয়ের প্রয়োজন। আর আমাদের একজন রাজমহলে না থাকিলে রাজমহলও হাত ছাড়া হইবে।"

"এ যুক্তি মন্দ নহে, শীঘ্রই তাহার বন্দোবস্ত করুন।"

"শীঘ্র কি? আজি করিতেছি" বলিয়া মীরজুমলা তথা হইতে অপসৃত হইলেন, এবং নিজ সৈন্যদিগকে লইয়া রাজমহলের নদীতীর হইতে কিছু দূরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সুল্‌তান মহম্মদ রাজমহল দুর্গে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। গোলাবর্ষণ নিষ্প্রয়োজন দেখিয়া সুজার কামানও নীরব হইল।

একদিন দুইদিন করিয়া মহম্মদের দিন কাটিতে লাগিল। এতদিন তিনি যুদ্ধের উৎসাহে একরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে উৎসাহ-প্রকাশের অবসর না থাকায়, তাঁহার মনোমধ্যে অনেক বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইল। পূর্ব্বস্মৃতি অনেক দৃশ্য আনিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সর্ব্বাপেক্ষা আয়েসার কথা তাঁহার মনে অনুক্ষণ জাগিতে লাগিল। তিনি রিজিয়া সুন্দরীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শৈশব হইতে আয়েসার যে কমনীয় প্রতিমা হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে,

সুজাকে পরাজিত করিয়া আয়েসাকে লাভ করিবেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মহম্মদের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। আয়েসার প্রতি অনুরাগ তাঁহার বীর-হৃদয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিল, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় সমর-বাসনাকে পরাজয় করিয়া অবশেষে প্রেমেরই জয় হইল।

৩

টাঁড়াদুর্গের প্রাসাদমধ্যস্থ একটি সুরম্য ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া সাজাদী আয়েসা আপনার হৃদয়ে নানা তরঙ্গ তুলিতেছিলেন। নবযৌবনের প্রথম বিকাশে তাঁহার রূপসাগরে যেমন তরঙ্গ উঠিতেছিল, হৃদয়ও সেইরূপ ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। শৈশব হইতে তিনি যে এক সুখের চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহাতে মাঝে মাঝে ছায়া পড়িয়া যেন কিছু বিকৃত করিয়া তুলিতেছিল। মহম্মদের সহিত রিজিয়ার পরিণয় প্রথমে তাঁহার সেই চিত্রে ছায়াপাত করে, আরঙ্গজেবের সহিত সুজার বিবাদ তাহাকে গাঢ় করিয়া তুলে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে ছায়া সরিয়া যাইত ও আয়েসার সুখময় চিত্র আবার ফুটিয়া উঠিত। মহম্মদের রাজমহলে আগমন তাঁহার সেই চিত্রকে যেন একটু উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু নিরাশার ছায়া একেবারে অপসারিত হয় নাই।

নিরাশার ছায়া একেবারে অপসারিত হয় নাই বটে, কিন্তু আশার আলোক এবার যেন আয়েসার হৃদয়ে নানা খেলা খেলিতেছিল। তিনি মনে করিতেছিলেন, "বহুদিন পরে যদি আরাধ্য বস্তু নিকটে আসিয়াছে, তবে তাহাকে কি একবারও ধরিতে পারিব না? চেষ্টা করিলে অবশ্যই পারিব। এতদিন ধরিয়া হৃদয়ে যে ভালবাসার স্রোত রোধ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে পাষাণও বিদীর্ণ করিতে পারে, মহম্মদের হৃদয় কি তাহার অপেক্ষাও কঠিন হইবে? একদিন ত সে হৃদয় হইতেও ভালবাসার স্রোত বহিয়াছিল, তবে কি তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, না, রিজিয়ার প্রেম তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? যাহাই হউক না

কেন, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে।

এক কথা, মহম্মদ এক্ষণে পিতার বিপক্ষ। সত্য বটে, পিতৃব্যের সহিত পিতার বিবাদ, কিন্তু মহম্মদের সহিত আমাদের শত্রুতা ঘটিবে কেন? মহম্মদ তাঁহার পিতার আদেশে সৈন্য সামন্ত লইয়া পিতার বিরুদ্ধে আসিয়াছেন। ভাল, তিনি পিতার আদেশই পালন করুন, কিন্তু পিতা বা আমাদের সহিত তাঁহার শত্রুতা ঘটিবে কেন? আরঙ্গজেব এক্ষণে, বাদসাহ, মহম্মদ যুবরাজ, তিনি নূতন রাজ্য জয় করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-রাজ্য কি জয় করা যাইবে না? অবশ্যই যাইবে। তিনি বঙ্গরাজ্য জয়ের আশা লইয়া থাকুন, আমিও দেখি তাঁহার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিতে পারি কি না। দিগ্বিজয়ী সম্রাটের প্রতি প্রেমের অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনিও পরাজিত হন, জগতে প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে।"

এইরূপ নানা চিন্তার তরঙ্গে যখন আয়েসার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার সহচরী মোতিয়া সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। মোতিয়া আয়েসাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—

"কি গো, আজকাল ভাবনাটা এত বাড়াইয়া তুলিলে কেন?"

"বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা আপনিই বাড়িয়া যায়।"

"ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে কমান যায় না?"

"অবস্থা সেরূপ ইচ্ছা করিতে দেয় কৈ?"

"এমন কি অবস্থা ঘটিল যে, তাহাতে দিবারাত্রি চিন্তারই স্রোত বহাইবে?"

"মোতিয়া, তুই কি দিন দিন ছেলে মানুষ হইতেছিস্? আমাদের অবস্থা কি দেখিতে পাইতেছিস্ না?"

"আমি ত বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। সুলতান সুজা নয় বাদসাহই হইলেন না, বাঙ্গালা রাজ্য ত তাঁহার কেহ লয় নাই?"

"লয় নাই বটে, কিন্তু লইবার জন্য ত ত্রুটি হইতেছে না ?"

"কে লইবে, সাজাদা মহম্মদ ? আচ্ছা তাহা বুঝা যাইবে।"

"তুই কি বুঝিবি মোতিয়া ?"

"তিনি আমাদিগকে জয় করিবেন, কি আমরা তাঁহাকে জয় করিব, তাহাই বুঝা যাইবে ?"

"আমাদের আর জয়ের আশা কোথায় ? তাঁহারা রাজমহল দুর্গে আশ্রয় লওয়ায় আমাদের কামান নীরবে অবস্থিতি করিতেছে।"

"আমি কামান বন্দুক দিয়া জয় করিবার কথা বলিতেছি না ?"

আয়েসা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"তবে কি দিয়া জয় করিবি ?"

"আমাদের নিকট এমন এক অস্ত্র আছে, যাহাদ্বারা সাজাদাকে জয় করিয়া বাঁধিয়া আনিব।"

"সে কি অস্ত্র মোতিয়া ?"

"সে অস্ত্রের নাম সাজাদী আয়েসা।"

"মরণ আর কি !"

"মরণ নয় গো, মরণ নয়, দেখ সে অস্ত্র চালাইতে পারি কি না ?"

"আমাকে কি তোপের মধ্যে পুরিয়া চালাইবি না কি ?"

"বালাই, আমিত বলিয়াছি কামান বন্দুকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই ?"

"তবে কি আমাকে রাজমহলে ছুড়িয়া দিবি না কি ?"

"দিলামই বা, যদি সহজে সাজাদাকে জয় করা না যায়, তাহা হইলে অস্ত্র ত ছুড়িতেই হইবে।"

"সে কি মোতিয়া, আমাকে কি উপযাচিকা হইয়া সুলতানের নিকট যাইতে হইবে ?"

"গরব এখন রাখ, যেরূপে হউক সাজাদাকে জয় করিতেই হইবে। যদি প্রয়োজন হয় তোমাকে রাজমহলে যাইতেই হইবে। তবে ভীত হইও

না, আমরা প্রথমে তোমাকে পাঠাইব না, অস্ত্রচালনার পূর্ব্বে একবার সন্ধির প্রস্তাব করা যাইতেছে।”

“সে আবার কি?”

“জানত যুদ্ধের আগে দূত দিয়া পত্র পাঠাইতে হয়।”

“কে পত্র লিখিবে?”

“বলিতেছি” বলিয়া মোতিয়া পত্র লিখিবার সমস্ত উপকরণ লইয়া আসিল, পরে বলিল,—

“আমি যা বলি বেশ মনোযোগ দিয়ে শোন।”

“তোর মতলব কি?”

“মতলব কিছু না, তবে সাজাদী আয়েসার শ্রীহস্তের একটু লেখা চাহি।”

“তবে তুই আমাকেই লিখিতে বলিতেছিস্।”

“হাঁ গো হাঁ, তুমি লিখিবে কেন? তোমার ত সাজাদাকে দরকার নাই, আমিই নয় প্রেম-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব।”

“আ মর।”

“মরেই ত আছি, এখন বেশ ভাল করে একখানি পত্র লেখ।”

“মোতিয়া, সত্য সত্য ইহাতে কি কোন ফল হইবে?”

“দেখ সাজাদী, আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে, আমাদের অনেক দিনের সাধ একেবারেই নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তোমার হৃদয়েও নানা তরঙ্গ উঠিতেছে। আমি বেশ জানি তুমি যখন সাজাদাকে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছ, তখন তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পাণিদান করিবে না। পাখী যখন আমাদের নিকটে আসিয়াছে, আমরা একবার জাল ফেলিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিব না কেন?”

“কিন্তু ধরা কি যাইবে?”

“ধরিতেই হইবে, অন্ততঃ চেষ্টা ত করিতে হইবে।”

“কি জানি, কেমন করিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিব, আগে তাঁহার

যে ভাব ছিল, রিজিয়াসুন্দরীর প্রেমপাশ তাহার পরিবর্ত্তন করিয়াছে কি না কেমন করিয়া বুঝিব ? আবার বঙ্গরাজ্য জয়ের আশাই বা তাঁহার হৃদয়কে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব।”

“সাজাদী ওসকল আকাশপাতাল চিন্তা মনে আনিলে কোনই কাজ হইবে না। আমার বিশ্বাস তোমার হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ নিশ্চয়ই তাঁহাকে টানিয়া আনিবে।”

“তিনি এখন দিগ্বিজয়ী বীর, বীরের হৃদয় কি নারীর প্রেম অধিকার করিতে পারে ?

“যিনি যত বড় বীর হউন না কেন, প্রেমের নিকট সকলকে পরাজিত হইতে হইবে। জগতে প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে।”

“তা সত্য, জগতে প্রেমেরই জয় দেখা যায় বটে, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রেমের শক্তি কি সুলতানের ন্যায় বীরের হৃদয়কে টলাইতে পারিবে। বিশেষতঃ এখন তাহা রিজিয়ার অধিকারে।”

“আমি ওসব কিছু মানিনা। রিজিয়ার সহিত সাজাদার বিবাহ মাত্র হইয়াছে, তোমার ন্যায় তাঁহার হৃদয় প্রেমপূর্ণ তাহা কে বলিল ?”

“হউক না হউক, এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি ?”

“আমার অভিপ্রায় তুমি সাজাদার মনে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া ও তোমার বর্ত্তমান অবস্থা জানাইয়া একখানি মর্ম্মস্পর্শী পত্র লেখ। সেই পত্র পাঠাইয়া তাঁহার মনের ভাব কি, আগে দেখা যাউক, তার পর উপায় করা যাবে।”

“অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই, কি বলিয়া পত্র লিখিব তাই ভাবিতেছি ,”

“সেসব ভাবনা রাখিয়া দেও, এক্ষণে আমি যা বলি তাই কর।”

“পত্র কে লইয়া যাইবে ?”

“তার ব্যবস্থা আমি করিব।”

আচ্ছা তবে তোমারই কথা মানিয়া লইলাম।”

এই বলিয়া আয়েসা সুলতান মহম্মদকে পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র লেখা শেষ হইলে তিনি পত্র খানি মোতিয়ার হাতে দিলেন। মোতিয়া পড়িয়া বলিল,—

সুন্দর হইয়াছে, দেখি সাজাদাকে বাঁধিয়া আনিতে পারি কি না ?”

আয়েসা বলিলেন,—

“আর আমাকে কিছু বলিবে না ত ?”

“এখন নয়, প্রয়োজন হইলে পরে বলিব। আমি এখন আসি” বলিয়া মোতিয়া চলিয়া গেল। আয়েসা আবার চিন্তামগ্ন হইলেন।

মোতিয়া পত্র লইয়া পিয়ারী বানুর নিকট উপস্থিত হইল। পিয়ারী বানুই মোতিয়াকে আয়েসার নিকট হইতে পত্র আনিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া পিয়ারী বানুর দুঃখে ও আনন্দে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত হইল। তিনি মোতিয়াকে পুরুষের বেশে ঐ পত্র লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। মোতিয়া সম্মত হইয়া পুরুষবেশে রাজমহলাভিমুখে অগ্রসর হইল। সা সুজার বিশ্বস্ত কয়েকজন সৈনিক মাঝি-মাল্লার বেশে মোতিয়ার নৌকা বাহিয়া চলিল। পিয়ারী বানু সুজাকে সমস্ত জানাইলেন, শুনিয়া সুজা পিয়ারীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

প্রসন্নসলিলা গঙ্গার বক্ষে আপনার ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া রাজমহলের নব প্রাসাদ শোভা পাইতেছিল। দিল্লী ও আগরা যাঁহার শিল্পানুরাগের জন্য চির-অমর হইয়া রহিয়াছে, সেই সাহানসাহ সাজাহান বাদসাহের পুত্র হইয়া সুলতান সুজা যে সে অনুরাগের পরিচয় দিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? তাই তাঁহার গঠিত রাজমহলের নব প্রাসাদ অনেক মনোহর সৌধে বিভূষিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে দ্বিতীয় রাজমহলের সৃষ্টি করিতেছিল। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গঙ্গা যমুনা সেই সুরম্য প্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন তাহার শোভা আরও বাড়িয়া উঠিত। নদীর কল কল ধ্বনি প্রাসাদভিত্তিতে প্রতিহত হইয়া সুমধুর প্রতিধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া তুলিত।

কষ্টীপ্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দরস্তম্ভযুক্ত সুজার গঠিত সিং দালানে বসিয়া সুলতান মহম্মদ গঙ্গার শোভা দেখিতেছিলেন। বর্ষার মেঘকে অপসারিত করিয়া মাঝে মাঝে চন্দ্রদেব গঙ্গাবক্ষে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া দিতেছিলেন। উত্তালতরঙ্গাকুলা গঙ্গা যেন তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে-ছিলেন। মহম্মদের হৃদয়েও যেন সেইরূপ অভিনয় হইতেছিল। চিন্তা-তরঙ্গাকুলা তাঁহার হৃদয়-স্রোতস্বিনীতে মাঝে মাঝে নিরাশার মেঘ ভেদ করিয়া আয়েসার রূপ-জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছিল। গঙ্গার হৃদয়ে মেঘযুক্ত জ্যোৎস্নাপতনের সহিত নিজ হৃদয়ে আয়েসার মূর্ত্তিপ্রকাশ তুলনা করিয়া সুলতান মহম্মদ এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

যৎকালে সুলতান্ মহম্মদ রাজমহলের সিং দালানে বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে জনৈক প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সুলতান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"খবর কি ?"

"সেনাপতি মীরজুম্লার নিকট হইতে খবর লইয়া একটি বালক আসিয়াছে। সে খোদ সুলতানের সহিতই দেখা করিতে চাহে।"

"আচ্ছা, তাহাকে এইখানেই লইয়া আইস।"

"যো হুকুম" বলিয়া প্রহরী নিষ্ক্রান্ত হইল।

অল্পক্ষণ পরে সে একটি সুন্দর বালককে লইয়া সুলতানের নিকট উপস্থিত হইল। পাঠক এই বালককে চিনিতে পারিয়াছেন কি ? পিয়ারী বানুর উপদেশক্রমে মোতিয়াই এই বালকবেশে রাজমহলে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং আপনাকে মীরজুম্লার লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রীবেশ এমন করিয়া লুকাইয়াছিল যে, তাহাকে একটি সুন্দর বালক বলিয়াই বোধ হইতেছিল। কেহই তাহাকে রমণী বলিয়া বুঝিতে পারে নাই।

সুলতান মহম্মদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছ ?"

"সুলতান আমি নির্জ্জনে সে সংবাদ বলিতে চাহি।"

"প্রহরী তুমি এখান হইতে যাইতে পার।"

সুলতানের কথা শুনিয়া প্রহরী তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইল। মোতিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল,—

"সাজাদা যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া অভয় দেন, তবে আমি সমস্ত কথা বলি।"

"তুমি নির্ভয়ে বলিতে পার।"

"আমি সেনাপতি মীরজুম্লার নিকট হইতে আসি নাই।"

মহম্মদ চমকিত হইয়া কহিলেন,—

"তবে তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"আমি টাঁড়া হইতে আসিতেছি।"

"টাঁড়া হইতে আসিতেছ ? তবে তুমি মিথ্যা কথা বলিলে কেন?"

"পাছে আমার কার্য্যসিদ্ধি না হয়।"

"তোমার উদ্দেশ্য কি ? তোমাকে কি সুলতান সুজা পাঠাইয়াছেন ?"

"না সাজাদা।"

"তবে তুমি কাহার নিকট হইতে আসিতেছ ?"

"আমি সাজাদী আয়েসার নিকট হইতে আসিতেছি।"

মহম্মদ একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—

"সাজাদী আয়েসার নিকট হইতে ? তিনি কি তোমাকে এই খানেই পাঠাইয়াছেন ?"

"তিনিই আমাকে সাজাদার নিকটই পাঠাইয়াছেন।"

"আচ্ছা তাঁহার কি বক্তব্য আছে বলিতে পার!"

"তাঁহার বক্তব্য আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।"

"কৈ তাঁহার বক্তব্য ?"

"সাজাদার আদেশ হইলে এখনই তাহা দিতেছি।"

"তিনি কি কোন পত্র পাঠাইয়াছেন ?"

"সাজাদার অনুমান সত্য।"

"তবে বিলম্ব করিতেছ কেন সে পত্র আমাকে দিতে পার।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া মোতিয়া আপনার বস্ত্রমধ্য হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া সুল্‌তান মহম্মদের হাতে দিল। সেই সময়ে চন্দ্রালোকে চারি দিক হাসিয়া উঠিল। মহম্মদ কম্পিত হস্তে পত্রখানি লইয়া স্খলিত কণ্ঠে পড়িতে লাগিলেন,—

"প্রাণাধিক!

সেকালের কথা মনে পড়ে কি? সেই তুমি ও আমি যখন ছেলে খেলার সঙ্গে হৃদয়ে আশার ঘর বাঁধিতাম, তখন সে ঘর কত সুখের ছবিতে না ভরিয়া উঠিত! সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার সম্মুখে তক্ত তাউসের চিরোজ্জ্বল আলোক রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু অভাগিনী আয়েসার সম্মুখে নিবিড় আঁধার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আজ তুমি রিজিয়ার হৃদয়াসনে বসিয়াছ, কাল আবার তক্ত তাউস তোমাকে আলিঙ্গন করিবে, কিন্তু যে একখানি ক্ষুদ্র আসন বহুদিন হইতে তোমারই চরণ-স্পর্শের জন্য পুষ্পচন্দনে সজ্জিত হইতেছে, তাহাতে কি একবারও তোমার পদার্পণ হইবে না? না হইলে এ আসন দরিয়ায় ডুবিবে, কিন্তু আর কেহ ছুঁইতে পারিবে না। তুমি ভারতের ভাবী সম্রাট্, আমরা পথের ভিখারী। পিতার কি অপরাধ যে, তিনি তক্ত তাউসের আশা ছাড়িয়াও কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় কেবল দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইবেন? তিনি ত সব ছাড়িয়াছেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বাঙ্গলারাজ্যটিও কি আমাদের প্রতিপালনের জন্য পাইবেন না? অথবা তাঁহার ভাগ্যে জ্যেষ্ঠতাত দারা শেকোর ন্যায় পরিণাম লিখিত আছে? জানি না, আমাদের ভাগ্যে কি আছে? সাহান-

সাহ সাজাহান বাদসাহের পরিবারবর্গের এমন দশা ঘটিবে, তাহা কে জানিত? আজ কি না তাঁহার মধ্যম পুত্র সুলতান মহম্মদ সুজা সামান্য অপরাধীর ন্যায় দেশে দেশে আপনারে লুকাইয়া বেড়াইতেছেন? পথের ভিখারীর ন্যায় তাঁহার পরিবারবর্গ জীবিকার জন্য অশ্রুপাত করিতেছে। একবার তোমাকে আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি, আসিবে কি? একবার দেখিয়া যাও, কত কষ্টে আমাদের দিন যাইতেছে। সুলতান সুজা, পিয়ারী বানু ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের দশা দেখিবার জন্য একবার তোমার সময় হইবে কি? আর যে অভাগিনী আশৈশব তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার দশাও কি একবার দেখিবে না? না দেখিতে আইস, সে তোমার চরণতলে নিপতিত হইবে, তাহার পর তাহাকে রাজমহলের দরিয়ায় ডারিয়া দিও। ইতি—

অভাগিনী—

আয়েসা"

পত্র পাঠ করিতে করিতে মহম্মদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বোধ হয় দুই এক বিন্দু অশ্রু নীরবে তাঁহার গণ্ডস্থলও সিক্ত করিয়াছিল। মোতিয়া কহিল,—

"সাজাদা, কোন উত্তর পাইব কি?"

"পাইবে, একটু অপেক্ষা কর। তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"যাহা আপনার অভিপ্রায় হয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

"সত্য সত্যই কি আয়েসা এই পত্র পাঠাইয়াছেন?"

"সাজাদা, আমি সত্যই বলিতেছি, তিনি নিজ হস্তে পত্র লিখিয়া আমাকে দিয়াছেন।"

"এ পত্র তবে তাঁর নিজেরই লেখা।"

"হাঁ সাজাদা।"

"একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তোমার নামটি কি?"

"আমার নাম আশমান।"

মোতিয়া নিজ নাম গোপন করিয়া আপনাকে আশমান বলিয়া পরিচয় দিল। মহম্মদ জনৈক ভৃত্যকে ডাকিয়া মোতিয়াকে বিশ্রামের জন্য একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতে বলিলেন, পরে নিজেও তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

স্বীয় বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহম্মদ তাঁহার বিশ্বস্ত সামরিক কর্ম্মচারিগণকে ডাকাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"আমি আজ আপনাদিগকে একটি কথা বলিব, শুনিবেন কি।"

এক জন সকলের মুখপাত্র হইয়া উত্তর দিতে লাগিলেন,—

"সুল্‌তানের কথা আমরা মাথায় করিয়া লইব।"

"আপনারা সুল্‌তান সুজার অবস্থা কিরূপ মনে করেন?"

"কেন তিনি ত ভালই আছেন, এখনত তাঁহার অনেক সৈন্য-সামন্ত জুটিয়াছে।"

"তা বটে, কিন্তু তাহাতে কি তিনি বাদশাহী সৈন্য হটাইতে পারিবেন?"

"সম্ভবতঃ নয়।"

"তবে তাঁহার অবস্থা ভাল হইল কিসে? বাস্তবিক তাঁহার অবস্থা ভাল নহে। দেখুন, বাদসাহ তাঁহাকে পীড়ন করিবার জন্য কত না উপায় অবলম্বন করিতেছেন? পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেনাপতি মীর জুম্লাকে ও আপনাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আবশ্যক হইলে, আবার সৈন্য আসিবে। সেনাপতি আসিবে, হয়ত তিনি স্বয়ংও আসিবেন। কিন্তু সুল্‌তান সুজার অপরাধ কি? তিনি তক্ত তাউসের আশা ছাড়িয়াছেন। কিন্তু বাদসাহ কোন্

বিচারে তাঁহার জীবিকার সম্বল বাঙ্গলা রাজ্যটুকু লইয়া সুলতানের পরিবারবর্গকে পথের ভিখারী করিতে চাহেন? আমি ইহা বাদসাহের সম্পূর্ণ অবিচার মনে করিয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা করিতেছিলাম। এক্ষণে সেনাপতি নিকটে নাই, কাজেই আমি স্থির করিয়াছি যে, ন্যায় ও ধর্ম্মের জন্য আমি সুলতান সুজার পক্ষ অবলম্বন করিব ও প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিব। আপনারা আমার সহিত যোগ দিতে সম্মত আছেন কি?"

মহম্মদের কথা শুনিয়া প্রথমে কর্ম্মচারিগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনই উত্তর দিলেন না। মহম্মদ আবার বলিতে লাগিলেন,—

"আপনারা নীরবে রহিলেন যে? আমার কথায় কি আপনারা সম্মত নহেন? আপনারা সম্মত না হইলেও আমি যাহা স্থির করিয়াছি তাহা প্রতিপালন করিবই জানিবেন।"

মহম্মদের শেষ কথা শুনিয়া তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল, তাঁহারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া আপনাদের অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও মহম্মদকে অসন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা না করিয়া কহিলেন,—"আমরা সুলতানের আদেশপ্রতিপালন করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষী আছি। আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে কি করিতে হইবে।"

"আমি অদ্যই টাঁড়া যাত্রা করিব, আপনারা কল্য তথায় যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। অচিরে আমার সমস্ত সৈন্য যেন সেখানে উপস্থিত হয়। সেনাপতি যেন এ সংবাদ জানিতে না পারেন।"

"সুলতানের আদেশ অবশ্যই পালন করিব।" এই বলিয়া কর্ম্মচারিগণ বিদায় লইয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মহম্মদ কক্ষবাহিরে আসিয়া ডাকিলেন,—"আশমান"।

নিমেষ মধ্যে মোতিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল,—

"সাজাদা কি আজ্ঞা হয়।"

"তোমার সঙ্গে নৌকা আছে?"

"আছে সাজাদা।"

"আচ্ছা তুমি নৌকা ঠিক কর, আমি এখনই তোমার নৌকায় যাত্রা করিব।"

"যে আজ্ঞা, বলিয়া মোতিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল, মহম্মদ কিছুক্ষণ পরে আপনার অনুচরদিগকে স্বতন্ত্র একখানি নৌকায় আসিতে বলিয়া নিজে মোতিয়ার নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে আরম্ভ করিল।

চন্দ্রালোকে গঙ্গাবক্ষ ভরিয়া গিয়াছে, মেঘমুক্ত চন্দ্রমা নীলাকাশের কোলে বসিয়া জ্যোৎস্নার ফুয়ারা ছুটাইতে ছিলেন, চারিদিক তাহাতে স্নিগ্ধ হইয়া হাসিয়া উঠিতেছিল। দুই এক খানি কাল মেঘ চাঁদের নিকট আসিতে না আসিতে শাদা হইয়া গেল। নীলাকাশ আপনার বিশাল বক্ষ পাতিয়া জ্যোৎস্না-লহরী ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, জ্যোৎস্না সে ভয়ে গঙ্গাবক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। অমনি নদীহৃদয়ে রজতভরঙ্গ বহিয়া গেল, এবং বক্ষ ভেদ করিয়া রজতধারা যেন তলস্পর্শ করিতে ছুটিয়া চলিল। বর্ষার মেঘ সরিয়া গেলে নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে যখন দিগন্ত হাসিয়া উঠে, তখন পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ নদীহৃদয়ে সেই জ্যোৎস্নার খেলা এক অভাবনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

নবীন জলোচ্ছ্বাসে আতটপরিপূর্ণা স্রোতস্বিনী ছুটিয়া চলিয়াছেন। জ্যোৎস্নালোকে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। দূরাগত বীণাধ্বনির ন্যায় তাঁহার কল কল ধ্বনি দিগন্তবক্ষে মিলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে

সুলতান মহম্মদ মোতিয়ার নৌকায় বসিয়া নদী পার হইতেছিলেন; গঙ্গার তরঙ্গে প্রতিহত হইয়া নাচিতে নাচিতে নৌকাখানি পারে আসিতেছিল। দাঁড়ের আঘাতে গঙ্গাবক্ষে শত শত মাণিক জ্বলিয়া উঠিতেছিল। নদীর মধুর ধ্বনির সহিত তাহার শব্দ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুরতার লহরী উঠাইতেছিল। রজনী ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। চারিদিক ঝিল্লীরবে মুখর হইতে লাগিল। ঝপ্ ঝপ্ শব্দে দাঁড় ফেলিয়া মাঝিরা নদী বাহিয়া চলিল। সুলতান মহম্মদ সেই পবিত্র জ্যোৎস্নালোকে তরণীবক্ষে বসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহ ভাঙ্গিয়া গেলে সুলতান মহম্মদ মোতিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আশমান্, এই জ্যোৎস্নালোকে নদীবক্ষে বসিয়া একটি ইচ্ছা হইতেছে, তুমি কি তাহা পূরণ করিতে পার ?"

"সাধ্য থাকিলে অবশ্যই পারিব।"

"আশমান তুমি কি গাহিতে জান ?"

মোতিয়া প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইল, পরে কহিল,—

"কিছু জানি।"

"তবে আমার অনুরোধ, তোমার একটী গান শুনিব।"

"আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছি" বলিয়া মোতিয়া বেহাগ রাগিণীতে আরম্ভ করিল,—

"তবু প্রাণ না গেল,
নিরাশা-মেঘে হৃদয় ছাইল, আশার আলোক কোথায় লুকাল।
যেই ছবি খানি সোহাগ-চন্দনে, প্রেমফুল অনুরাগ-ধূপদানে,
হৃদয়-মন্দিরে পূজিনু যতনে, কেড়ে নিল তায় জীবনে কি ফল,
অই দেখ হৃদয়-ফলকে, নিঠুর সে ছবি প্রেমের পুলকে
হাসিয়া উঠিছে পলকে পলকে, আমার যে সখি সকলি ফুরাল।"

সেই নীরব রাত্রিতে মোতিয়ার কণ্ঠধ্বনি গঙ্গার তরঙ্গে আঘাত করিয়া নীরব দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। সুলতান মহম্মদ মোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আশমান তুমি পুরুষ না রমণী ?"

মোতিয়া উত্তর দিল, —

"কেন, কেন সাজাদা সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

"পুরুষের এরূপ কণ্ঠস্বর ত শুনি নাই।"

"শিক্ষা করিলে পুরুষের কণ্ঠস্বরও কোমল হয়।"

"কার কাছে তুমি শিক্ষা করিয়াছ আশমান ?"

"পিয়ারী বানু আমাকে কিছু কিছু শিখাইয়াছেন ?"

"এ গানটী কি তাঁহারই নিকট শিখিয়াছ ?"

"না সাজাদা, এটি সাজাদী আয়েসা আমাকে শিখাইয়াছেন।"

"তিনি কি মাঝে মাঝে এই গান গাহিয়া থাকেন ?"

"তাঁহার মুখে প্রায়ই এই গানটী শুনিতে পাই।"

"তবে কি এ গান আমাকে লক্ষ্য করিয়া গাওয়া হয় ?"

"আমি কি করিয়া বলিব সাজাদা ? আপনি ত যাইতেছেন, সাজাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

"তুমি কত দিন তাঁহাদের নিকট আছ ?"

"আমি বাল্যকাল হইতেই আছি।"

"সেখানে আমার প্রসঙ্গ কিছু শুনিয়া থাক কি ?"

"সকলেরই নিকট আপনার কথা শুনি।"

"কার কার নিকট শুনিয়াছ বল দেখি ?"

"সুলতান সুজার সকল পরিবারের নিকটই আপনার কথা শুনিয়া থাকি।"

"সাজাদী আয়েসার নিকট ?"

"তাঁহার মুখে না শুনিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি আপনারই জন্য আত্মহারা।"

"কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"সাজাদী হইয়াও তিনি সর্ব্বদা আনমনা, যেন কি এক চিন্তায় তিনি সর্ব্বদা বিভোর, তাইতে সকলে বলে তিনি কেবল আপনাকেই ভাবিয়া থাকেন।"

"একথা কি সত্য?"

"সাজাদার নিকট মিথ্যা বলিতেছি না।"

"তিনি আমার চিন্তা করেন কেন বলিতে পার?"

"শুনিয়াছি ছোট বেলা হইতে আপনাদের বিয়ের কথা হইতেছে, কিন্তু তাহা ঘটে কি না, তাই তিনি সর্ব্বদা ভাবিয়া থাকেন।"

"না ঘটিবার কারণ কিছু কিছু শুনিয়াছ কি?"

"কিছু কিছু শুনিয়াছি বটে।"

"কি শুনিয়াছ বল দেখি?"

"আপনি কি আর একটি বিবাহ করিয়াছেন?"

"করিয়াছি।"

"আরও কথা আছে।"

"কি সে কথা?"

"আপনার পিতা নূতন বাদসাহের সহিত সুলতান সুজার বিবাদ চলিতেছে।"

"তাতে কি?"

"তাতে বিবাহের বাধা হওয়ার সম্ভাবনা।"

"বটে, তুমি সমস্তই জান দেখিতেছি।"

"সর্ব্বদাই এই কথার আলোচনা হয়, কাজেই আমার শুনিতে বাকি নাই।"

"আচ্ছা, আয়েসা তোমাকে দিয়া পত্র পাঠাইলেন কেন?"

"আমার অল্প বয়স দেখিয়া সাজাদা গোস্তাকি মাপ করিবেন বলিয়া।"

"যদি আমি তাহা না করিতাম?"

"উত্তম, সাজাদীর কাজের জন্য যদি আমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইত, করিতাম।"

"তুমি তবে কষ্ট ভোগ স্বীকার করিয়াই গিয়াছিলে?"

"না সাজাদা, আমার মনে তাহা হয় নাই।"

"কেন হয় নাই?"

"আমি জানিতাম, আপনি সাজাদীর অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না।"

"কেন পারিতাম না?"

"আপনারও যে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা আছে তাহা আমরা জানিতাম।"

"কিরূপে জানিতে?"

"আমরা আপনাদের উভয়ের অনেক কথাই জানি।"

"তাহা হইলেও আমি যখন তাঁহার পিতার সহিত লড়াই করিতে আসিয়াছি, তখন কিরূপে তাঁহার অনুরোধ রাখিতাম, তোমরা মনে করিয়াছিলে?"

"সাজাদা, উভয়ের মধ্যে প্রেম জন্মিলে জগতের কিছুতেই তাহাকে বাধা দিতে পারে না। জগতে প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে।"

"বা আশমান তুমি এ সব কথাও শিখিয়াছ দেখিতেছি, আমি

তোমার কথায় প্রীত হইলাম। সত্য বলিয়াছ, জগতে প্রেমেরই জয় হয়।”

তাঁহাদের কথোপকথন শেষ হইতে না হইতে নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল। মোতিয়া মহম্মদকে কহিল,—

“সাজাদা, নৌকা তীরে লাগিয়াছে।”

মহম্মদ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিলেন, মোতিয়াও সঙ্গে সঙ্গে নামিল। সেই খানে সুজার পুত্র বুলন্দ আক্তর কয়েক জন কর্ম্মচারিসহ মহম্মদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সুজা ও পিয়ারী বানু পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিতি করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বুলন্দ আক্তর অগ্রসর হইয়া মহম্মদকে অভিবাদন করিলেন, মহম্মদ তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। পরে সকলে মিলিয়া টাঁড়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। সাসুজা মহম্মদের আগমন শুনিয়া সানন্দে অগ্রসর হইলেন, এবং মহম্মদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

“তোমাকে যে আমাদের নিকটে দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না।”

মহম্মদ নীরবে জ্যেষ্ঠতাতের পদধূলি লইলেন। তার পর পিয়ারী বানুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল. বানু বলিলেন,—

“যদি একবার আসিয়াছ ত আমাদের দশা দেখিয়া যাও।”

মহম্মদ কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে যাহা হউক, মহম্মদকে পাইয়া টাঁড়ার রাজপ্রাসাদে কিন্তু আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল।

৬

আয়েসার সুরম্য প্রকোষ্ঠ আজ দীপমালায় ভূষিত। মর্ম্মর-

মালায় খচিত ভূমিতলে দীপালোক পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। ভিত্তিসংলগ্ন চিত্রাবলি সে আলোকে হাসিয়া উঠিতেছিল। আতর-গোলাপে প্রকোষ্ঠ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব্ব কারু-কার্য্যযুক্ত গালিচার উপর পুষ্পমালা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারও গন্ধ আতর গোলাপের সুবাসের সহিত মিশিয়া প্রকোষ্ঠের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বর্ষার শীতল বায়ু প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শীতল করিয়া তুলিতেছিল ও তাহার সুবাস হরণ করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিতেছিল। তখন জ্যোৎস্নালোকে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। দীপালোকের ভয়ে জ্যোৎস্না সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে নাই। চাঁদের জ্যোৎস্না গৃহে প্রবেশ না করিলেও, আয়েসার রূপ-জ্যোৎস্না কিন্তু দীপালোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। গালি-চার উপর বসিয়া আয়েসাসুন্দরী যেন কিছু চিন্তা করিতেছিলেন। আজ তিনি সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়াছেন। গলদেশে পুষ্পমালা বায়ু-ভরে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। আয়েসাসুন্দরী চিন্তা করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু এ চিন্তার কিছু নূতনত্ব ছিল। কারণ এ চিন্তা তাঁহার মুখে কালিমাপাত করে নাই, বরঞ্চ প্রসন্নতায় মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে-ছিল। কেন আজ আয়েসার ভাবান্তর ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদিন ধরিয়া তিনি হৃদয়ে যে সুখের চিত্র আঁকিয়াছিলেন, আজ আশার আলোকে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে আলোক যেন ফুটিয়া তাঁহার বদনমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার রূপ-জ্যোৎস্না তাহাতে ঢল ঢল করিতেছিল। মহম্মদের আগমনে আয়েসার হৃদয় যে দুরু দুরু করিতেছিল, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। আয়েসা প্রকোষ্ঠমধ্যে মহম্মদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইলে মহম্মদের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া আয়েসা

কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে মোতিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—

"বড়ই উতলা হয়ে উঠেছ যে।"

"কিসে বুঝ্‌লি ?"

"তোমার ভাব দেখিয়া।"

"কেন, আমাকে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিতেছিস্‌ নাকি ?"

"তুমি নিজে না করিলে তোমার মনপ্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ত বটে।"

"তুই মনপ্রাণের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিতেছিস্‌ নাকি ?"

"তোমার মনপ্রাণের মধ্যে ত অনেক দিন ঢুকিয়াছি, কাল্‌ সারারাতি যে তোমার হৃদয়েশ্বরের হৃদয়মধ্যে ঢুকিয়া ছিলাম।"

"তবে তাঁর হৃদয়টা অধিকার ক'রে বসেছিস্‌ নাকি ?"

"বালাই, তা ক'র্‌তে যাব কেন, আর তাতে স্থানই বা কৈ ?"

"অত বড় বিশাল হৃদয়ে একটুও স্থান পেলিনে ?"

"সমস্তই যে আয়েসার অধিকার। যদিও একটু আধটু পড়ে থাকে, তাহা বোধ হয় রিজিয়াসুন্দরী দখল ক'রে ব'সে আছে। কিন্তু দেখ্‌লাম সমস্তই আয়েসার অধিকার।"

"তুই কেমন ক'রে বুঝ্‌লি ?"

"এই যে বল্লেম কাল সারারাতি তাতে ঢুকে ছিলেম।"

"সত্যি মোতিয়া, সব কথা ত তুই আমাকে বলিস্‌ নাই।"

"তোমার কি শোন্‌বার অবসর আছে ?"

"না ভাই বল !"

"এখনই তোমার মনচোরা এসে হাজির হবেন, তাঁর কাছে নয় শুনিও।"

"আগে ত তোর কাছে শুনি।"

"বেশী কিছু এখন ব'লব না। তবে তোমার সাধের গানটি তাঁকে শুনায়ে দিয়েছি।"

"তুই গান গাহিয়াছিলি নাকি?"

"সাজাদা গাইতে বল্লেন, কাজেই গাইতে হ'ল।"

"তবে ত তোকে চিনিতে পারিয়াছিলেন?"

"একেবারে পারেন নাই, তবে সন্দেহ করিয়াছিলেন।"

"ধন্য তোর সাহস যা হ'ক।"

"এ সাহস না থাক্‌লে কি তোমার মনচোরাকে বাঁধিয়া আনিতে পারিতাম। এখন আমাকে কি এনাম দিবে দাও।"

"এখন এই দিতেছি, পরে যা দিবার দিব।"

এই বলিয়া আয়েসা মোতিয়াকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। মোতিয়া বলিল,—

"এই এনামই যেন চিরদিন পাই, আর কিছুর প্রয়োজন নাই।"

তাহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় মহম্মদ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জনৈক পরিচারিকা তাঁহাকে প্রকোষ্ঠে পৌঁছিয়া দিল। মহম্মদ প্রথমে মোতিয়াকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—

"তুমিই কি আশমান?"

"আশমান আশমানে মিশিয়াছে, সাজাদা আমাকে সাজাদীর সহচরী মোতিয়া বলিয়া জানিবেন।"

"তুমি যখন আয়েসার সহচরী, তখন তোমার নিকট যে ঠকিব ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তুমি কি সুন্দর বালক বেশ ধরিয়াছিলে?"

"সে কেবল সাজাদীরই জন্য। সাজাদা, এখন আমি আসি, সময়ে সাক্ষাৎ করিব। এখন আর আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে চাহি না" এই বলিয়া মোতিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া গেল। মহম্মদ

আয়েসার নিকট গিয়া গালিচার উপর বসিলেন, এবং তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,"—

"আয়েসা আমাকে ক্ষমা কর, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি।"

অশ্রুপূর্ণলোচনে আয়েসা কহিলেন,—

"যাঁহার পদস্পর্শে গৃহ পবিত্র হইল, আমরা ধন্য হইলাম, ছি, তাঁর মুখে ওকথা শোভা পায় না।"

"না আয়েসা, আমি সত্য কথাই বলিতেছি, আমি তোমার নিকট অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করিতেই হইবে!"

"কি অপরাধ করিয়াছ প্রাণাধিক!"

"তোমাকে মিছামিছি কষ্ট দিয়াছি।"

"আমি কষ্ট পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতিও ত আর মনে আসিতেছে না।"

"এমনি তোমার সরলতা বটে।"

"আবার যে তোমাকে দেখিতে পাইব তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।"

"কেন আয়েসা, আমি ত তোমাকে ভুলি নাই।"

"আগে সে কথা মনে হইত না, তবে এখন বুঝিতেছি তাহা সত্য।"

"ঘটনাচক্রে আমাকে দূরে থাকিতে হইয়াছিল।"

"সেই ঘটনাচক্রেই ত আমরা নিষ্পেষিত হইতেছি।"

"আয়েসা সে কথা তুলিয়া আর আমার মনে কষ্ট দেও কেন? দেখ, আমি তোমার জন্য সমস্তই ছাড়িয়া দিলাম। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিলাম, ভারতসাম্রাজ্য পদাঘাতে দূরে ফেলিলাম, তোমার অপার্থিব প্রেমের জন্য সমস্ত জগৎ পরিত্যাগ করিলাম। এমন কি, তোমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি বাদসাহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত। এখনও কি আমায় তুমি বিশ্বাস করিবে না?"

"ছি প্রাণাধিক, ওকথা বলিতে নাই। আমি কি তোমায় অবিশ্বাস করি? তা যদি করিতাম, তাহা হইলে মোতিয়াকে দিয়া পত্র পাঠাইতাম না। আমি ত লিখিয়াছিলাম, তুমি না আসিলে আমিই তোমার চরণ-তলে নিপতিত হইব।"

"তাহাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আয়েসার হৃদয়ে এখনও আমার স্থান আছে।

"আমার হৃদয়ে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।"

"এ হৃদয়েও তাই জানিবে।"

"তবে রিজিয়াসুন্দরীর কিছু অধিকার থাকিতে পারে।"

"অধিকার কিছুই নাই, তবে একটু সামান্য স্থানের জন্য সে দাবী করিয়া থাকে বটে।"

"অবশ্য তাঁহার দাবী অসঙ্গত নয়।"

"কিন্তু মোতিয়ার নিকট তোমার যে গান শুনিলাম, আমি তায় লক্ষ্য হইলে আমার প্রতি তোমার যার পর নাই অবিচার করা হইয়াছে।"

"নারীচিত্ত সততই দুর্ব্বল, তাই মাঝে মাঝে নানা আশঙ্কা উঠিত।"

"এখন বল, আর আমায় অবিশ্বাস করিবে না?"

"সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

"আমি তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?"

আয়েসা আপনার কণ্ঠ হইতে ফুলহার খুলিয়া মহম্মদের গলে পরাইয়া কহিলেন,—

"কেমন, এখন বিশ্বাস হইবে ত?"

মহম্মদও নিজের পুষ্পহার আয়েসার গলায় দুলাইয়া বলিলেন,—

"হাঁ বিশ্বাস হইল।"

এই সময়ে মোতিয়া প্রকোষ্ঠের বাহির হইতে বলিয়া উঠিল,—

"আমি এই সময়ে কাজীর কাজটা করিব না কি?"

মহম্মদ ও আয়েসা উভয়ে বলিয়া উঠিলেন,—

"কে মোতিয়া? বাহিরে কেন?"

"তবে কাজীর কাজটা করিতে হইল" বলিয়া মোতিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল, ও গালিচাস্থিত পুষ্পমালা লইয়া উভয়কে ভূষিত করিয়া দিল।

সেই রাত্রিতে মোতিয়া গিয়া পিয়ারী বানুকে সমস্ত কথা বলিল। পিয়ারী বানু সুজাকে সমস্ত জানাইয়া কহিলেন, "দেখ প্রেমের জয় হইল কি না?" শুনিয়া সুজা বলিলেন, "পিয়ারী বানুর কথা কবে মিথ্যা হইয়াছে?"

তাহার পর টাঁড়ায় মহাধূম পড়িয়া গেল। সমস্ত নগর বিবাহোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিল। গীতবাদ্যে চারিদিক্ মুখর হইতে লাগিল। নহবতের সুমধুর ধ্বনি মীরজুম্লার শিবিরে গিয়া পৌঁছিল। সুজার পরিবার মধ্যে আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। ভবিষ্যতের কথা কেহ মনে না করিয়া বর্ত্তমান আনন্দস্রোতে সকলেই ভাসিতে লাগিল। যথানিয়মে মহম্মদ ও আয়েসার পরিণয়-ব্যাপার সংসাধিত হইয়া গেল। বহু দিন ধরিয়া সেই পরিণয়-ব্যাপার প্রেমের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

উপসংহার।

প্রেমের জয় হইল বটে, কিন্তু পরিণাম ভাল হইল না। মহম্মদের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু মহম্মদের রাজমহলপরিত্যাগের পর তাঁহারা মীর জুম্লার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেন। মহম্মদের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সৈন্য মধ্যেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। মীর জুম্লা সংবাদ পাইয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া যান, পরে রাজমহলে উপস্থিত হন ও মহম্মদের বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে সমবেত করেন। শেষে গঙ্গা পার হইয়া টাঁড়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। যে

সময় টাঁড়া বিবাহোৎসবে আনন্দময় এবং নবদম্পতি প্রণয়ের মধুরস্বপ্নে বিভোর, সেই সময়ে উহার নিকট বাদসাহী সৈন্যের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রেমের স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া, মহম্মদ যুদ্ধের জাগরণের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তিনি সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাদসাহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন. কিন্তু মীরজুম্লার নিকট তাঁহাদিগকে পরাজিত হইতে হয়। পরে সুজা তাঁহাদিগকে লইয়া ঢাকাভিমুখে যাত্রা করেন। সুজার সহিত মহম্মদের যোগদানের কথা শুনিয়া আরঙ্গজেব মহম্মদকে এক মিষ্ট ভৎসনাপূর্ণ পত্র লেখেন, এবং তাহাতে উল্লেখ করেন যে, ইহা বড়ই দুঃখের ও লজ্জার কথা যে, রমণীর বিভ্রম ও সৌন্দর্য্যে পিতৃভক্তিকেও জয় করিয়া ফেলিল। সেই পত্র সুজার হস্তগত হইলে সুজা আর মহম্মদকে বিশ্বাস করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি অনেক ধনরত্ন দিয়া আয়েসার সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। মহম্মদ অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদায় গ্রহণ করিয়া নবপরিণীতা প্রণয়িণীর সহিত ধীরে ধীরে মীর জুম্লার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মীর জুম্লা তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। বাদসাহ তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সেইখানে তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বাদসাহ তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়া কিছু কাল নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন ও তাঁহার জন্য কিছু বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সুজা ও তাঁহার পরিবারবর্গের কিরূপ পরিণাম ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা ইতিহাসে দেখিয়া লইবেন।

এই গল্পের মূলভাগ Stewart's History of Bengal ও শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের অনুদিত রিয়াজুস সালাতীনে দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন—

শ্রীশ্রী৺ পূজার বন্ধোপলক্ষে প্রতিবৎসর দুই সংখ্যা একত্রে বাহির হয় তজ্জন্য এবারও দুই সংখ্যা একত্র বাহির হইল।

গ্রাহকগণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই যে, যাঁহাদের নিকট বার্ষিক মূল্য বাকি আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নতুবা আমরা কার্ত্তিক-সংখ্যা ভিঃ-পিঃতে পাঠাইতে বাধ্য হইব।

ঐতিহাসিক চিত্র।

অন্ধকূপ-হত্যা।

(১)

প্রাচ্যরাণী কলিকাতা নগরীর এক বিশাল রাজপথে একটি শ্বেত-মর্ম্মর-স্তম্ভ দাঁড়াইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই মর্ম্মর-স্তম্ভ অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ নামে অভিহিত। কিঞ্চিন্ন্যূন শতবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানে বা ইহার নিকটে এইরূপ একটি স্তম্ভ দাঁড়াইয়াছিল, যাহাও অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভ নামে অভিহিত হইত। কিন্তু তাহার অস্তিত্ব কেন কলিকাতার বক্ষঃ হইতে মুছিয়া গিয়াছিল, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্ধকূপহত্যার স্মৃতি বোধ হয় সে সময়ে বিদ্যমান থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না, নতুবা সে স্মৃতিস্তম্ভ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবে কেন? যাহা হউক, ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি কর্জ্জন বাহাদুর আবার সেই স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে এই নূতন স্তম্ভটী স্থাপন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তিনি যে উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিস্তম্ভটী স্থাপন করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহা সমর্থন

করিতে স্বীকৃত নহে। ইতিহাস বলে যে, অন্ধকূপহত্যা বা Black-hole Tragedy নামে কোন ব্যাপারের কথা সে অবগত নহে, তবে কলিকাতায় প্রাচীন দুর্গমধ্যস্থ অন্ধকূপ নামক কারাগারে কয়েকজন আহত ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, ইহাই তাহার কোন এক পৃষ্ঠার এক স্থানে লিখিত থাকিতে পারে। আমরা নিম্নে অন্ধকূপহত্যা বা Black-hole Tragedy সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করিতেছি।

সাধারণে এইরূপ অবগত আছেন যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতা আক্রমণ করিয়া কোম্পানীর কতকগুলি লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়ায়, অন্ধকূপহত্যার অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলা কেন ইংরেজদিগের কলিকাতা আক্রমণ করেন, আমরা প্রথমে তাহার একটু উল্লেখ করিতেছি।

ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যলালসার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপিপাসাও বলবতী হইয়া উঠে। বাঙ্গলার সুদূরদর্শী নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অনেক দিন হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তিনি ইংরেজের সেই পিপাসা একেবারে মিটাইবার জন্য মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগকে দমন করিবার জন্য সমস্ত রাজত্ব-কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি মৃত্যুশয্যায় স্বীয় দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজদিগকে দমন করিতে উপদেশ দিয়া যান।

সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ইংরেজদিগের দুর্গ-সংস্কারের ও নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার মাতৃস্বসা ঘসিটি বেগমের সহায়ক রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ বা কৃষ্ণদাস কলিকাতায় ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হওয়ায়, নবাব

তাঁহাকে চাহিয়া পাঠান। ইংরেজেরা তাহাতে কর্ণপাত না করায়, সিরাজউদ্দৌলা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে কাশীমবাজার কুঠী অধিকার করিয়া পরে কলিকাতায় উপস্থিত হন।

উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তিন দিক হইতে নবাবসৈন্যের আক্রমণের বাধা জন্মাইবার জন্য ইংরেজেরা তিনটী তোপমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কামান স্থাপন করিয়াছিলেন। নবাবসৈন্যেরা উত্তর দিক হইতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। পরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়া তাহারা কলিকাতায় উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে দুর্গের নিকটে আসিয়া পঁহুছে। বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে জেনারেল পোষ্টাফিস প্রভৃতি অবস্থিত, তথায় কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা দুর্গরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অবশেষে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। তথা হইতে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রমণীদিগকে লইয়া নৌকারোহণে পলায়ন করিলেন। অবশিষ্টেরা অনন্যোপায় হইয়া নবাবসৈন্য-হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরেজ লেখকগণ বলেন যে, যে সমস্ত নরনারী নবাবসৈন্য-হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ২০শে জুন দুর্গের অন্ধকূপ নামক একটি ক্ষুদ্রায়তন কারাকক্ষে রজনীযাপন করিতে বাধ্য হন। নিদাঘের দারুণ গ্রীষ্মে তাঁহাদিগকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। অন্ধকূপের মধ্যে আলোক বা বায়ুপ্রবেশের যে সামান্য পথ ছিল, লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় তাহার মধ্য দিয়া বায়ু প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই সমস্ত নরনারী নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া অধিকাংশই একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। ইহাই অন্ধকূপহত্যা। আমরা এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখিব, অন্ধকূপহত্যার গুরুত্ব কিরূপ।

অন্ধকূপহত্যা আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমতঃ কি কি বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য, তাহাই ভাবিয়া দেখা যাউক।

(১) অন্ধকূপের আয়তনসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছে কি না? হইয়া থাকিলে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কত লোকের অবস্থান হইতে পারে?

(২) অন্ধকূপে যাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাদের এবং মৃত ও জীবিতদিগের সংখ্যাসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছে কি না, এবং সেই লোক সমস্ত ইংরেজ কি তাহাদের মধ্যে অন্যান্য জাতিরও লোক ছিল?

(৩) অন্ধকূপহত্যা যদি মানিয়া লইতে হয়, তবে তজ্জন্য সিরাজ উদ্দৌলা দোষী কি না?

(৪) অন্ধকূপহত্যার গুরুত্ব এদেশে বা ইউরোপে কি ভাবে আলোচিত হইয়াছিল?

(৫) অন্ধকূপহত্যার ন্যায় ব্যাপার পৃথিবীতে আর কখন ঘটিয়াছে কি না? ঘটিয়া থাকিলে সেই সেই ব্যাপারের সহিত অন্ধকূপহত্যার তুলনা করিলে তাহার গুরুত্ব কিরূপ বুঝা যায়?

(৬) অন্ধকূপহত্যা ও তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে?

আমরা এই বিষয় কয়েকটিরই আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

অন্ধকূপে যাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবই অন্ধকূপহত্যার কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্ধকূপ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৮ ফুট ছিল। কিন্তু গবর্ণরের সেক্রেটারি জন্ কুক্‌ও অন্ধকূপে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি অন্ধকূপকে ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট প্রস্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাপ্তেন গ্রাণ্ট তাহাকে ১৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট প্রস্থ বলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক অর্ম্মে সাহেব অন্ধকূপকে এক স্থানে

১৬ ফুট দীর্ঘপ্রস্থ ও তাঁহার ইতিহাসে ২০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট প্রস্থের কম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ ১৯৩ হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অন্ধকূপের আয়তন-সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ নাই। হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের লিখিত আয়তনই অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিক উইল্‌সন্‌ সাহেব কুকের নির্দ্দেশকে প্রকৃত বলিয়া অভিহিত করেন। উইলসন সাহেব কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ-সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনুসন্ধানে যে অন্ধকূপের আয়তন স্থির হইয়া গিয়াছে, ইহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। ফলতঃ সকলেই যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহার আয়তন স্থির করিয়া-ছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহার আয়তনের স্থিরতা নাই সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ বলিয়া মনে হয় না।

এক্ষণে অন্ধকূপে কি অবস্থায় কতলোক ধরিতে পারে, তাহারই আলো-চনা করা যাইতেছে। আমরা সাধারণের গৃহীত ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৮ ফুট প্রস্থ অন্ধকূপের আয়তন ধরিয়া লইলাম, এবং উহাতে ১৪৬ জন লোককে প্রবেশ করান হইয়াছিল বলিয়া যাহা প্রকাশ, প্রথমে তাহাও মানিয়া লইতেছি। ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৮ ফুট প্রস্থে ৩২৪ বর্গফুট হয়। একজন মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার অতি কম করিয়া ১½ ফুট দীর্ঘ ১ ফুট প্রস্থ প্রয়োজন হয়। সেই হিসাবে ৩২৪ বর্গফুটে ২১৬ জন ব্যক্তি ধরিতে পারে। অবশ্য অত্যন্ত ঠেসাঠেসি না করিলে তাহা ঘটিয়া উঠে না। ঐরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির বসিবার জন্য ১½ ফুট দীর্ঘ ও ১½ফুট প্রস্থ স্থান ধরিলে ২¼ বর্গফুটের প্রয়োজন হয়; তাহা হইলে ৩২৪ বর্গফুটে ১৪৪ জন ব্যক্তি বসিতে পারে। শুইতে হইলে ৫½ ফুট দীর্ঘ ও ১½ ফুট প্রস্থ স্থান ধরিলে ৭¾ বর্গফুটের কম স্থানে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং ৩২৪ বর্গফুটে ৪১ জন লোক শুইতে পারে। এক্ষণে যে গৃহে ২১৬ জন লোক দাঁড়াইতে পারে ও ১৪৪

জন লোক বসিতে পারে, সেখানে ১৪৬ জন লোককে তাহার মধ্যে প্রবেশ করান একটা লোমহর্ষণ ব্যাপার বলিয়া মনে করা যায় না। তবে সেই সমস্ত লোকের তথায় থাকা যে কষ্টকর হয়, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্ধকূপে আবদ্ধ লোকসংখ্যা-সম্বন্ধে যে কত মতভেদ আছে, আমরা নিম্নে তাহা দেখাইতেছি।

প্রথমে হল্‌ওয়েলের কথা বলা যাইতেছে। হল্‌ওয়েল্‌ ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৮এ ফেব্রুয়ারি সাইরেন জাহাজ হইতে উইলিয়ম ডেভিস্‌কে যে অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ প্রদান করেন, তাহাই সাধারণের মধ্যে বিশদরূপে আলোচিত হইয়া থাকে, এবং তাহাতে হল্‌ওয়েল্‌ আপনাদের কষ্টভোগের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ১৪৬ জন ব্যক্তির অন্ধকূপে প্রবেশ করার কথা বলেন। তন্মধ্যে তিনি ৫৪ জন ইংরেজ প্রধান কর্ম্মচারী ও ৬৯ জন ওলন্দাজ ও ইংরেজ সার্জ্জন তোপাসী সৈন্য, আর্ম্মেনীয় ও পর্টুগীজ প্রভৃতি মোট ১২৩ জনের মৃত্যুর কথা বলিয়াছেন। জীবিত ২৩ জনের মধ্যে ১১ জনের নাম দিয়াছেন। অবশিষ্ট ১২ জনের নাম দেন নাই। কিন্তু হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ১৭ই জুলাই বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিলে যে দুই পত্র লেখেন, তাহাতে ১৬৫ কিংবা ১৭০ জনের প্রবেশের কথা ও কেবল ১৬ জনের জীবিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আবার ৩রা আগষ্ট তিনি মাদ্রাজ কাউন্সিলে যে পত্র লেখেন, তাহাতে ৫২ জনের অধিক ইংরেজ কর্ম্মচারীর ও কতকগুলি ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্টুগীজ সৈন্যের মৃত্যু ও ১৮।১৯ জনের জীবিত থাকার কথা লিখিয়াছেন। বষ্টীভ্‌ বলেন যে, হল্‌ওয়েল্‌ প্রথমে অনুমানের দ্বারা অন্ধকূপের লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পরে সকলের নোট-বুক দেখিয়া ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ২৩ জনের জীবিত থাকার কথা স্থির করেন। বষ্টীভ্‌ যাহাই বলুন না কেন, হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব নিজে যে প্রথমে কত লোককে প্রবেশ করান হয় ও কতলোক মরিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান

তৎক্ষণাৎ করেন নাই এবং কত জন যে মরিয়াছিল, তাহাও তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। নিজে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার প্রমাণ দিতে পারেন নাই, দশজনের নোটবুক দেখিয়া তাহার একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে গেলে তাহা যে নিঃসন্দেহ,ইহা কোনরূপে বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব অনেকের নাম জানিতেন না, প্রথমে সংখ্যাও করেন নাই, তবে কি করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব ? ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধে কতক লোক মরিয়াছিল, কতক পলাইয়াছিল, সকলের বিবরণ তিনি কি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ? কৈ তাহার ত কোনই বিশেষ প্রমাণ আমরা তাঁহার বিবরণ হইতে জানিতে পারি না। যদিও কোন কোন স্থলে তিনি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও তাঁহার অনুমানমাত্র। সুতরাং অন্ধকূপে কত লোক প্রবেশ করিয়াছিল ও কতলোক মরিয়াছিল, হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের বিবরণকে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

তাহার পর অন্যান্য লোকের মত কি, আমরা দেখাইতেছি। কাপ্তেন মিল্‌ অন্ধকূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন ও বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতা আক্রমণের যে বিবরণ লিখিয়া অর্ম্মে সাহেবকে দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিতেছেন যে, ১৪৪ জন পুরুষ, স্ত্রী ও বালকবালিকাকে অন্ধকূপে প্রবেশ করান হয় ; তন্মধ্যে ১২০ জন মরিয়াছিল। হল্‌ওয়েলের কোন বারের বিবরণের সহিত ইহার ঐক্য নাই। জন্‌ কুক্‌ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতার গবর্ণরের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনিও অন্ধকূপে ছিলেন ও বাঁচিয়া থাকেন। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য ১৭৭২ খৃঃ অব্দের ২৬এ মে যে কমিটি বসিয়াছিল, তাহাতে যে সাক্ষ্য দেন, সেই সাক্ষ্যে তিনি প্রায় ১৫০ জন লোকের প্রবেশের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীলোক ও ১২ জনমাত্র কর্ম্মচারী ছিল। কুক্‌ ২২ জনের জীবিত থাকার কথা

লিখিয়াছেন। এই তিন জনের কাহারও সহিত কাহারও বর্ণনার ও সংখ্যার ঐক্য নাই। হল্‌ওয়েলের বর্ণনা হইতে কেবল একজন স্ত্রীলোকের কথা পাওয়া যায়। কুক্‌ও তাহাই বলেন। মিল্‌ কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক ও বালকবালিকার কথা বলিয়াছেন। তাহার পর সংখ্যায় কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য নাই। সুতরাং হল্‌ওয়েলের বর্ণনা কিরূপে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইব? অতঃপর অন্যান্য ব্যক্তির মতের কথা বলিতেছি।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ৩রা জুলাই চন্দননগরের ফরাসীকুঠী হইতে যে একখানি পত্র লেখা হয়, তাহাতে ১৬০ জন ইউরোপীয় অন্ধকূপে প্রবেশ করে বলিয়া লিখিত হয়। তন্মধ্যে ১৩২ জনের মৃত্যু ঘটে। মিষ্টার সাইকস্‌ ৮ই জুলাই কাশীমবাজার হইতে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে ১৬০ জনের অন্ধকূপে প্রবেশ ও ১১০ জনের মৃত্যুর কথা জানা যায়। ১০ই জুলাই কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে প্রথিয়ান কুঠীর অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেব যে পত্র লেখেন, তাহাতে ১৪৬ বা ১৫০ জনের প্রবেশ ও ২৩ জনের জীবিত থাকার উল্লেখ করেন। কাপ্তেন গ্রাণ্টের ১৩ই জুলাইএর কলিকাতা আক্রমণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ২০০ ইউরোপীয় পর্টুগীজ ও আর্ম্মেনীয় অন্ধকূপে প্রবেশ করে ও ১০ জনমাত্র জীবিত থাকে। কাশীমবাজার কুঠীর ওয়াট্‌স্‌ ও কলেট্‌ ১৬ই জুলাই কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ১২৩ জনের মৃত্যুর কথা আছে। মিষ্টার গ্রে জুন মাসের কলিকাতা আক্রমণের বিবরণে ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ১২৩ জনের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন। ওয়াট্‌স্‌ ও কলেট্‌ ১৮ই জুলাই চন্দননগর হইতে মাদ্রাজ কাউন্সিলে যে পত্র লেখেন, তাহাতে ২০০ লোকের প্রবেশ ও ২৫ জনের জীবিত থাকার কথা লিখিয়াছেন। এই ওয়াট্‌স্‌ ও কলেট্‌ পূর্ব্বে ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ১২৩ জনের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছিলেন। জুলাই মাসে উইলিয়ম্‌ লিণ্ডসে

রবার্ট অর্ম্মেকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে প্রায় ২০০ লোকের প্রবেশ ও ২০ কি ২৫ জনের জীবিত থাকার কথাই উল্লিখিত হয়।

চন্দননগরের ফরাসী কুঠীর মুসোবসেট ডিউপ্লেকে ৮ই অক্টোবর যে পত্র লেখেন, তাহাতে ১১০ জনের প্রবেশ ও ১৪ জনের জীবিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উইলিয়ম্ টুকের কলিকাতা আক্রমণের বিবরণে প্রায় ১৪৭ জনের প্রবেশ ও ২৩ জনের জীবিত থাকার কথা আছে। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ২৪এ নবেম্বর হুগলীর ওলন্দাজ কাউন্সিল্ হইতে বাটাভিয়ায় যে পত্র লেখা হয়, তাহাতে ১৬০ জনের প্রবেশ ও ১৫।১৬ জনের জীবিত থাকার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর চন্দননগরের ফরাসী কাউন্সিল হইতে ফ্রান্সে যে পত্র লেখা হয়, তাহাতে ২০০ লোকের প্রবেশের কথা ও প্রায় সমস্তেরই মৃত্যুর কথা লিখিত আছে।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২১ জানুয়ারি ক্লাইব জগৎশেঠকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে ১২০ জনের অধিক ব্যক্তির মৃত্যুর কথা লিখিয়াছিলেন। ৭ই মার্চ্চ তারিখে ফ্রান্সের ডিরেক্টরদিগকে লিখিত একখানি পত্র হইতে ১৫০ জন ইংরেজের প্রবেশ ও ১২৪ জনের মৃত্যুর কথা জানা যায়।

ইহার পর বিলাতের সাময়িক পত্রাদিতে কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখা যাউক।

লণ্ডন ক্রনিকালে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুনমাসে ১৭০ জনের প্রবেশ ও ১৬ জনের জীবিত থাকা উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত পত্রে ঐ মাসে চন্দননগর হইতে মিষ্টার ডুরাণ্ড যে পত্র লেখেন, তাহাতে ২০০ জনের প্রবেশ ও ১৪০ জনের মৃত্যুর কথা আছে। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের মে মাসের স্কট্স্ ম্যাগাজিনে ১৭০ জনের প্রবেশ ও ১৬ জনের জীবিত থাকার কথা লিখিত হইয়াছে। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১১ই জুনের এডিনবরা ইভিনিং কোরান্ট পত্রে ১৭৫ জনের প্রবেশ ও ১৭ জনের জীবিত থাকার কথা দেখা যায়।

উক্ত পত্রে ১৬ই জুনে ১৭৫ জনের প্রবেশ, ও ১৬ জনের জীবিত থাকার কথা আছে।

অর্মে সাহেব মাদ্রাজে থাকিয়া কলিকাতা আক্রমণের যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ১৪৩ জনের প্রবেশ ও ২১ জনের জীবিত থাকার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ইতিহাসে ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ২৩ জনের জীবিত থাকার কথা আছে। সৈদাবাদের ফরাসীকুঠীর অধ্যক্ষ মুসো ল এর লিখিত বিবরণে ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ২৩ জনের জীবিত থাকার কথা দেখা যায়। বাঙ্গলার রাষ্ট্রবিপ্লব-সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় লিখিত একটি বিবরণে প্রায় ১৫০ জনের মৃত্যুর কথা আছে। ভলটেয়ারের ভারত ইতি-বৃত্ত সম্বন্ধীয় বিবরণে ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ১২৩ জনের মৃত্যুর কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা উপরে যে ভিন্ন ভিন্ন মতের কথা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে সকলে দেখিতে পাইয়াছেন যে, অন্ধকূপে কত লোক প্রবেশ করিয়াছিল ও কত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যাঁহারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাঁহাদের মধ্যেও অনৈক্য রহিয়াছে। একজন ২।৩ বার দুই তিন সংখ্যা দিয়াছেন। যদিও কোন কোন স্থলে ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ১২৩ জনের মৃত্যুর কথা দেখা যায়, তাহা যে শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং ১৪৬ জনের প্রবেশ ও ১২৩ জনের মৃত্যু হওয়ার কোনই চূড়ান্ত প্রমাণ নাই।

কেহ কেহ আপন আপন পত্রে অন্ধকূপে কেবল ইউরোপীয় বা ইংরেজ-বন্দী আবদ্ধ থাকার কথা লিখিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকগণ তাহাই ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু হল্‌ওয়েল্‌ প্রভৃতির বিবরণে কেবল ইংরেজ নহে, শাদা, কাল নানা প্রকারের লোক থাকার উল্লেখ আছে। সুতরাং কেবল ইংরেজ বন্দীর অন্ধকূপে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার

কোনই মূল নাই। আমরা সে বিষয়ের অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ স্বয়ং হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব যখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন তখন তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বারান্তরে অন্ধকূপহত্যা-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

আশীর গড়।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবে পাঠক মহাশয়েরা অবগত হইয়াছেন যে, আশীর গড় দুর্গ ক্রমান্বয়ে আহীর, মহারাট্টা, গোন্দ, মুসলমান এবং খৃষ্টান (অর্থাৎ ইংরাজ) কর্ত্তৃক অধিকৃত ও শাসিত হইয়াছিল। এই সকল শাসনকর্ত্তা-দিগের ঐতিহাসিক বিবরণে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই দুর্গ কেবল সেনানিবাস ও রাজপ্রাসাদ বলিয়া ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, পরন্তু ইহা রাজকারাগার (State Prison) রূপেও ব্যবহৃত হইত। অনেক রাজা, রাণী, নবাব, বেগম, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, সেনাপতি, শাসনকর্ত্তা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতা, বিদ্রোহী এবং দস্যুদলপতি ইহাতে বন্দী থাকিত। ইংরাজী আমলেও ইহা ষ্টেট প্রিজন্ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আহীর জাতির শাসনকাল হইতে ইংরাজী শাসনকাল পর্য্যন্ত যে সকল বিখ্যাত লোক এই দুর্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যে-কের নাম পাওয়া যায় না, যতগুলি আমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ততগুলির নাম এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

১। রাজা বীরসিংহ দেব। *

২। নরনারায়ণ পণ্ডিত।

* ইনি বুন্দেলখণ্ডের দস্যুদিগের দলপতি ছিলেন, ইঁহার উপাধি ডংগদার। ডং অর্থে ডাকাইত। প্রভুত্ব ও পরাক্রম জন্য রাজা বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। সম্রাট সেলিমের কুপরামর্শে বীরসিংহদেব, আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল্ মহোদয়কে হত্যা করেন।— The Central Provinces' Gazetteer. Page 137 (First Edition).

৩। গদাধর খটকে।

৪। জিন্‌জীবল আহীর।

৫। ভোঁশলা রাও।

৬। ত্রিবিক্রম সিংহ।

৭। হরনারায়ণ পূজারী।

৮। গোলাম ইস্‌কন্দর আলি।

৯। প্রভুজান।

১০। কৃপাবাই।

১১। ভার্গব পণ্ডিত।

১২। মহম্মদ তহশীন।

১৩। সর্দ্দার হরদেও সা।

১৪। মুণ্ড্‌লা পাঠক।

১৫। আপ্পা সাহেব।

১৬। চেতু নামক দস্যুদলপতি।

ইংরাজ শাসনে যে সকল লোক আশীর গড়ে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের নাম প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। যে কয়েক জনের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইল।

১। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি কণ্টক রাও।

২। বৃটিশবিদ্রোহী পণ্ডিত কমললোচন সিংহ।

৩। গোলাম জিক্‌রীয়া হুসেন।

৪। বিদ্রোহী ফরাসী সৈনিকপুরুষ ভে তোঁ।

৫। রঘুনাথ সর্দ্দার।

৬। রফিক উদ্দীন মিঞা (বিদ্রোহী)।

৭। প্রকাশ ডাকাইত।

৮। হয়দর ঠগী।

৯। রাজা কৃষ্ণদেব রাও।

১০। রাজা সরোজ সিংহ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যে পর্ব্বতের উপরে আশীর গড় দুর্গ প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম সাতপুরা গিরিমালা। পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত প্রায় ৫৫ ক্রোশ ইহা বিস্তৃত। সুপ্রসিদ্ধা তাপ্তী নদী এই সমুদয় স্থানকে সিক্ত করিয়া থাকে; প্রখ্যাত বুর্হানপুর নগর এই উপত্যকায় অবস্থিত। এই সাতপুরা গিরিমালার উত্তরাংশ সমুদয় নিমার জেলার মধ্যে সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম স্থান, ইহাকে নিমারোদ্যান (Garden of Nimar) কহা যাইতে পারে। এই অপূর্ব্ব স্থানেই আশীর গড় দুর্গ প্রতিষ্ঠিত। কাটি ঘাটি নামক পার্ব্বত্যপথ দিয়া এই দুর্গাভিমুখে যাইতে হয়। এই পার্ব্বত্যসন্ধিস্থল খান্দেশ ও মালবের পথের উপরে অবস্থিত, ইংরাজীতে ইহাকে Mountain Pass বলে। হিন্দু-দস্যু, মুসলমান-ডাকাইত, মহারাষ্ট্রীয় লুণ্ঠক এবং বৃটিশ সেনার আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য এই স্থানে অনেকবার অনেক ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আশীর গড় হইতে সোজা পথে চলিলে তাপ্তীনদীর তীরে পৌছিতে পারা যায়, ইহার একদিকে বুর্হানপুর, অপর দিকে জিনাবাদ। বর্ত্তমান কালে আশীর গড় দুর্গের পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ ভীল জাতি কর্ত্তৃক নিবসিত হইয়াছে; সম্রাট আওরংজেবের শাসনকালে এই সকল ভীলের অধিকাংশ বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু অদ্যাপি ইহারা হিন্দু বলিয়াই পরিগণিত এবং হিন্দুর আচারব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া থাকে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে ইস্‌লাম কহিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহারা ম্লেচ্ছদিগের সহিত কোন সম্পর্কই রাখে না। আশীর গড়ের পার্শ্বস্থিত অরণ্যমালা "পুনাশা বন" বলিয়া বিখ্যাত, ইহা হোসেংগাবাদ জেলার কালীবীৎ অরণ্যের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ২২৬ বর্গ ক্রোশ বিস্তৃত।

এক সময়ে সমুদয় মধ্যপ্রদেশ বৌদ্ধরাজ্যভুক্ত ছিল; নর্ম্মদা-তটে

মহেশ্বর নামে বৌদ্ধেরা সর্ব্বপ্রথম রাজধানী স্থাপন করেন, এক্ষণে ইহা মহীসুরা আখ্যায় প্রসিদ্ধ। আহীর, জাতীয় লোকেরা বৌদ্ধদিগের বিদ্রোহী হইয়া বৌদ্ধরাজত্ব ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল; মুসলমানেরা যখন সর্ব্বপ্রথম দিল্লীনগরী আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আহীরজাতীয় বীরগণ যবনকে শাসন করিয়া প্রভূত যশোপার্জ্জন পূর্ব্বক সমগ্র হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীতে হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল। আহীরেরা অতি পুরাতন হিন্দু জাতি, শ্রীমদ্ ভাগবত এবং বিবিধ পৌরাণিক গ্রন্থে আহীরদিগের বিক্রমের বিবরণ উল্লিখিত আছে। আশীরগড় দুর্গ, এই আহীরবংশধরদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে আহীরবংশীয় "আশী" উপাধিধারী নরপতিগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে শাসন-বিস্তার করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে আশীর আহীর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি আশীরগড় দুর্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছে। সপ্তপুরা পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ আহীরদিগের অধিকৃত ছিল। খান্দেশের মুসলমান নরপতিগণ কর্ত্তৃক ইহা সর্ব্বপ্রথমে যবন-শাসনে আনীত হয়; তৎপূর্ব্বে ইহা হিন্দুশাসনাধীনে অবস্থিত ছিল। আশীর আহীর তাহার জীবনের প্রথমাবস্থায় সামান্য মেষপালক ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক লেখক ফেরেস্তা সা, আশীরগড়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, মূল পারস্য ভাষা হইতে বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আশা আহীরের পূর্ব্বপুরুষগণ মেষপালক ছিল, অনেক সময়ে স্থানীয় দস্যুসমূহ পালিত পশুদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত বলিয়া, আশার পিতৃপুরুষবর্গ পর্ব্বতের চারিদিকে প্রাচীর উঠাইয়া ঐ স্থানকে নিরাপদ করিয়া রাখিত। আশা তাহার পিতার মৃত্যুতে সম্পত্তির অধিকারী হইয়া এরূপ যোগ্যতা ও সাবধানতার সহিত কৃষিকার্য্যে ও পশুপালনের

ব্যবসায়ে সমুন্নতি করিয়াছিল যে, অতি অল্পকাল মধ্যে সে ব্যক্তি পঞ্চসহস্র মহিষ, পঞ্চসহস্র গাভী, বিংশসহস্র মেষ এবং এক সহস্র ঘোটকের স্বত্বাধিকারী হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে দুই সহস্র সিপাহীর দল সৃষ্টি করে এবং পরিণামে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। এই দুর্গ আশা আহীরের নামানুসারে আশীরগড় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।"—ফেরেস্তা। চতুর্থ অংশ।

মুসলমান শাসনকর্ত্তারা আশীর আহীরের প্রবল প্রভাব দর্শন করিয়া, আশীরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এবং ন্যায় ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যবনেরা সন্ধি-পত্রের নিয়মসমূহ ভঙ্গ পূর্ব্বক আহীর রাজাকে নিধন করে। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন, ফরোকী নামক যবনবংশীয় শাসনকর্ত্তাগণ আশীরকে নিহত করিয়া তাহার সম্পত্তিসমূহ অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ভোগ করিতে পারে নাই; অধার্ম্মিকেরা কখন ভগবানের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঐতিহাসিক ফেরেস্তা এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হোলকার ও সিন্ধিয়া বংশীয় মহারাষ্ট্রীয়গণ দুর্গের অধিস্বামী হয়েন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ (Central provinces) সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজদিগের সংস্পর্শে আইসে এবং কয়েক বৎসরের চেষ্টায় আশীরগড়ের ভিতরে ইংরেজেরা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু অধিকার প্রাপ্ত হন নাই।

সম্ভবতঃ ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ আশীরগড় দুর্গের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তখন বাজীরাও পেশোয়া রাজা ছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার হস্ত হইতে ইংরাজেরা গ্রহণ করেন, কিন্তু জেনেরল ওয়েলেশ্‌লীর অনুরোধে এই দুর্গ পুনরায় মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। ১৮১৯ অব্দে মহারাষ্ট্রগণ ইংরাজ-বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত হইলে, বৃটীশ সেনা পুনরায় ইহা

অধিকার করেন কিন্তু দ্বাবিংশদিবসব্যাপী ভয়ানক যুদ্ধে বৃটীশসেনা ও সেনাপতিদিগকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের বহুসেনা ও সৈনিক-দলপতি নিহত হয়েন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। কিন্তু নানা কারণে পুনরায় গোয়ালিয়র-মহারাজের হস্তে আশীরগড় দুর্গ সমর্পণ করিতে ইংরাজেরা বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আশীরগড় পুনরাধিকার করিয়া স্থায়ী ভাবে ইহা ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। আশীরগড়ে এক্ষণে দুই দল দেশীয় সেনা এবং তিন দল বৃটীশ সেনা থাকে; জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। কিন্তু স্থানটি একেবারে নির্জ্জন। যদি রাজনৈতিক ভাবে বিবেচনা না করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে বিচার করা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, আশীরগড়ের ন্যায় নিভৃত পার্ব্বতীয় স্থান, তপস্বী মহাপুরুষদিগের যোগসাধনার জন্য সম্পূর্ণ রূপে উপযুক্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শিখ-সাধনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:o:—

ধ্বংসমুখে।

মোগলেরা কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ দুই শত বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। প্রথম পাদোণ দুই শত বর্ষ তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; স্বীয় ক্ষমতার প্রভাবে হিন্দুস্থানে এক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগলবংশ ক্রমে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। বাহাদুর শাহ সে ধ্বংস প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাবৃন্দ নিতান্ত উত্তেজিত থাকায় তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল; তার পর জাহান্দর শাহ বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া ধ্বংসের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দেন। ফিরুখসিয়র নিতান্ত দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও চঞ্চল-মতি নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব অত্যাচারে কলঙ্কিত। তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হোসেন আলি খাঁ ও আবদুল্লা খাঁর সাহায্যে সিংহাসনা-রোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের প্রতাপ অখণ্ড হইয়া উঠে, তাঁহাদের নিকট রাজা হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা বিলাসিতায় মগ্ন থাকায় সৈয়দেরা রাজ্যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকেন। রাজা ন্যায়ান্যায়বিচারের কষ্টস্বীকারে একান্তই পরাঙ্মুখ ছিলেন। তাঁহার নিজের কোন স্বাধীন মত ছিল না। যিনি সর্ব্বশেষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেন, রাজা তাঁহারই মতানুবর্ত্তী হইতেন।

সৈয়দদের কুব্যবহারে রাজপারিষদেরা অনেকেই তাঁহাদের শত্রু হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভ্রাতৃযুগলের পতনের জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানা কৌশলে রাজাকে আপনাদের দলে টানিয়া লইলেন। রাজাও তাঁহাদের পরামর্শে হোসেন আলিকে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তির গতিরোধ করিবার জন্য পাঠাইলেন। হোসেন রাজাদেশ মান্য করিয়া দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। তথায় মোগল-মহারাষ্ট্রে যথেষ্ট সংঘর্ষ হয়। বহুকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াও হোসেন হিন্দুশক্তি দমন করিতে পারিলেন না। তিনি মহারাষ্ট্ররাজ শাহুর সহিত একটি সন্ধি করিলেন। সে সন্ধিতে মোগলরাজের আত্মসম্মানে যথেষ্ট আঘাত পড়ে। হোসেন শাহুকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। কথা রহিল, শাহু দাক্ষিণাত্যের শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন।

ফিরুখসিয়র সৈয়দযুগলের বিপক্ষদলের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া হোসেন-কৃত সন্ধি অস্বীকার করিলেন। ইহাতে সৈয়দদের সহিত রাজার কলহ উপস্থিত হয় ও ফলে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দেরা প্রকাশ্যভাবে রাজ-বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হোসেন মহারাষ্ট্রপতি শাহুর নিকট ১৫ সহস্র (১) সৈন্য সাহায্য লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ মহারাষ্ট্র-সৈন্যের অধিনায়কত্বে বৃত হইয়াছিলেন।

১৭১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হোসেন সদলবলে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃযুগল সহজেই রাজপুরী দখল করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু

(১) শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত 'বাজীরাও' গ্রন্থে ১৫ সহস্রের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু অপর সকল ইতিহাসে দশ সহস্রের উল্লেখ আছে। সখারাম বাবু মারাঠী গ্রন্থাদি অবলম্বনে তাঁহার 'বাজীরাও' সংকলন করিয়াছেন। মারাঠা-ইতিহাসে মারাঠাদের কথা নিখুঁত সত্য হওয়াই সম্ভব।

রাজপুরীতে সহসা প্রবেশ করিতে পারিলেন না। রাজা সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে লুকাইয়া রহিলেন। তখন সৈয়দদের সৈন্যেরা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রতি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু রাজাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন সৈন্যেরা দ্বাররক্ষিণী রমণীদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। ফলে তাহাদের অনেকেই বাধ্য হইয়া রাজার গুপ্ত স্থান দেখাইয়া দিল। তখনই সৈন্যেরা সগর্ব্বে তথা হইতে রাজাকে টানিয়া বাহির করিল। তখন পুরাঙ্গনাগণ রাজার সাহায্যের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হইল, কিন্তু বৃথা। তাঁহাদের কাতর ক্রন্দনে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। সৈয়দদের পাষাণ-হৃদয় কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইল না। তাঁহারা রাজাকে বন্দী করিয়া এক কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। (১) তাঁহার

(১) Whilst the last message was delivering, a body of Afghan soldier mixed with some of the Vezir's slaves, had found means, from the top of the house of Nedjm-eddin-ally-qhan, younger brother to the Vezir, to descend with the yard of the Imperial women's apartmant, which was close to it, and which proved guarded by a number of Habeshinian, Georgian, and Calmuc women. These being driven away, the soldiers penetrated within the gate, and fell every apartment in search of Ferok syur. At last some women, *too delicate to bear the tortures to which they were exposed,* pointed to the place of his confinement, and the soldiers ran to him. At this sight, the Emperor's mother, with his consort and daughter, unable to endure such a spectacle, ran to his assistance with a number of Princesses, and ladies of the first rank, who having enclosed him within a circle which they formed round his person, fell to prayers and entreaties. But of what avail could be those tears with a troop of soldiers ? And in such a moment whose pity could they move ? At last, after a deal of struggle, he was disengaged from those women, dragged upon the ground, and confined in a dark small room on the top of the *Tinpôuliah* and all this with such outrages

দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করা হইল। তাঁহার আর কষ্টের পরিসীমা রহিল না। শেষে সৈয়দেরা তাঁহার আহার্য্যে বিষ মিশাইয়া তাঁহাকে ইহসংসার হইতে সরাইয়া ফেলিলেন।

ফিরুখসিয়রের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করা হয়, ইতিপূর্ব্বে রাজ-দেহের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে আর কেহই কখন সাহস করে নাই। সৈয়দদের এরূপ দুর্ব্যবহারে মোগলরাজ্য নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। হিন্দুশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ফিরুখ সিয়য়ের পর রফিউলদরজৎ ও রফি-উদ্দৌলা একে একে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা নামসর্ব্বস্ব রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। সৈয়দেরাই প্রকৃত পক্ষে দেশের রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নৃপতিদ্বয় উভয়েই তিন তিন মাস রাজ্য করিয়া ইহ লীলা সাঙ্গ করেন। অতঃপর মহম্মদ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

প্রজাবৃন্দ সকলেই সৈয়দদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের বিদ্রোহে সাহায্য করায়, তাঁহারা সে সাহায্যের প্রতিদান স্বরূপ মহারাষ্ট্রদিগকে কতকগুলি অধিকার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে দিল্লী-বাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে ও মারাঠাদিগকে আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষে প্রায় ১৫ পনের শত মারাঠা হত হয়। সৈয়দেরা অর্থদান করিয়া ক্ষতি-পূরণ করিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তাঁহারা মহারাষ্ট্রদিগকে একটি সনন্দ দিলেন। সে সনন্দে মহারাষ্ট্র-রাজ্যের স্বাধীনতা, দক্ষিণাত্যের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব স্বীকৃত হইল। মহারাষ্ট্রেরা সানন্দে দাক্ষিণাত্যে

and such indignities as had never been offered to the Imperial person.—The Seir-Mutaquherin. p. 135. ফিরুখসিয়র একটা ছাদে লুকাইয়াছিলেন।

তিনপুলিয়া একটি সূচ্চ অট্টালিকা। ইহা কোন বাজারের মধ্যস্থলে অথবা কোন রাজপ্রাসাদ বা দুর্গের দ্বারদেশে নির্ম্মিত হয়। এইরূপ এক তিনপুলিয়ার শিখরস্থ এক অন্ধকারময় গৃহে সম্রাটকে অবরুদ্ধ করা হয়।

ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় মারাঠারা অম্বর, মারবার ও মিবার প্রভৃতি স্থানের রাণাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিত্রতাসূচক সন্ধি স্থাপন করে। (১)

মহম্মদ শাহ সৈয়দদের প্রভুত্বে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন ও কৌশল করিয়া ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে একেবারে দমন করেন। হোসেন হত ও আবদুল্লা বন্দীকৃত হন। মহম্মদ শাহের আমলে মোগল রাজত্ব আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। রাজ্যের সর্ব্বত্র অরাজকতা বিস্তৃত হয়। হিন্দুরা সকলেই মোগল-রাজত্বের উচ্ছেদের জন্য বদ্ধকর হয়। রাজপুতেরা মারাঠাদের সাহায্য গ্রহণে কৃতসংকল্প হন। ফলে মারাঠা-শক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। মোগলেরা মারাঠা-প্রতাপে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা মহারাষ্ট্র-শক্তি দমনের বৃথা যুক্তি করিতে লাগিল। এমন সময় পারশীকেরা প্রায় একরূপ বিনা বাধায় দিল্লী জয় করিয়া লইল। আমরা সে বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

পারস্যরাজ নাদির শাহ কাবুল জয় করিয়া তথায় সাত মাস অবস্থান করেন। এই সময় তিনি ভারতাভিযানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। মোগল রাজসভায় অনেক আমীরই গুপ্তভাবে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। (২) উদ্যোগ সমাপ্ত হইলে, তিনি জলালাবাদ অধিকার করিয়া

(১) দেউস্কর-প্রণীত 'বাজীরাও', ৫৫ পৃষ্ঠা।

(২) এই বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে অযোধ্যার নবাব সদাত আলির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি নিজে একজন পারশীক। ইনি নিতান্তই স্বার্থপর ছিলেন। কর্ণাল যুদ্ধে মহম্মদ শাহ পরাজিত হইলে, নাদিরের সহিত সম্রাটের এক সন্ধি হয়। তাহাতে নাদির দুই কোটি টাকা লইয়াই দেশে ফিরিতে সম্মত হইয়াছিলেন। নাদির ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ভারতাক্রমণ নিতান্তই নির্ব্বিবাদে হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ভারতবাসীরা তাঁহার গতিরোধে অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহার মনে কিছু আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। কিন্তু মহম্মদের আচরণে সে আতঙ্ক অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। এরূপ বাধা পাওয়ায় নাদির কিন্তু সদাত আলি প্রভৃতির উপর একটু বিরক্ত হন। তাহাতে সদাত আলি নাদিরের তৃপ্তির জন্য তাঁহাকে বলেন যে, এত সহজে তৃপ্ত হইবেন না। এক অযোধ্যা

পেশবারাভিমুখে অগ্রসর হন। এই সময় নসির খাঁন্ তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন। শিকার ও ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার দিন কাটিত। তিনি নাদিরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাজধানী হইতে বারংবার সৈন্য-সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু রাজসভার ওমরাহদের ষড়যন্ত্র-বলে তাঁহার সে প্রার্থনা প্রতিবারেই বিফল হইল। শেষে নসির খাঁ স্বীয় সাত সহস্র সৈন্য লইয়াই খাইবার গিরিবর্ত্ম বন্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু নাদির বারাকৃজি সর্দ্দার শরবার খাঁর সাহায্যে পুরাতন পথে (১) খাইবার অতিক্রম করিয়া অকস্মাৎ নসিরের সৈন্যাক্রমণ করিলেন। সামান্য যুদ্ধের পরেই নসির পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর এই ঘটনা ঘটে। অতঃপর নাদির পথি-পার্শ্বস্থ জনপদসমূহ মথিত করিতে করিতে বিনা বাধায় ইরাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলে, পঞ্জাবের শাসনকর্তা জকারিয়া খাঁ বিশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার গতিরোধে অগ্রসর হন। ফলে তথায় ১লা কি ২রা শওয়াল তারিখে উভয়ের যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে জকারিয়া খাঁ সম্পূর্ণ-ভাবে বিধ্বস্ত হন; তৎপক্ষীয় বহুসৈন্য এই আহবে দেহত্যাগে বাধ্য হয়। তখন খাঁ বাহাদুর দ্রুতপদে রণস্থল ত্যাগ করিয়া লাহোরে উপস্থিত হইলেন ও নগর রক্ষার জন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করিলেন।

ইহার কিছু পরে নাদিরও সসৈন্যে লাহোরের উপকণ্ঠে আসিয়া ছাউনি করিলেন। নাদিরের ভীমপ্রকৃতি ও অসীম বলবীর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া খাঁ বাহাদুর জকারিয়া খাঁ নগর রক্ষার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি অনেক চিন্তার পর রাজকোষ ও সহরস্থ ধনীদের নিকট হইতে বিশ লক্ষ মুদ্রা ও বহু সহস্র হস্তী সংগ্রহ করিয়া নাদিরের

হইতেই এই সামান্য অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। এবং তিনি সালঙ্কারে দিল্লীর রাজ-সম্পদের ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সে ব্যাখ্যা শুনিয়াই নাদির দিল্লী যাইতে সমুৎসুক হন।

(১) এই পথে তৈমুরলঙ্গ ভারতাক্রমণ করিয়াছিলেন।

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপঢৌকন দিলেন ও বশ্যতা স্বীকার করিলেন। জকারিয়া খাঁর এরূপ ব্যবহারে সে যাত্রা লাহোর রক্ষা পাইল। তখন নাদির পঞ্জাব-শাসনের বন্দোবস্তে মন দিলেন। জকারিয়া খাঁকে তিনি পূর্ব্বপদেই বাহাল রাখিলেন। নাদির, ফখরউদ্দৌলা আমীনউদ্দীন খাঁকে কাশ্মীরের সুভেদার নিযুক্ত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া কাশ্মীরে পাঠাইয়া দিলেন। লাহোরে অবস্থানকালে নাদির স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার নব-প্রস্তুত মুদ্রার এক পৃষ্ঠে 'সুলতান নাদির' ও অপর পৃষ্ঠে 'লাহোর রাজধানীতে প্রস্তুত। ১১৫১। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্যরক্ষা করুন।'—লেখা ছিল। (১) ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে নাদির লাহোর ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিপাশা নদীর তীরে আসিয়া নাদির একটি পৈশাচিক কাণ্ড করিলেন। পেশবার হইতে লাহোরে আসিবার কালে নাদির সহস্রাধিক লোককে বন্দী করিয়াছিলেন। এখন তিনি তাহাদের সকলকেই নৃশংসভাবে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। আদেশ তখনই প্রতিপালিত হইল। (২)

এই সময় সংবাদ পাইয়া, দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ নাদিরের গতিরোধের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কর্ণালে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ ঘটিল। তথায়

(১) He (Nadir) struck a gold coin at Láhore on the obverse of which was the inscription.........“Nadir, the Sultan,” and on the reverse.......“Struck at the capital of Láhore, 1151, May. God preserve his reign !”— Latif's The Panjab, p. 202. এক পৃষ্ঠে—“নাদির উল সুলতান।” অপর পৃষ্ঠে ছিল—“জরব দারুল সুলতানৎ লাহোর ১১৫১ খল্দ আল্লা মিক্কো।”

(২) On the bank of the Bias, the tyrant ordered one thousand and seven State prisoners, whom he had kept in close confinement during his journey from Peshawar to Lahore, to be inhumanly put to death. The order was promptly executed.— Latif.

ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে মোগলরাজ বিশেষরূপ পরাজিত হই-লেন। তাঁহার দশসহস্রাধিক সৈন্য এ যুদ্ধে হত হয়।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মোগলরাজের সকল উদ্যম নষ্ট হইল। তিনি শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধের পর তৃতীয় দিবসে মহম্মদ শাহ কতিপয় আমীর সমভিব্যাহারে নাদিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তথায় সন্ধির প্রস্তাব হইল। নাদির বলিলেন যে, যদি মহম্মদ তাঁহার এই অভিযানের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে সম্মত হন, তবে তিনি আর ভারতবর্ষ স্বাধিকারভুক্ত করিবেন না। মহ-ম্মদ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অতঃপর উভয় নরপতি দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া নাদির আপনার সৈন্যদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, যেন মোগল-রাজের প্রজাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা না হয়। আরও বলিলেন, এ আদেশ অমান্য করিলে, দোষীর কর্ণচ্ছেদ করা হইবে। নাদির মোগল রাজ-প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন।

দিল্লীতে আসিয়া নাদির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পঁচিশ (২৫) ক্রোর মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ রাজকোষ শূন্য করিয়া নাদিরের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেন। আমীর ওমরাহেরাও বাধ্য হইয়া নাদিরকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপহার দিলেন। নাদির অতি অল্পকাল মধ্যেই আশাতীত ধনের অধিকারী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যদের বেতন বহুদিন বাকি পড়িয়াছিল। নাদির এই অর্থ হইতে তাহাদের সে বেতন পরিশোধ করিলেন। (১)

নাদির দিল্লীর চারিদিকে স্বীয় পারসীক সৈন্যদিগকে পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। যে দিন তিনি দিল্লীতে আসেন, সে দিন মুসলমানের

(১) Latif.

ঈদ্ পর্ব্ব। সে পর্ব্ব উপলক্ষে দিল্লীর মসজিদে পারশ্যরাজ নাদির শাহের নামে 'খোতবা' পঠিত হইল। পরদিন নাদিরের জনৈক সৈন্তের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সমস্ত দিল্লী নগর পৈশাচিক তাণ্ডবের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ঈদের পর দিবস জনৈক পারশীক সৈন্য বাজারে যাইয়া কোন দোকানীর নিকট হইতে কতকগুলি কপোত জোর করিয়া কাড়িয়া লইল। ইহাতে উভয় পক্ষে যথেষ্ট কলহ উপস্থিত হয়। তখন দোকানী রাগের বশে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিল যে, নাদির শাহ দিল্লীবাসীদিগকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার সৈন্যদিগকে আদেশ করিয়াছেন। এই সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অসন্তুষ্ট দিল্লীবাসী এ সংবাদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এমন সময় জনরব উঠিল, নাদির শাহ ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। এ সংবাদে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। দিল্লীবাসীরা পারশীক সৈন্যদিগকে দলে দলে নিহত করিতে লাগিল। সে দিন পারশীকেরা কোনই উপদ্রব করিল না, নীরবে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। (১)

পরদিন প্রভাতে নাদিরশাহ উত্তেজিত নাগরিকদিগকে শান্ত করিবার জন্য অশ্বারোহণে চাঁদনী চকে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া নাগরিকেরা শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি রসনদ্দৌলা নামক এক নবনির্ম্মিত মস্‌জিদে গমন করিয়া মন্ত্রণায় রত হইলেন। এই সময় জনৈক নাগরিক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। গুলি তাঁহাকে না লাগিয়া তাঁহার এক পার্শ্বচরকে আহত করিল। সে ব্যক্তি নাদিরের চক্ষের উপর দেহত্যাগ করিল। এ দৃশ্য

(১) নাগরিকেরা রাত্রিকালে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করে। পারশীকদের এই বিপদের কথা সেই রাত্রিতে নাদিরকে জানান হয়। তাহাতে নাদির স্বীয় সৈন্যদিগকে সে রাত্রির জন্য কেবল আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, দিল্লীর এ হত্যাকাণ্ডে নাদিরের পূর্ব্ব হইতে ইচ্ছা ছিল না। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে এরূপ নৃশংসাচরণ করিতে হয়।

দেখিয়া নাদিরের জিঘাংসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সরোষে অসি কোষমুক্ত করিয়া সমগ্র দিল্লীবাসীকে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় সৈনিকদিগকে আদেশ করিলেন। তখন পারশীকেরা ভীম বিক্রমে দিল্লীবাসীদের উপর আপতিত হইল। নাগরিকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পারশীকেরা নির্ম্মমহৃদয়ে বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত জনবর্গকে নিহত করিতে লাগিল। প্রায় নয় ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। তার পর মোগলরাজ সাশ্রুলোচনে নাদিরের নিকটে ক্ষমাভিক্ষা করিলে, নাদির শান্ত হইলেন, হত্যাকাণ্ড ক্ষণকালের জন্য রহিত হইল। তখন নাদির যে সকল মোগল ওমরাহকে এই সব কাণ্ডের অধিনায়ক বলিয়া সন্দেহ করিলেন, নির্ব্বিচারে তাঁহাদের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। মোগলরাজ একটীও কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অতঃপর নাদিরের আদেশে দিল্লীর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং রীতিমত লুণ্ঠনকার্য্য আরব্ধ হইল। মোগল-রাজকোষ লুণ্ঠিত হইলে, নগরবাসীদের প্রত্যেকের গৃহ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অর্থের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকে অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়া হইতে লাগিল। যন্ত্রণা অসহ্য বিবেচনা করিয়া অনেকেই আত্মহত্যা করিল, অনেকে কূপমধ্যে লাফাইয়া দেহত্যাগ করিল, অনেকে গৃহে আগুন লাগাইয়া পুড়িয়া মরিল। এই সময় পারশীকদের অত্যাচারে সমস্ত দিল্লী বহ্নিমুখে ছারখার হইয়া গিয়াছিল। তিন ক্রোশ পরিমিত স্থান এইরূপ অত্যাচারে একেবারে জনশূন্য হইল। লক্ষাধিক লোক সে অত্যাচারে দেহত্যাগ করিল। (১)

এইরূপ লুণ্ঠনের পর নাদির মহম্মদ শাহকে দিল্লীর রাজতক্তে বসাইয়া রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। মহম্মদ শাহ নাদিরের করদ-রাজ-রূপে রাজ্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। (২)

(১) এই সময় নাদির সাত শত দিল্লীবাসীর নাক ও কান কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।
(২) শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত-প্রণীত 'মোগলবংশ'।

নাদির পঞ্জাব ও কাবুল পারস্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর সম্পত্তির সহিত জগদ্বিখ্যাত কহিনুর ও ময়ুরতক্ত (১) লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। নাদির রাজ্যে ফিরিয়া হিরতে এই ময়ুরতক্ত রক্ষা করেন। তদবধি ময়ুর-তক্ত 'তক্তি নাদিরি' নামে পরিচিত হইল। (২)

যাইবার কালে নাদির জকারিয়া খাঁর নিকট এক ক্রোর মুদ্রা চাহিয়া পাঠান। লাহোর রক্ষার জন্ত খাঁ বাহাদুর তথাকার ধনী ও নির্ধন সকল অধিবাসীকে আহ্বান করিয়া টাকার কথা বলিলেন। অচিরে কোটী টাকা সংগৃহীত হইলে সেই টাকা নাদিরের নিকটে কর স্বরূপ প্রেরিত হইল। জকারিয়া খাঁ মুলতানেরও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। কথা রহিল, তিনি প্রতিবৎসর ঐ প্রদেশের কর স্বরূপ বিশ লক্ষ টাকা পারস্ত-রাজদরবারে পাঠাইবেন।

নাদিরের আগমনকালেই তাঁহার অত্যাচারে লাহোর-পথ জনশূন্ত হইয়াছিল। তাই এখন নাদির সে পথ ত্যাগ করিয়া সিয়ালকোট হইয়া পারস্ত যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি সিন্ধুদেশ জয় করিয়া তথায় নব বার্ষিক উৎসব করেন। সে উৎসবে জকারিয়া খাঁ নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে নাদির মাস তিন চারি মাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি মোগলশক্তি সম্পূর্ণ চূর্ণ করিয়া দিয়া যান। তাঁহার

(১) তক্ত তাউস নামে ইহা পরিচিত, ছিল। এই সময় নাদির প্রায় ৮০ আশি কোটি টাকা নগদ ও প্রায় ৫০ পঞ্চাশ কোটি টাকার রত্নাদি লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

(২) আজিজ-উদ্দিন ঔরঙ্গজেবাত্মজ কামবক্সের পুত্র। আজিজের এক সুন্দরী কন্যার সহিত নাদির শাহের পুত্র নশরুল্লার বিবাহ হয়। দিল্লীর এই মহাশশ্মানে এই পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিবাহান্তে কয়দিন ধরিয়া জনহীন দিল্লীতে পারসীকেরা যথেষ্ট আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিল। এই সময় নাদির তাঁহার সৈন্যগণকে বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

আক্রমণের ফলে মোগল-রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য ও মোগল-সাম্রাজ্য নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা কার্য্যতঃ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া রাজকর পাঠান বন্ধ করিয়া দিলেন। মোগল রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এই সময় হইতে মোগল-রাজত্ব অতি দ্রুত ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নাদিরের ভারত ত্যাগের পর মোগল-রাজত্ব কার্য্যতঃ দিল্লীর নিকট-বর্ত্তী কতিপয় জিলাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিলেও চলে। সিন্ধুর পশ্চিমতীরভাগ সমস্তই পারশ্যরাজ গ্রাস করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মোগল-রাজত্বের কথা ইতিমধ্যেই উপকথা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ণাটের নবাব মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন না। দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্টাংশ মহারাষ্ট্রশক্তি ও নিজাম আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। ইতিপূর্ব্বেই গুজরাট ও মালব মহারাষ্ট্রীয়েরা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। রাজপুতনার রাজন্যবৃন্দ এখন অনেকটা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তেমন বলশালী নৃপতি বড় দেখা যাইত না। সে যাহা হউক, তাঁহারা কখন নামে মাত্র মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কখন বা তাহাও অস্বীকার করিতেন। ভারতবর্ষের মধ্যে অযোধ্যা ও বঙ্গভূমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। এই দুই স্থানের শাসনকর্ত্তারাও স্বীয় স্বীয় পদ বংশগত করিয়া নামমাত্র মোগলের অধীনতা স্বীকার করি-তেন। দিল্লীর আশে পাশে চারিদিকে নানা নূতন রাজ্য বিস্তৃত হইতে লাগিল। শিখেরা ক্রমশঃ পঞ্জাবে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। দিল্লী ও আগ্রা প্রদেশের অংশবিশেষে রোহিলা আফগানেরা স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আগ্রার অনতিদূরে জাঠেরা এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিয়া হিন্দুশক্তি জাগাইতেছিল।

এইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও আরও বাইশ বর্ষ কাল মোগল-রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল। তার পর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পানিপথের যুদ্ধের পর তাহার

ছায়া পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তার পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে মোগল রাজ-বৃন্দের কথা শুনা যায়, তাহা কেবল কথা মাত্রই। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহারা একেবারে ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়েন ও দেশে নূতন শক্তিসকলের আবির্ভাব ঘটে।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাদুপূজা।

—:*:—

বর্ষার অবিরল বারিধারায় পরিস্নাতা হইয়া, শ্যামা ধরিত্রীর মনোমোহিনী রূপচ্ছটা আজ যেন দ্বিগুণ বিভায় প্রস্ফুটিতা হইয়া উঠিয়াছে; স্নানান্তে ধরণী রাণী যেন তাঁর আর্দ্র মলিন বসনখানি পরিত্যাগ করিয়া, আজ নববস্ত্রে নবীন শোভায় দিক্ আলোকিত করিয়াছেন। নিদাঘ তপনের প্রদীপ্ত কিরণে পরিশুষ্ক মুমূর্ষুপ্রায় তরুরাজি, বর্ষার নবজীবনে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, পুষ্টশরীরে সমীরভরে ক্রীড়া করিতেছে; বিলুপ্ত চিহ্ন ভস্মীকৃত তৃণরাশি, পর্জ্জন্যের অমৃতসেচনে সঞ্জীবিত হইয়া, বসুধার শ্মশানদেহে তাঁহার বিগত নন্দনশ্রী পুনরানয়ন করিয়াছে এবং ক্ষুধাক্লিষ্ট কঙ্কালাবশিষ্ট পশুকুলের নয়নানন্দরূপে বিরাজ করিতেছে; শূন্যগর্ভ দীঘী, সরোবর এবং অদূর-প্রবাহিত দামোদর নদ, কূলপ্লাবী বারিরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া, জীর্ণশরীরে যৌবনশ্রী ধারণ করতঃ পবনোত্থিত তরঙ্গভঙ্গে ঢল ঢল করিতেছে; এবং তীরে তীরে দিকে দিকে দূরবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রচয় যেন ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়া, বায়ুবেগে আলোড়িত হইয়া, নীলাম্বুবক্ষে লীলাময়ী নীলোর্ম্মির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দূরে উন্নতশীর্ষ ধূসরবর্ণ 'পঞ্চকোট' গিরিশ্রেণী, তুষারশুভ্র জলদমালায় বিভূষিত হইয়া, এবং রবিকিরণে অসংখ্য হীরকখণ্ডে বিমণ্ডিত হইয়া, ভাবুক-হৃদয়ে কত অভিনব অপূর্ব্ব ভাব বিকাশ করিতেছে। চারিদিকেই কি-যেন-কি-এক বর্ণনাতীত নবভাব ও নবোৎসাহ পরিদৃষ্ট হইতেছে; সকলই সুন্দর, সুবিমল এবং অভিনব বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখিতে দেখিতে ভাদ্রের বিংশ দিবস অতীত হইয়াছে; গৃহবাসী প্রবাসী সকলেই সোৎসাহে মা আনন্দময়ীর শুভাগমনের দিন গণনায় রত হইয়াছে।

আজ, এই নবীনা প্রকৃতির ভাবময় আনন্দোৎসবের মাঝে, অনাবিল পল্লীবাসের পর্ণালয় হইতে সহসা এ কি আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল? কোথা হইতে এই উল্লাসের বিপুল প্রবাহ, সহসা শতমুখী হইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্লাবিত করিয়া তুলিল? কোন্ সদানন্দময়, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, শান্তিধাম হইতে, এই রোগশোকচিন্তাবিদগ্ধ, উদরান্ন-লালায়িত, কর-ভারাক্রান্ত, সদাসন্তপ্ত দীনভবনে, এরূপ সুখস্পর্শ সুশীতল আনন্দতরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিল?—ঐ শুন,—গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, নৈশসমীরণে অসংখ্য রমণীকণ্ঠে কি রমণীয় মধুর সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে! আ, মরি, মরি,—কি মধুর—কি মনোহর!—ঐ শুন,—অদূরবর্ত্তী লতাগুল্মবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র গৃহ হইতে কয়েকটি রমণী সমস্বরে গাহিতেছে।—

(গীত)

১

"জলেতে খেলো না ভাদু! জলে তোমার কি আছে,
মনকে বুঝে দেখ ভাদু! জলে শ্বশুর ঘর আছে।
সারা ভাদর রাখ্‌লাম মাকে, মা ব'লে তো ডাক্‌লে না,
যাবার বেলি ওড়ি * নিলে মা ছাড়া তো যাব না।" †

(গীত)

২

"কাশীপুরের মহারাজা, সে করে ভাদুপূজা,
থালে সাজা জিলিপি খাজা, হাতে দেয় ফুল বাতাসা।

* "ওড়ি"—যা'ন বা যান।

† গীতগুলির রচনাপারিপাট্য যদিও কিছুই নাই, তথাচ ইহা স্বভাবমধুর রমণীকণ্ঠে তানলয়সমন্বিত হইয়া গীত হইলে শুনিতে অতীব সুমিষ্ট বোধ হয়।

কোথা হ'তে এলে ভাদু ! , কোথা তোমার ঘরবাড়ী,

গাছতলাতে ব'সো ভাদু ! ডাল ভেঙ্গে বাতাস করি।"—

গাহিতেছে এবং মাঝে মাঝে সঙ্গীত-বিরামে মুক্তহৃদয়ের উচ্চ হাস্যে লতা-গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতেছে ; গাহিতেছে, হাসিতেছে আবার গাহিতেছে, আবার সেই উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতেছে ; হাসিতে হাসিতে কেহ ভূতলশায়িনী হইতেছে, কেহবা বিবশা বিহ্বলা হইয়া অন্যার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। স্ত্রীজনসুলভ সরমের নিষ্ঠুর বন্ধন শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া, অনন্তাকাশে মুক্তপক্ষা বিহঙ্গিনার ন্যায়, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বধূ, কন্যা,—সকলেই অসঙ্কোচে অবাধে এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে বালিকা এবং যুবতীগণেরই আনন্দ ও উৎসাহ অধিক।

প্রিয় পাঠক ! জানেন কি এ আনন্দোৎসব কিসের ? বোধ হয় আপনারা অনেকেই অবগত নহেন—ইহার নাম "ভাদুপূজা" ! 'ভাদু-পূজা' কি ? ইহা কি কোনও মেয়েলী ব্রত না কোনও শাস্ত্রসম্মত পূজারাধনা ?—না, ইহা কোনও মেয়েলী ব্রতও নহে বা কোনও শাস্ত্র-সঙ্গত দেবারাধনাও নহে। তবে এটা কি ?—তদুত্তরে এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে যে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাহাই এস্থলে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। *

মানভূম প্রদেশে ভারতেতিহাসে প্রখ্যাতনামা এক রাজবংশ আছে। এই প্রদেশে অবস্থিত 'পঞ্চকোট' † নামক দূরব্যাপী গিরিশ্রেণীর নামানু-

* অনুসন্ধান এবং গবেষণাদ্বারা যতদূর অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই এ প্রবন্ধে বর্ণিত হইল। ইহার স্থলবিশেষে মতভেদও আছে ; কিন্তু এক্ষণে যেরূপ আমরা চক্ষে দেখিতেছি এবং প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মুখে যাহা শুনিতেছি, তাহাই আমরা গ্রহণ করিলাম।

† 'ঐতিহাসিক চিত্রে' প্রকাশিত 'কল্যাণেশ্বরী' নামক প্রবন্ধে, উক্ত পত্রিকার মান্যবর সম্পাদক মহাশয়, এই 'পঞ্চকোট' স্থলে 'পঞ্চকুট' লিখিয়াছেন। এ প্রদেশে লোকমুখে সাধারণতঃ 'পঞ্চকোট' শব্দই শুনা যায় বলিয়া আমরা 'পঞ্চকোট'ই লিখিলাম।

সারে উক্ত বংশোদ্ভব নৃপতিবৃন্দ, 'পঞ্চকোট্টাধিপতি' নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের রাজবাটী এক্ষণে এই পঞ্চকোটেরই অনতিদূরে 'কাশীপুর' নামক গ্রামে। ইতঃপূর্ব্বে এই দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-প্রাকারের অভ্যন্তরেই ইঁহাদের সুদৃঢ় দুর্গবাটী বিরাজিত ছিল ; এই গিরিদুর্গ বহুদিবস পর্য্যন্ত, পররাজ্যাপহারী ছলচাতুরী-বিশারদ বিধর্ম্মিগণের ঋষ্যমূক পর্ব্বতস্বরূপ হইয়া, তাহাদের পাপস্পর্শ হইতে অব্যাহতিলাভ করতঃ, গর্ব্বোন্নত মস্তকে আপনার মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং শত্রুহৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই রাজবংশের বহুল বীরত্বগাথা এবং দেবোচিত কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি এতদ্দেশে প্রতিগৃহে প্রবাদবাক্যরূপে প্রচলিত আছে *; এবং পঞ্চকোট-গিরিগর্ভে তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যবীর্য্যের বহুবিধ নিদর্শন অদ্যাবধি সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদিও ইঁহাদের শ্রীসম্পদ এক্ষণে কালপ্রভাবে অনেক হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাচ ইঁহাদের যশোগৌরব এখনও এ প্রদেশে প্রায় সমভাবেই বিঘোষিত হইতেছে। এই মহাবংশেরই স্বর্গগত দানশীল মহারাজ নীলমণি সিং বাহাদুরের † 'ভাদু' নামে (ইহা আদরের নাম, প্রকৃত নাম 'ভদ্রা') একটি পরমাসুন্দরী শিশুকন্যা ছিল। এই কন্যাটি মহারাজের প্রাণাধিক-প্রিয়তমা ছিল। বিশালবপু বনস্পতির সুশ্যামল পত্রপল্লবের মধ্যবর্ত্তী, নয়নমোহন অতিক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছটির ন্যায়, এই অতুলরূপলাবণ্যবতী সুকুমারী কন্যারত্নটি সর্ব্বদা নৃপবরের অঙ্কমধ্যে স্থানলাভ করিয়া—কি অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে—কি বহুজন-সমাকীর্ণ রাজসভায়—সর্ব্বস্থলেই দর্শকবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিত। কিন্তু, হায়, কালের কঠোর বিধান! যেখানেই কেন একটি সুন্দরতম বস্তু, সংসারের

* অবশ্য প্রত্যেক বস্তুরই সোজা এবং উল্টা পিঠও আছে।

† সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোন কারণবশতঃ ইনি কোম্পানি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহার সমসাময়িক তাৎকালিক বর্দ্ধমানাধিপতির দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। প্রায় শতাধিক বৎসর বয়ঃক্রমে, ন্যূনাধিক ৩।৬ বৎসর হইল, ইনি (উক্ত নীলমণি সিং বাহাদুর) ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার পৌত্র এখন বর্ত্তমান রাজা।

বিবিধ অশান্তিপূর্ণ কণ্টকাকীর্ণ,জঞ্জালের মাঝে অতি ক্ষীণ একটু সুখের আলোক প্রসারিত করে, সেইস্থানেই সর্ব্বনাশী সর্ব্বগ্রাসী মহাকাল বিদ্যুদ্-বেগে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিমিষমধ্যে সেই বড় সাধের সুন্দর বস্তুটিকে আপনার চির-অতৃপ্ত বিশাল উদরে প্রেরণ করে !—এ স্থলেও তাহাই ঘটিল ;—

সহসা বিশাল রাজপুরী সুগভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া, সেই করাল কালের কঠোর হস্ত মহারাজের বড় আদরের কন্যারত্নটিকে অকালে তাঁহার অঙ্ক হইতে কাড়িয়া লইল ! নিদারুণ কীটদন্তে কর্ত্তিত হইয়া, বনশোভা সুন্দর কুসুমটি কোরকেই শুখাইয়া পড়িল ! মহারাজ কন্যা-শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ আনন্দময় রাজভবন, অন্ধতম জনশূন্য মহারণ্যসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ করা, তাঁহার আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধব-গণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে, তিনি তাঁহার বিষম-বাত্যাবিক্ষোভিত, শোকসন্তপ্ত, অশান্ত হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে শান্ত-করণাভিলাষে, এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিলেন ; তিনি তাঁহার প্রজা-গণমধ্যে প্রচার করিলেন যে ;—"আমার প্রাণাধিকা কন্যা 'ভাদু' মাতার স্মরণার্থ, আমার পুত্রোপম প্রজাগণ, আপন আপন গৃহে এক একটি মৃন্ময়ী বালিকামূর্ত্তি রচনা করতঃ, তাহাকে পুষ্পপত্র অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত করিয়া, যথাসাধ্য বিবিধ উপচারে তাহার পূজা করিবে এবং এই পূজা উপলক্ষে সকলে স্ব স্ব আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবাসীপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া গীতবাদ্য প্রভৃতির দ্বারা যথাসম্ভব আনন্দ করিবে। এই পূজার নাম 'ভাদুপূজা' হইবে ; এবং প্রতিবৎসর এই ভাদ্রমাসে * এই পূজা উপলক্ষে গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব হইবে।"—এই প্রকার আদেশ প্রচার করতঃ,

* তাঁহার কন্যা 'ভাদু', ভাদ্রমাসেই তাঁহার অঙ্ক শূন্য করিয়াছিল।

তিনি আপনার রাজভবনেও তাঁহার অকালমৃতা প্রাণপ্রতিমা দুহিতা 'ভাদু' মাতার এক অপূর্ব্ব বর্ণবিচিত্র মহীময়ী মূর্ত্তি রচনা করাইয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোৎসবের সূচনা করিলেন। শোকদুর্ভর নীরবতা ভেদ করিয়া, সহসা রাজপুরে উৎসবের উচ্চ কোলাহল উত্থিত হইল; বিবিধ ভোজ্যবস্তু ও অর্থাদি, দীনদরিদ্র ও দাসদাসী-পরিজনগণ-মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইতে লাগিল; এবং গীতবাদ্যের মধুর নিনাদে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজাদেশে, রাজভক্ত প্রজাবৃন্দও বিচিত্র পত্রপুষ্প ও চিত্রাদিতে গৃহদ্বার সজ্জিত করিয়া, এক একটি মৃন্ময়ী 'ভাদু' মূর্ত্তি স্থাপিত করিল এবং এই আনন্দোৎসবে যোগ দিল; গৃহে গৃহে নব নব গীত রচিত হইয়া, 'ভাদু' মাতার উদ্দেশে গীত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এমতে তাহারা কয়েকদিবস এই আনন্দোৎসবে অতিবাহিত করিল; এবং শেষ দিবস (অর্থাৎ ভাদ্রসংক্রান্তির দিবস) চতুর্গুণ আমোদ আহ্লাদে নিশি যাপন করিয়া, পরদিবস প্রভাতে 'ভাদু'-প্রতিমা বিসর্জ্জন করিল। এইরূপে এই অভিনব 'ভাদুপূজা' নৃপবরের সুবিস্তৃত রাজ্যখণ্ডমধ্যে প্রচলিত ও প্রচারিত হইল। তৎকাল হইতে এতদঞ্চলে অদ্যাবধি উহা প্রায় সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

এদেশে * 'ভাদুপূজার' খুব ধুম। ইতঃপূর্ব্বে ইহা ভদ্র এবং অভদ্র উভয় সমাজমধ্যেই তুল্যরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল; এক্ষণে কোনও কোনও স্থলে ভদ্রসমাজ 'সভ্যতালোক' প্রাপ্ত হইয়া, আর পূর্ব্বের ন্যায় অসঙ্কোচে ইহাতে যোগ দান করিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু, এখনও অধিকাংশ স্থলে ভদ্রমহিলাগণও দলবদ্ধা হইয়া, ভাদু-প্রতিমা বেষ্টন করতঃ, সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে 'ভাদুগান' গাহিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা স্ত্রীলোক-

* এ দেশ—অর্থাৎ মানভূম এবং দামোদর, বরাকর ও অজয় নদত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী রাণীগঞ্জ—যে সকল ভূমি উক্ত পঞ্চকোটাধিপতি নৃপতিবৃন্দের অধিকারভুক্ত ছিল। (এক্ষণে ইঁহাদের অনেক ভূসম্পত্তি অন্যান্য জমিদারগণের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে)।

দিগেরই 'পরব' বা উৎসব। যে দিন হইতে যে গৃহস্থের গৃহে ভাদু-প্রতিমা স্থাপিত হয়, সেই দিন হইতে প্রতি রজনীতেই সেই গৃহস্থ এবং তৎসমীপস্থ রমণীগণ ভাদু-প্রতিমার নিকট একত্রিত হইয়া, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত 'ভাদুগান' গাহিয়া থাকে। এই পূজা যে প্রতি বৎসর প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই হইয়া থাকে, তাহা নহে; যদৃচ্ছাক্রমে, যে বৎসর যাহার ইচ্ছা, ইহা করিয়া থাকে; তবে, ইহা অধিকাংশ গৃহেই প্রতিবৎসর দেখিতে পাওয়া যায়। যে গৃহে বালকবালিকা এবং যুবকযুবতীর সংখ্যা অধিক, বলা বাহুল্য, সেই স্থলেই ইহার জাঁকজমকও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই পূজার কোনও বিধি-নিয়ম বা তন্ত্রমন্ত্র নাই; সুতরাং শাস্ত্রসম্মত ব্রত-পূজার ন্যায় ইহাতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না। গৃহাঙ্গনাগণ আপন আপন অভিলাষ ও অভিরুচি মত পুষ্পাদিদ্বারা স্ব স্ব মৃৎপুত্তলীগুলিকে বিভূষিত করে, তাহাকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যসামগ্রী উপহার প্রদান করে এবং তাহার নামে বিবিধ ভাবের ও রসের গীতালাপ করিয়া, তাহার পূজার্চ্চনা সমাপ্ত করে।

স্থানীয় কুম্ভকার বা ছুতারমিস্ত্রীদের বাটীতে, ভাদ্রের প্রথম হইতে, বিবিধবর্ণবিচিত্র, বিবিধ আকারের ও বিবিধ মূল্যের ভাদু-মূর্ত্তি সকল ক্রেতা-গণের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। গৃহস্থেরা নিজ নিজ পছন্দ ও সঙ্গতি-মত ঐ সকল মৃন্ময়মূর্ত্তির এক একটি ক্রয় করিয়া আনে এবং আপনাদের গৃহমধ্যে স্থাপিত করে। * এই পূজা ভাদ্র মাসে যাহার যে দিন ইচ্ছা আরম্ভ করিতে পারে; কিন্তু, উৎসব বহুদিনব্যাপী হইলে, তাহাতে আর সে আনন্দ এবং মত্ততাটুকু থাকে না বলিয়া, সচরাচর ইহা সংক্রান্তির ২।৫ দিবস থাকিতেই আরম্ভ করা হয়। সংক্রান্তির দিবসই ইহার প্রকৃত

* এই সকল ভাদু-মূর্ত্তির মূল্য সচরাচর ৮/১০ আনা হইতে ৪।৫ টাকা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎসব, ঐ দিবসকে 'জাগরণ' কহে, কারণ ঐ দিবস সকলেই বিবিধ আমোদ-প্রমোদে ও সঙ্গীতালাপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করে। যাহারা উৎসবে যোগদান না করে, গীতধ্বনিতে এবং আনন্দকোলাহলে, তাহাদেরও সে রজনী প্রায় অনিদ্রাতেই কাটে। বালিকাসুলভ উচ্চহাস্তে ও স্বভাব-মধুর মুগ্ধকর বামাকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত-তরঙ্গে সমগ্র গ্রামপল্লী সঞ্চালিত হইয়া উঠে এবং সকলকেই কিঞ্চিদধিক সচঞ্চল করিয়া তুলে।

এই 'জাগরণের' পরদিবসই প্রতিমার বিসর্জ্জন। শুভাশ্বিনের প্রথম দিবসে, অতি প্রত্যূষে, স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা, যুবকযুবতী—সকলে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া, ভাদুর বিসর্জ্জন গাহিতে গাহিতে আপন আপন প্রতিমাগুলিকে নিকটস্থ নদী বা সরোবর-তীরে আনীত করে; তথায় সেই মূর্ত্তিগুলিকে পরিবেষ্টন করতঃ, তাহারা পুনরায় কিছুক্ষণ সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে গীত গাহে; এবং সর্ব্বশেষে সেই সুন্দর সাধের মৃন্ময়ী মূর্ত্তিটি সলিলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া স্নানান্তে পূর্ব্ববৎ গীত গাহিতে গাহিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

এই সখের পূজার বা 'পরবের' সঙ্গীতই তন্ত্রমন্ত্র ও প্রধান অঙ্গ। অদ্যাবধি নানাভাবের ও সুরের ভাদু-গীত প্রচুর পরিমাণে রচিত হইয়া, বংশপরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সমস্ত গীতগুলি সংগ্রহ করিলে, একটি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। অনেক গীত আছে, যাহার অর্থ বা ভাব আদৌ বোধগম্য হইবার নহে; বোধ হয় মুখে মুখে গীত গুলি বিকৃত হইয়া গিয়াছে অথবা রচনাই ঐরূপ। এস্থলে আমরা আর একটি, ভাদুর বিসর্জ্জন-গীত পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিয়া এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

(গীত)

ইন্দ (?) এ'ল নিতে ভাদু,
কাপড় দিলি ধুতে গো।

ছাতা * এ'ল নিতে ভাদু
দরিয়া ঝাঁপ দিলি গো ॥
কোথা তুমি যাচ্ছ ভাদু
কাঁদায়ে মোদেরে গো।
ফিরে এস আবার ভাদু
ভাদর ফিরে এলে গো ॥

সমাপ্ত।

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

* 'ছাতা'—ইহাও এ দেশের একটি পরবের নাম। ইহাকে 'ছাতাপরব' কহে; ইহা সাঁওতালদের পরব; ভাদুর বিসর্জ্জনের দিবস এই পরব হইয়া থাকে। ইহা ৺ইন্দ্রদেবের উৎসব। (বোধ হয় 'ইন্দ' ও এই পরবেরই আর একটি নাম)। 'কলি-য়ারীতে এই ছাতাপরবে খুব ধূমধাম হইয়া থাকে। ইহা আরও অপূর্ব্ব ব্যাপার। এ সম্বন্ধেও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ধর্ম্মদাস মগ।

ব্রহ্মদেশীয়েরা সেকালের লোকের নিকট সাধারণতঃ মগ নামে পরিচিত ছিল। আধুনিক মগেরা শিষ্টশান্ত ও অনেকটা শান্তিপ্রিয় বলিয়া বোধ হয় কিন্তু পূর্ব্বে ইহাদের দৌরাত্ম্যে নিম্নবঙ্গের লোক সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকিত। মগগণ বৌদ্ধ কিন্তু তাহারা তাহাদের ধর্ম্মের মুল সুত্র "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" রূপ মহামন্ত্র ভুলিয়া গিয়া নৌকাপথে এ অঞ্চলে আসিয়া পৈশাচিক ব্যবহার করিত। এমন কোন পাপ কার্য্য ছিল না, যাহা করিতে তাহারা সঙ্কুচিত হইত। এমন কোন অখাদ্যই ছিল না, যাহা খাইতে তাহারা দ্বিধাবোধ করিত। তাহারা গ্রাম লুণ্ঠন করিত—লুণ্ঠনকার্য্যে বাধা পাইলে গ্রাম জ্বালাইয়া দিতে বা নরহত্যা করিতে পশ্চাৎপদ হইত না—বালক-বালিকা ও যুবকযুবতীদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্ম্মদাস নামক জনৈক মগনেতা ব্রহ্ম আরাকাণ হইতে আসিয়া গড়াইনদীর উৎপত্তিস্থলে খুলুমবাড়ী প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম দখল করিয়া লইয়া—আধিপত্য করিতে থাকেন। তাঁহার শাসনাধীন মৌজা সমূহই কালে "মগ-জায়গীর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে কুটবুদ্ধি আরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন—বঙ্গদেশ তাঁহারই শাসনাধীন ছিল। ধর্ম্মদাস কতিপয় গ্রাম দখল করিয়া স্বাধীন ভাবে তাহা শাসন করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া আরঙ্গজেব বাঙ্গলার তদানীন্তন নবাবের উপর বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য এক হুকুম-নামা জারি করিলেন। বাঙ্গলার নবাব যে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন

তাহা নয়—সৈন্যসামন্ত অবশ্য তাঁহার কম ছিল না; কিন্তু চতুরতায় ও ক্ষিপ্রকারিতায়—ইনি ধর্ম্মদাসের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না বলিয়া, এতদিন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সম্রাটের আদেশ পাইয়া নবাব বুঝিলেন, ব্যাপার অনেক দূর গড়াইয়াছে—যে কোন উপায়েই হউক এখন ধর্ম্মদাসকে দমন করি-তেই হইবে—নতুবা তাঁহার নিজেরই সমূহ বিপদ। নবাব এবার বিপুল আয়োজনে, বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া, ভীমবিক্রমে বিদ্রোহীকে আক্রমণ করিলেন। এবার ধর্ম্মদাসের ক্ষিপ্রকারিতায় বা চতুরতায় কোনও ফল হইল না—তিনি পরাজিত হইয়া নবাব-সৈন্য-হস্তে ধৃত ও বন্দী হইলেন।

যথাসময়ে ধর্ম্মদাসের বন্দী হওয়ার সংবাদ সম্রাট্-সকাশে প্রেরিত হইলে, সম্রাট্ বলিয়া পাঠাইলেন যে, ধর্ম্মদাস যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া সুপবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তবে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে—ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে বিদ্রোহী উপযুক্ত শাস্তি পাইবে। সম্রাটের আদেশ ধর্ম্মদাসকে জানান হইলে অনন্যোপায় ধর্ম্মদাস প্রাণভয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিজাম শাহ নাম ধারণ করিলেন। সম্রাটের অভিপ্রায়ানুযায়ী নবাবও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া খুলুমবাড়ী, খড়েরা, চামটালপাড়া প্রভৃতি তাঁহারই পূর্ব্বশাসিত মৌজাগুলি জায়গীরস্বরূপ প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন।

নিজামশাহ অনেক দিন পর্য্যন্ত জায়গীর ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগণ এবং পরে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ নাদির, মহম্মদ শাহ, হালিম শাহ, এই জায়গীরের মালিক হন। এই সময় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের খরদৃষ্টি এদিকে পতিত হইল—ফলস্বরূপ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন জায়গীরদার আরমান শাহ ও ভিকন শাহ সম্পত্তিচ্যুত হইলেন—মোগল সম্রাটের প্রদত্ত জায়গীর ইংরাজ-গভর্ণ-

মেণ্টের খাস শাসনাধীনে আসিল। সম্পত্তি হারাইয়া আরমান ও ভিকন বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের দুরবস্থার কথা শুনিতে শুনিতে অবশেষে ইংরাজ-সরকারের মতি একটু ফিরিল—খাস জায়গীরের আয় হইতে বিত্তচ্যুত হতভাগ্যদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করা স্থির হইল। কিন্তু এসময়ে আরমান এবং ভিকন উভয়েই বৃটিশ-সিংহের অনুগ্রহনিগ্রহাতীত লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। ভিকনের পুত্র গোলাম হায়দার গভর্ণমেণ্টের সাহায্যভোগী হইয়াই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশধরেরা এখন যশোহর এক্তিয়ারপুরে বাস করিতেছেন তাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

কীর্ত্তিমন্দির।

রাজস্থানের ইতিহাস—বীরত্বের ইতিহাস, স্বদেশ-হিতে আত্মোৎসর্গের ইতিহাস, রাজপুত-নারীর—সতীত্ব ও মহাপ্রাণতার অলৌকিক কীর্ত্তি-মন্দির। রাজপুতনার কত শত নরনারী স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে জীবনাহুতি দান করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তাহাদের সকলের পরিচয় জানিয়া উঠিতে পারে নাই। গ্রীস্-বীর লিয়োনিডাসের বীরত্বের ন্যায় রাজপুতনার প্রত্যেক গিরি শৃঙ্গই লিয়োনিডাসের বীরত্ব-বিলসন-ভূমি থার্ম্মোপলি-সদৃশ। কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাসেই এরূপ ধারাবাহিক অদ্ভুত বীরত্ব ও স্বদেশ-প্রেমিকতার একত্র সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয় না। রাজপুত-বীরগণের এই অমানুষ প্রতিভা ও স্বদেশ-প্রেমের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে কতদিন অশ্রু-প্রবাহে উপাধান সিক্ত হইয়াছে, আবার মোসলমান সম্রাট্‌গণের জঘন্য পাশবিকতার পরিচয়ে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও পাঠের নেশা টুকু ছুটে নাই।

এই সকল বীরপুরুষগণের চরিত্র-গাথা সাধারণ্যে বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে ও স্বদেশবাসীর নিকট স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রেমের মহিমা প্রোজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধাস্পদ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় মিবারের কতিপয় স্বাধীন রাজার জীবনী অর্থাৎ বাপ্পারাউল হইতে বীর-কেশরী প্রতাপ-তনয় অমরসিংহ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যবর্ত্তী প্রসিদ্ধ রাণাগণের কাহিনী "কীর্ত্তিমন্দির" নামক পুস্তকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু অমরের পরেও বহুতর মিবার-রাণার বীরত্ব-গৌরবে মাড়বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই মোসলমানগণ ভারতে

স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত হন। কাযেই ঐ সময় হইতেই মিবার-ইতিহাস হিন্দু-মোসলমানের বিবাদ-বিসম্বাদে পরিপূর্ণ। এতদিনের পর পুনরায় সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে দেখিয়া, মোসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ যেন লেখককে মোসলমান-বিদ্বেষী বিবেচনা না করেন। স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের বীরত্ব-কাহিনী ও স্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস বর্ণন করাই আমার এ উদ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য। ভরসা করি দেশমধ্যে আজ যে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই মৃদুমন্দ মারুত-হিল্লোলে স্বদেশের এই পুণ্যকাহিনী প্রত্যেক দেশবাসীর কুঞ্জ-কুটীরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ এবং কর্ত্তব্য-প্রণোদিত করিয়া তুলিবে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহাত্মা টড্‌কৃত রাজস্থানের ইতিহাস অবলম্বনে বাপ্পারাউল হইতে অমরসিংহ পর্য্যন্ত মিবার-রাণাগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে অমর-তনয় রাণা কর্ণ হইতে রাজপুতগণের সহিত ইংরেজ-রাজের মিত্রতা-স্থাপন-সময় পর্য্যন্তের মিবারের ইতিহাস ও রাণাগণের জীবনী প্রথমতঃ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া পরে মাড়বার, বিকানীর, হারাবতী, কোটা, যশল্মীর, জয়পুর ও শিখাবতী প্রভৃতি রাজস্থানের সমগ্র দেশের বীরগণের পুণ্য বীরগাথা আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। এক্ষণে বামনের উচ্চবৃক্ষ-শিরস্থিত ফললাভের প্রয়াসের ন্যায় এই অক্ষম লেখকের আন্তরিক ও অনুরাগাত্মিকা প্রচেষ্টা উপহাসাস্পদ হইবে কি না, সুধী পাঠকবৃন্দই তাহার বিচারকর্ত্তা।

রাণা কর্ণ।*

অমরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণ পিতৃ-বিয়োগের পর ১৬৭৭ সংবতে (১৬২১ খৃষ্টাব্দে) রাণা উপাধি ধারণ করিয়া মিবার-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সেই দিন হইতে মোগল-দরবারে জ্যেষ্ঠপুত্র প্রেরণের হীন দায় হইতে অমরসিংহের বংশধরগণ অব্যাহতি লাভ করিলেন।

বীরপ্রসূ মিবার পূর্ব্ব-গৌরব-গরিমা হইতে এক্ষণে বঞ্চিত। মোগল-মার্ত্তণ্ডের অমিত বিক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া মিবার এখন সামান্য উল্কাপিণ্ডের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে শৌর্য্য ও বীর্য্যপ্রভাবে সূর্য্যবংশাবতংস বাপ্পা-রাউলের বংশধরগণ সকলের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন, আজি মোগল-রাহুর করাল গ্রাসে তাঁহারা সে স্থানভ্রষ্ট। মিবার-বীরগণ বংশানুক্রমিক শৌর্য্য, বীর্য্য, শক্তি সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যে দিন হইতে সৌরাষ্ট্রের উন্নত শীর্ষে বীরকেশরী নরপতি কনক সেনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হয়, সেইদিন হইতে সার্দ্ধেক সহস্র বৎসর কালচক্রের আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইল; এই আবর্ত্তনকালমধ্যে মিবারবাসিগণের অদৃষ্টচক্র যে দশায় উপনীত হয়, তাহা স্মরণ করিলেও স্তম্ভিত, বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

রাজপুত-চরিত্রের যাহা প্রধান অলঙ্কার,—গাম্ভীর্য্য, রণপাণ্ডিত্য, বীর্য্যবত্তা, শ্রম-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সমস্ত গুণেই রাণা কর্ণ অলঙ্কৃত ছিলেন। এইরূপ সর্ব্বগুণের অধিকারী হইয়াও যে, তিনি নীরবে মোগল-বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, মোগল-সম্রাট্-ঘোষিত 'জায়গীর' অভিধায় মিবারকে অভিহিত করিতে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না, তাহার কারণ—

* রাজস্থানের বঙ্গানুবাদসমূহের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুবাদই অধিক অনুসৃত হইয়াছে।

তাঁহার অদ্বিতীয় কর্ত্তব্য-বোধ এবং বিচার-ক্ষমতা। মোগল-বাদশাহ কর্ত্তৃক মিবার 'জায়গীর' আখ্যায় পরিচিত হইলেও, মিবারাধিপতিগণ জায়গীরদার-স্বরূপ বিবেচিত হইতেন না। পরন্তু দিল্লীশ্বরের একান্ত বিশ্বাসী এবং পরম মিত্র সুহৃদ্রূপে অভ্যর্থিত এবং সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন প্রাপ্ত হইতেন। তাদৃশ সরল ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে, দেশের শান্তি বিনষ্ট হইবে এবং নিজের যেরূপ সৈন্যবল তাহাতে মোগল-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেই যে জয়লাভ করিবেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সুচতুর রাণা উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করতঃ সেই সঙ্কট-সময়ে শিশোদীয় বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। দেশ কাল অবস্থা বিবেচনায় রাণার এই নীরবতাই দেশের মধ্যে মঙ্গলবারতা আনয়ন করে এবং রাণার ভবিষ্যজ্ঞান-চিন্তন-ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

রাণা অমরসিংহ নিরন্তর যবন-সংগ্রামে লিপ্ত থাকায়, রাজ-কোষ শূন্য হইয়া পড়ে। রাণা কর্ণ যৎকালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তৎকালে রাজ-কোষ একরূপ কপর্দ্দকবিহীন। নানা আলোচনার পর রাণা সুরাট প্রদেশ বীরবিক্রমে আক্রমণ করতঃ তথাকার ধনাঢ্য অধিবাসীদিগের সঞ্চিত বিপুল বিত্তভাণ্ডার করায়ত্ত করেন। এই বিজয়-লব্ধ অর্থেই রাজ্যের উপস্থিত অর্থ-কৃচ্ছ্রতা বিদূরিত হয়।

কনিষ্ঠ সহোদর ভীম।

রাণার কনিষ্ঠ সহোদর—ভীম। শিশোদীয় বংশে তৎকালে ভীমের তুল্য বীর অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইত। ভীম সম্রাট্-পুত্র ক্ষুরমের অকপট সুহৃদ্। পুত্রের অনুরোধক্রমে সম্রাট্ ভীমকে রাজোপাধির সহিত বুনাস্ নদীর তীরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র জনপদের আধিপত্য প্রদান করেন। তথায় তিনি রাজমহল নামে এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও রাজমহলের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পূর্ব্বাভাষ বুনাস্-তীরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভীম স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব, নির্ভীকচিত্ত এবং তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে স্ববশে রাখিবার জন্য সম্রাট্ নানাপ্রকারে তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু ভীম স্বীয় বীরত্ব ও পুরুষত্বের বিনিময়ে রাজোপাধি বা অন্য কোন রাজানুগ্রহ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠতনয় পারবেজ মিবারের প্রভূত অনিষ্টসাধন করায় এবং শিশোদীয় কুলের তথা সমগ্র রাজপুতজাতির সর্ব্বনাশ-সাধন-চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকায়, রাণা-সহোদর ভীম তাঁহাকে সাতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এহেন দেশশত্রু স্বজাতিবৈরীকে কে কবে রাজাসনে উপবিষ্ট দেখিতে ইচ্ছা করে? তাই ভীম পারবেজের পরিবর্ত্তে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র খুরমকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। খুরমও নানাপ্রকারে রাজপুতজাতির বন্ধু বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন। দিল্লীশ্বর ভীমের এই অভিসন্ধি জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে খুরম হইতে দূরান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে ভীমের হস্তে গুর্জ্জরের শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু ভীম প্রিয়বন্ধু খুরমের অভীষ্টসিদ্ধির সহায়তার নিমিত্ত সম্রাটের উক্ত আদেশ উপেক্ষা করতঃ দিল্লীতেই খুরমের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমস্ত পরামর্শ স্থির হইলে খুরম ভীমের সাহায্যে প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বিদ্রোহ-বহ্নিতে প্রথমেই পারবেজ-পতঙ্গ ভস্মীভূত হইলেন, তৎপরে সম্রাটের বিরুদ্ধে অসি উত্থিত হইল। খুরমের মাতামহ মাড়বাররাজ গজসিংহও গোপনে বিদ্রোহিদলের সহায়তা করিতে লাগিলেন। গজসিংহই একরকম এই বিদ্রোহিদলের নেতা এবং উদ্বোধন কর্ত্তা, কিন্তু সম্রাটের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ ভাব প্রদর্শন করিতেন। ভীমের নিকট তাঁহার এই লুকোচুরি-ভাব অসহ্য বোধ হইল। তিনি গজসিংহকে প্রকাশ্যে যোগদান করিতে নচেৎ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলেন। ভীমের এই গর্ব্বিত বাক্যে গজসিংহ মহা উত্তেজিত

দিল্লীর সিংহাসন।

হইয়া প্রথমেই স্বজাতির বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিলেন। অচিরেই উভয়-পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, কিন্তু ভীমের চির-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। প্রিয়বন্ধুকে দিল্লীর রাজ-সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, স্বজন-বৈরীর অস্ত্রাঘাতে সমর-ক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। দুইজন প্রিয়বন্ধু ও অপরামর্শদাতার মধ্যে একজন—খৈরার জনপদের অন্তঃপাতী সনওয়ারের শাসনকর্ত্তা শক্তাবৎ-সর্দ্দার মানসিংহও আহত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—পটবন্ধনী-সংলগ্ন। পরম মিত্র ভীমের মৃত্যুসংবাদ শুনিবামাত্র দন্তে দন্তে পেষণপূর্ব্বক ক্ষতাবরক বন্ধনাগুলি উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু অনন্ত আকাশে মিশাইয়া গেল,—বন্ধু-বিরহে তাঁহাকে আর অধিকদিন শোকাকুল রহিতে হইল না।

এদিকে সম্রাট্ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিলেন না; তিনি জয়পুরাধিপতিকে সৈন্যাপত্যে বরণ করিয়া বিদ্রোহদলনে অগ্রসর হইলেন। পিতাপুত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সমরক্ষেত্রে দর্শন দিলেন; কিন্তু ভীম স্বজন-কলহে নিহত এবং তদীয় সেনাদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় খুরম অভীষ্ট-সিদ্ধি-পক্ষে নিরাশ হইয়া স্বীয় সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁ সমভিব্যাহারে উদয়পুরে রাণার আশ্রয়ে পলায়ণপর হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

ঐতিহাসিক চিত্র।

অন্ধকূপ হত্যা।

(২)

গতবারে আমরা দেখাইয়াছি যে,. অন্ধকূপের আয়তন ও তাহাতে প্রবিষ্ট মৃত ও জীবিত লোক সংখ্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট চারিটী বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। তন্মধ্যে প্রথম আলোচ্য বিষয়টি এই যে, অন্ধকূপ হত্যা মানিয়া লইলে ও তজ্জন্য সিরাজ উদ্দৌলা দোষী কিনা ?

সকলেই অবগত আছেন যে, হলওয়েল সাহেব কর্ত্তৃক এই অন্ধকূপ হত্যা ভীষণ রূপে চিত্রিত হইয়াছিল, সেই হলওয়েল সাহেব সিরাজ উদ্দৌলা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন। আমরা প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতেছি—

হলওয়েল বলিতেছেন,—

"Before I conduct you into the 'Black Hole' it is necessary you should be acquainted with a few introductory circumstances. The suba and his troops were

in possession of the fort before six in the evening. I had in all three interviews with him, the last in Dorbar before seven, when he repeated his assurances to me, on the word of a soldier, that no harm should come to us, and indeed I believe his orders were only general, that we should for that night be secured and that what followed was the result of revenge and resentment in the breasts of the lower jemmuat duars, to whose custody we were delivered, for the member of their order killed during the seige".

ইহার ভাবার্থ এই—

অন্ধকূপের কথা লিখিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি ঘটনা জানা আবশ্যক। অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় নবাব ও তাঁহার সৈন্যগণ দুর্গ অধিকার করে। নবাবের সহিত আমার সেদিন তিনবার সাক্ষাৎ হয়। সাত ঘটিকার কিছু পূর্ব্বে দরবারে শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখনও তিনি বীর পুরুষের বাক্যে এই আশ্বাস দিলেন যে, আমাদের কোনও অনিষ্ট হইবে না। আমি বাস্তবিক এই বিশ্বাস করি যে, তিনি সাধারণ ভাবেই আদেশ দিয়া ছিলেন যেন আমরা পলায়ন করিতে না পারি। যাহারা দুর্গাবরোধের সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের সহচর নিম্নপদস্থ জমাদার বা সিপাহীগণের হস্তে পড়ায় তাহারা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য আমাদের দুর্গতি ঘটাইয়াছিল।

হলওয়েলের কথায় বুঝা যাইতেছে যে, সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহাদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আদেশ দেন নাই, কেবল মাত্র তাঁহারা পলায়ন করিতে না পারেন, এই রূপ আদেশই দিয়াছিলেন। কেবল জমাদারগণ এই অনর্থ ঘটাইয়াছিল। সুতরাং হলওয়েলের মতে সিরাজ-উদ্দৌলা অন্ধকূপ হত্যার জন্য দোষী নহেন। কিন্তু তিনি জমাদার বা সিপাহীগণকে যে কারণে দোষী বলিয়াছেন, তাহা আমাদের মতে

লয় না। সিপাহীগণ যে আপনাদের সাঙ্গগণের হত্যার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য ইংরেজদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহা সম্ভবপর নহে। কলিকাতা দুর্গে অন্ধকূপেই কারাগার থাকায় তাহারা তথায় বন্দীদিগকে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল।

হলওয়েল সাহেব তাঁহার অন্ধকূপ হত্যার বর্ণনা পত্রে সিরাজ উদ্দৌলাকে দোষী না করিলেও অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি স্তম্ভে তিনি সিরাজের প্রতি দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই; তাঁহার স্থাপিত স্মৃতি স্তম্ভে লিখিত ছিল,—

* * * 123 persons were by the violence of Suraj-ud-Doula, suba of Bengal suffocated in the Black Hole prison * * * অর্থাৎ বাঙ্গলার সুবাদার সিরাজ উদ্দৌলার অত্যাচারে ১২৩ জন অন্ধকূপে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, যে হলওয়েল বর্ণনা পত্রে সিরাজ উদ্দৌলাকে দোষী করেন নাই, এক্ষণে তিনি সিরাজের অত্যাচার কথাটি খোদিত করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা উপরোক্ত কথা কয়টি হইতে সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। সুখের বিষয় লর্ড কর্জ্জন তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ স্থাপনকালে হলওয়েলের স্মৃতিলিপির সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিতেছেন,—

"Holwell's inscriptions, written by himself with memory of that awful experience still fresh in his mind contained a bitter reference to the personal responsibility for the tragedy of Suraj ud-Dowlah, which I think is not wholly justified by our fuller knowledge of the facts, gathered frem a great variety of sources, and which I have therefore struck-out as calculated to keep alive feelings that we would all wish to see die".

অর্থাৎ হলওয়েলের মনে সেই ভয়াবহ কষ্টভোগের স্মৃতি জাগরূক

থাকিতে থাকিতে তিনি স্মৃতি স্তম্ভে স্বয়ং উহা লিখিয়া ছিলেন। তাহাতে অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধে সিরাজউদ্দৌলার ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা একটু রূঢ় ভাবে লিখিত হইয়াছিল, আমার বিবেচনায় আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ঘটনা পরম্পরায় যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে হলওয়েলের ঐরূপ নির্দ্দেশ সম্পূর্ণরূপে ন্যায় সঙ্গত নহে, আমি সেই জন্য তাহা কাটিয়া দিয়াছি।

কলিকাতার প্রাচীন দুর্গের ইতিহাস লেখক উইলসন সাহেবও অন্ধকূপের জন্য সিরাজকে দায়ী না করিয়া যাহাদের হস্তে সে রাত্রিতে দুর্গ রক্ষার ভার ছিল, তাহাদিগকে দোষী করিয়াছেন।

"The old fort further claims regard and commemoration from our natural compassion with the suffering of a great human tragedy, for within its walls was situated Black Hole prison, in which, on the stifling night of a June 20, 1756, 123 brave soul were needlessly and cruelly done to death through the stupidity of those in charge of them. সত্যসত্যই উইলসন বলিয়াছেন যে, রক্ষকদিগের নির্বুদ্ধিতার জন্য অন্ধকূপ হত্যা ঘটিয়াছিল ; আমরা বলি, যদি বাস্তবিক অন্ধকূপ হত্যা ঘটিয়া থাকে তাহাতে সিরাজউদ্দৌলার কোন দোষ ছিল না। তিনি যাহাদের প্রতি দুর্গ রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাহাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যই তাহা ঘটিয়াছিল। হলওয়েল তাহাদিগের প্রতিহিংসা ও ক্রোধের যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা কদাচ বিশ্বাস যোগ্য নহে।

ঐতিহাসিক থ্যামসনের মতেও অন্ধকূপ হত্যার জন্য সিরাজউদ্দৌলা দায়ী নহেন। ইহা তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণের কার্য্য। তাঁহার মতে ইংরেজ বন্দিগণের বিনাশের আদেশ ছিল না।

টরেন্স সাহেব বলেন,—

"The melancholy fate of these persons may be justly

deplared; but it is neither just to distart nor misrepresent facts, as two frequently has been done. There is no evidence that the soubahdar knew of this transaction until it was past and irremaliables; and there is direct testimony that no indignity or hurt was either before or after suffered by any of the prisoners at Calcutta or Cassimbazar. Why, if he desired the death of those helpless individuals, should the Nowab have suffired three and twenty of them to go free to circulate the appalling tale?"

এই সকল ব্যক্তির শোকাবহ অদৃষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত বা মিথ্যা রূপে বর্ণনা করা সঙ্গত নহে, ইহা প্রায়শই ঘটিতেছে। সিরাজউদ্দৌলা যে এই ব্যাপার জানিতেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই। ঘটনা ঘটিবার পরও তাহার যখন কোনই উপায় ছিল না। সেই সময়ে ইহা তাঁহার কর্ণগোচর হয়। এই ঘটনার পূর্ব্বে বা পরে কলিকাতা বা কাশীমবাজারে কাহারও প্রতি যে অসম্মান বা আঘাত করা হয় নাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। এই অসহায় লোকদিগকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকিলে সিরাজ উদ্দৌলা কখনও অবশিষ্ট ২৩ জনকে এই ভীতিজনক কাহিনী প্রচারের জন্য জীবিত রাখিতেন কি?

হণ্টার সাহেবও অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধে সিরাজকে দোষী করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধে সিরাজ উদ্দৌলার কোনই দোষ ছিল না, যদি ইহার গুরুত্ব মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহা ঘটিয়াছিল মাত্র।

অন্ধকূপ হত্যা নামক একটা কিছু ঘটিয়া থাকিলে তাহার গুরুত্ব লইয়া এদেশে বা ইউরোপে কি ভাবে আলোচিত হইয়াছিল আমরা

তাহারই উল্লেখ করিতেছি। যদিও হলওয়েল সাহেব মান্দ্রাজ ও বোম্বাই কাউন্সিলে অন্ধকূপে আপনাদের কষ্ট ভোগের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তথাপি মান্দ্রাজ কাউন্সিলে সে সম্বন্ধে কোনই তর্ক বিতর্ক হয় নাই। তাঁহারা কলিকাতা হস্তচ্যুত হওয়ার জন্যই বিশেষ রূপে ভাবিত হইয়াছিলেন। অন্ধকূপ হত্যার গুরুত্ব তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় নাই। ক্লাইব ও ওয়াটসন মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গলায় আসিয়া পৌঁছিবার পর সিরাজ উদ্দৌলাকে যে সামরিক লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে অন্ধকূপ হত্যার নাম গন্ধও নাই। জগৎ শেঠকে লিখিত ক্লাইবের একখানি পত্রে প্রসঙ্গ ক্রমে অন্ধকূপের উল্লেখ মাত্র দেখা যায়। মেজর কিলপ্যাট্রিকও সিরাজউদ্দৌলাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ নাই। কলিকাতা পুনরধিকারের পর সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি হয়। সেই সন্ধি পত্রে অন্ধকূপের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে কোনই কথা হয় নাই।

তাহার পর দেশীয় লোকেরা অন্ধকূপ হত্যার গুরুত্ব উপলব্ধিই করিতে পারে নাই। মুতাক্ষরীণকার সিরাজউদ্দৌলার অনেক কুকীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে অন্ধকূপ হত্যার বিন্দু বিসর্গও নাই। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক হাজী মুস্তাফা আরও রহস্যময় কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে, "বাঙ্গলায় এমন কি কলিকাতায় অন্ধকূপের কথা জানে না। কলিকাতায় ৪ লক্ষ অধিবাসীই ইহা অস্বীকার করিয়া থাকে। একজন দেশীয়কেও ইহার সংবাদ জানিবার জন্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।"* যে ব্যাপারের কোন সংবাদ একজন লোকও বলিতে পারে না এদেশে তাহার গুরুত্ব কিরূপ অনুভূত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

* "This much is cirtain, that this event, which cats so capital a figure in Mr. Watt's performance, is not known in Bengal,

এদেশের ন্যায় ইউরোপেও প্রথমে অন্ধকূপ হত্যার গুরুত্ব আলোচিত হয় নাই। কারণ ক্লাইব প্রভৃতি ডিরেক্টারদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ করেন নাই। হলওয়েল যদিও ডিরেক্টারদিগকে অন্ধকূপের সংবাদ দিয়াছিলেন, তথাপি তাহার গুরুত্ব আলোচিত হয় নাই। হলওয়েলের বর্ণনা পত্র প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই ইউরোপে তাহার আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু যে দেশে তাহা ঘটিয়াছিল, সে দেশের লোকেরা তাহার কোনই সংবাদ রাখে নাই। এবং হলওয়েলের স্বজাতীয়গণও এখানে থাকিয়াও তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। হলওয়েলের বর্ণনাপত্র প্রকাশের পর এদেশের ইউরোপীয়গণ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

এক্ষণে একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, অন্ধকূপ হত্যা ঘটিয়া থাকিলে, তাহার ন্যায় ব্যাপার জগতে আর কখনও ঘটিয়াছে কিনা? এবং তাহাদের তুলনায় অন্ধকূপেরই বা গুরুত্ব কিরূপ? ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্কটলণ্ডের Massacre of glenco বা গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ড নামে যে ব্যাপার বর্ণিত আছে, তাহা অন্ধকূপ হত্যা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ড ইংরেজদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে একটি প্রাণীও জীবিত ছিল না। টয়েন্স বলিতেছেন—

"But if history is anything better than an old wifes tale, it must keep accounts by double entry, and keep them fairly. Men were still living at the time, who could remember how, by the orders of a secretary of state, the unsuspecting inhabitants of a peaceful glea in Argy-

and even in Calcutta. It is ignored by every man out of the four hundred thousand that inhabit that city, at least it is difficult to meet a single native that knows any thing if it."

lishire were bequited into admitting a party of king's troops into their dwellings, and were by them, at dead of night, butchered in cold blood, and their wives and little ones flung out to perish in the snow."

আর একটি ঘটনাও ইংরেজদিগের দ্বারা এদেশে ঘটিয়াছিল, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ১লা আগষ্ট অমৃতসর প্রদেশের একটি ক্ষুদ্রায়তন গোলাকার স্থানের মধ্যে অনেকগুলি সিপাহীকে বন্দী করিয়া ইংরেজরা তাঁহাদের মধ্য হইতে এক একটি করিয়া ২৩৭জনকে বাহিরে আনিয়া গুলি করিয়া মারে। অবশিষ্ট যাহারা আসিতে স্বীকৃত হয় নাই তাহাদিগকে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহার পর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সংজ্ঞাশূন্য ১৫ জনের অবসন্ন দেহ বাহির করা হইয়াছিল।

মুতাক্ষরীণের অনুবাদক হাজী মুস্তাফাও একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরেজেরা চারিশত সিপাহীকে মান্দ্রাজে পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে কোনই খাদ্যদ্রব্য দেন নাই, পথিমধ্যে তাহারা তুফানে পড়িয়া তিন দিন অনাহারে থাকিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেয়।

ক্রোধ বল, প্রতিহিংসা বল, নির্ব্বুদ্ধিতা বল, অন্ধকূপের তুলনায় উপরোক্ত ব্যাপারগুলির গুরুত্ব যে নিতান্ত অল্প নহে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে অন্ধকূপ হত্যা লইয়া এত তুমুল ব্যাপার কেন? ইংরেজের লিখিত ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দেশীয় অনেক ঐতিহাসিক অন্ধকূপ হত্যাকে এরূপ ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন কেন? অন্ধকূপ হত্যা 'একমেবা দ্বিতীয়ং' নহে। জগতে তাহার ন্যায় অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। ইতিহাস তাহাদের সাক্ষ্য লইয়া আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এক্ষণে অন্ধকূপ হত্যা ও তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার

করিতেছি। প্রবন্ধের সূচনায় আমরা বলিয়াছি যে ইতিহাস অন্ধকূপ হত্যা বা Black Hole Tragedy নামে কোন ব্যাপারের কথা অবগত নহে, তবে ইতিহাস ইহা স্বীকার করিয়া থাকে যে, কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ মধ্যস্থ অন্ধকূপ নামক কারাগারে কয়েক জন আহত ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। আমরা অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধে ইহাই বলিতে চাহি। আমরা দেখিয়াছি যে, অন্ধকূপের আয়তন বা তাহাতে প্রবিষ্ট লোক সংখ্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। কলিকাতা দুর্গে যে কয়েক জন লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে পলায়ন করে। কতক বা দুর্গ আক্রমণের সময় হত হইয়াছিল, কতক আহতও হয়। এই আহত লোকগুলিও অবশিষ্ট জন কয়েককে লইয়া সিরাজ উদ্দৌলার রক্ষিবর্গ কলিকাতা দুর্গের নিরাপদ অন্ধকূপ কারাগারে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। কতগুলি লোক, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, সে সম্বন্ধে কোনই বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, যতগুলি লোক ছিল, তাহাদিগকে কারাকক্ষে বন্দী করিয়া রাখা চলিত। গ্রীষ্মের রাত্রিতে অবশ্য তাহাদের কষ্ট হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ যে কয়জন ইংরেজ ছিলেন তাঁহারা কিছু অধিক পরিমাণে কষ্ট ভোগ করিয়া ছিলেন। কারণ আমরা জানিতে পারি যে, সে সময়ের ইংরেজ-কুঠীর কর্ম্মচারিগণ এতদূর বিলাসী হইয়া ছিলেন যে, তাঁহারা সামান্য কষ্টও সহ্য করিতে পারিতেন না। টানা পাখার বাতাসে ও উজ্জ্বলালোকে তাঁহারা আপনাদের ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাদিগকে কারাগৃহে যে কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইহা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। অন্ধকূপের ন্যায় কক্ষ না হইয়া কোন বিশাল কারাগৃহে তাঁহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাঁহারা ঐরূপই কষ্ট ভোগ করিতেন। হলওয়েল সাহেব একজন প্রধান কর্ম্মচারী হওয়ায় তাঁহার কষ্টভোগ কিছু বেশী মাত্রায় অনুভূত হইয়াছিল, তাই তাঁহার লেখনী অন্ধকূপ হত্যার

চিত্র চিত্রিত করিয়া সকলের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। নতুবা যুদ্ধের পর বন্দীদিগকে রাজ-প্রাসাদে রাখিয়া রাজভোগে পরিতৃপ্ত করিবার রীতি কোন দেশে কোন কালে দেখা যায় নাই। অবশ্য ইহাদের মধ্যে জনকয়েক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন সত্য, যুদ্ধে আহত হইয়া কারাগারের কষ্টে যে তাঁহাদের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ফলতঃ অন্ধকূপ হত্যা নামে কোন ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিনা, এবং তাহার যে বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে তাহাও মনে হয় না। যে কয়জন বিলাসী ইংরজে কর্ম্মচারী কারারুদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট অন্ধকূপ হত্যা ভয়াবহ হইতে পারে। কিন্তু ইহার কোনই রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই। সকল দেশেই সকল সময়ে বিজিতগণ বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার মধ্যে আহতগণ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। বন্দিগণ কষ্টভোগ করিয়াই থাকে। সুতরাং বলিতে হয় যে, বিজিতগণ বন্দী হইলেই অন্ধকূপ হত্যার অভিনয় হয়। তবে যদি বল ক্ষুদ্রায়তন গৃহে অধিক লোককে বন্দী করিয়া রাখা কোথায় ঘটিয়া থাকে, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, তোমাদের সে উক্তির চূড়ান্ত প্রমাণ নাই। কতকগুলি লোক বন্দী হইয়া ছিল মাত্র। তাহার মধ্যে কয়েকজন মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইহাতে যায় আসে কি? যখন বন্দী হইয়াছে তখন কারাগারেই থাকিবেই তোমাদিগকে কে রাজ প্রাসাদে লইয়া যাইবে? সেইজন্য আমরা জানিতে পারি যে, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অন্ধকূপ হত্যার নাম গন্ধও করেন নাই। যদিও তাঁহারা সিরাজ-উদ্দৌলার অনেক দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গলার বা কলিকাতার লোকে অন্ধকূপ হত্যার সংবাদও রাখে নাই। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ তাহার গুরুত্বেও মনোযোগ প্রদান করেন নাই। করিলে, সিরাজ-উদ্দৌলাকে তজ্জন্য তর্জ্জন করিতে ছাড়িতেন না। সুতরাং অন্ধকূপ-হত্যা

বা Black Hole Tragedy বলিয়া কোন ব্যাপার যে ঘটিয়াছিল, বা তাহার যে বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। জগতের সর্ব্বত্র জেতা জিতের মধ্যে যেরূপ ব্যাপার হইয়া থাকে তাহাই ঘটিয়াছিল মাত্র।

অজিত সিংহ ও জুঝার সিংহ।

বহু চেষ্টার পরও যখন মুখওয়াল দুর্গ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল, তখন শিখ-গুরু গোবিন্দ সিংহ কতিপয় অনুচর বেষ্টিত হইয়া গুপ্ত ভাবে চমকৌড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। চমকৌড় একটি পার্ব্বত্য দুর্গ। ইহার অবস্থান সুদৃঢ়। এই ক্ষুদ্র দুর্গ এক্ষণে পঞ্জাবের রূপুর তহশিলের অন্তর্গত।

মখওয়ালে অবস্থানের শেষাংশে গোবিন্দের অদৃষ্ট স্রোত বিমুখগামী হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারই ফলে তাঁহাকে উপর্য্যুপরি নানা অভাবনীয় বিপদে পতিত হইতে হয়। মোগলের কঠোর অবরোধের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ দুর্গে রসদের অভাব হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে গুরু-মাতা গুজরীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এ দুর্গ অচিরেই মোগল কর-গত হইবে। বংশ রক্ষার ভাবনায় অধীর হইয়া তিনি গোবিন্দের দুইটি কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া গুপ্তভাবে দুর্গত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিলেন। তাঁহার গমনের অনতিকাল বিলম্বে শিখ সৈন্যেরা উপযুক্ত আহারাভাবে ক্লান্ত ও ত্যক্ত হইয়া গুরুকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়! কেবল মাত্র চল্লিশটি অনুচর কোন মতেই তাঁহার পার্শ্ব-ত্যাগ করিল না।

এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মুখওয়াল রক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া গোবিন্দ সিংহ এক তামসী রজনীতে ক্ষুদ্র চমকৌড় দুর্গে পলাইয়া গেলেন, তাঁহার এ পলায়নবার্ত্তা সত্বরেই মোগল পক্ষ জ্ঞাত হইল। তাহারাও পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আবার চমকৌড় দুর্গ অবরোধ করিল।

এই স্থানে অবস্থান কালে গোবিন্দ আরাধ্যা দেবী ৺মাতা নয়নার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। শিখদের বিশ্বাস, দেবী গুরুর অবিচলিত,

ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সতত তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। এই সময় তিনি শিখদের প্রাণে সতত: নূতন তেজঃ জাগাইয়া রাখিতেন। শিখেরাও তাঁহার জন্য আত্মদান করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক ছিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—'যদি আমার নাম গোবিন্দ সিংহ হয়, তবে আমি সামান্য চটক পক্ষীর সাহায্যে প্রবল শ্যেন পক্ষীর ধ্বংস সাধন করিব। আমার এক একটি শিখ এক লক্ষ মোগলের সম্মুখীন হইবে।' গোবিন্দের অপূর্ব্ব শিক্ষাদানের শেষ ফল ভাবিলে এই কথা গুলিকে অসার দাম্ভিকতা বলিয়া ভ্রম হইবে না ; বরং প্রতীতি জন্মিবে, বিশ্বাসীর প্রবল আত্মবিশ্বাস কখনই নিষ্ফল হয় না। গোবিন্দ সিংহ শিখদের হৃদয়ে যে নবতেজ উদ্দীপ্ত করিয়া যান, তাহার ফলে শিখ নির্ভীক আত্মত্যাগী হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাণ অপেক্ষা ধর্ম্মকে, তীর্থকে, দেশকে বড় করিয়া ভাবিতে পারিয়াছিল। তাই তাহারা একদিন মোগল বংশের ধ্বংস সাধনের পথে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।

অবরোধকারী মোগল সেনাপতি খাজা মহম্মদ ও নহর খাঁ অনেক বিবেচনার পর গোবিন্দকে আত্মসমর্পণার্থ পরামর্শ দিবার জন্য এক দূত প্রেরণ করিলেন। গুরু দূতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু দৃপ্ত মোগল বিনয়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া গুরু-দরবারে অসহ্য দাম্ভীকতার পরিচয় দিতে লাগিল। তাহাতে শিখ-সমাজ বড়ই অপমানিত বোধ করিলেন। কিন্তু দূত অবধ্য, তায় অতিথি ; সুতরাং সহসা তাহাকে কেহ কিছু বলিলেন না।

অজিত সিংহ গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ। দ্বিতীয় পুত্র জুঝার সিংহ অজিত অপেক্ষা দুই বৎসরের কনিষ্ঠ। ভাতৃ-যুগল উভয়েই এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। পিতৃ-নিন্দা, ধর্ম্ম-নিন্দা, নেতৃ-নিন্দা অজিতের সহ্য হইল না। সিংহ-শিশু ক্রোধভরে অসি

কোষমুক্ত করিয়া তীব্র কণ্ঠে দূতকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'সাবধান! আর একটি কথা বলিলেই তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড হইবে!' বালকের এই তেজোগর্ভ দূতের রোষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিল। সে তৎক্ষণাৎ শিখ দরবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই শিখেরা দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া মোগল-দিগকে আক্রমণ করিল। দুর্গ-বাহিরে শিখ-মোগলে তুমুল সংঘর্ষ হইল। সে সংঘর্ষে শিখেরা অসীম বীরত্ব দেখাইয়া একে একে মহাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। এ দৃশ্য দেখিয়া বালক অজিতের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অমনি করিয়া বীরত্ব দেখাইতে দেখাইতে মরিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি ছুটিয়া পিতৃসমীপে গমন করিয়া সিংহ-শিশুর ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"পিতঃ! আপনারই নিকট শিখিয়াছি, এ দেহ অচিরস্থায়ী; এক দিন না এক দিন ক্ষয় হইবেই; চিরকাল ইহা থাকিবে না। আমাকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দিন। আমি এই অসি লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইব। শিখের জন্য, ধর্ম্মের জন্য আমায় মরিতে দিন। আমার বয়সের এই অল্পতার জন্য কিছু ভাবিবেন না। ধর্ম্মের জন্য, মুক্তির জন্য আমি যুদ্ধ করিব। আমায় অনুমতি করুন।"

পুত্রের এইরূপ আন্তরিক প্রার্থনায় পিতৃ-হৃদয়ে স্নেহ উছলিয়া উঠিল। তিনি সাহ্লাদে, সস্নেহে অজিতকে বুকে করিয়া লইলেন। ক্ষণেক বুকে চাপিয়া রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন—"যাও বৎস! তোমার এই ক্ষুদ্র অসির সহিত খেলা করিতে করিতে অনন্ত কালে মিশিয়া যাও। তোমার এই ক্ষুদ্র জীবন দিয়া জগৎকে বুঝাও, আমরা এই নশ্বর জগতের মায়ায় মুগ্ধ নহি, ইন্দ্রিয়বৃত্তিচয় আমাদের আয়ত্ত করিতে পারে নাই। আমরা একমাত্র দেবাশীর্ব্বাদের প্রার্থী। স্বর্গ—স্বর্গই আমাদের চিরবাস-ভূমি। আমরা অকাল (অমর); আমরা মৃত্যু জানি না। আমাদের

হৃদয় ঈশ্বরের সিংহাসন; তিনি তথায় সর্ব্বদা বাস করেন। যাও বৎস! তাহাতে অবিচল মতি রাখিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে রত হও। আমি সর্ব্বদাই তোমার সহায় থাকিব। ঈশ্বর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। ধর্ম্মত্যাগ করিও না। তোমার সমক্ষে জগৎ চূর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। মৃত্যুর আহ্বানে কাতর হইও না। বিপদে ভয় পাইও না। যাও অজিত! অজিতের ন্যায় আত্মোৎসর্গ কর। ঈশ্বর আছেন, এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিও। তিনি সর্ব্বদাই তোমার সহায়।"

বীরদর্পে অজিতসিংহ অশ্বারোহণে দুর্গ ত্যাগ করিয়া মোগল-সৈন্য-সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। পিতা দুর্গমধ্য হইতে পুত্রের বীরত্ব দেখিতে লাগিলেন। পুত্র 'অকাল' 'অকাল' শব্দে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া শত্রুদের আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ক্ষুদ্র অসিতে অনেকগুলি মোগল অনন্তনিদ্রায় শায়িত হইল। কিন্তু আর কতক্ষণ! ক্ষুদ্র বালক আর কত কাল এই প্রবল সৈন্য-সমুদ্র মন্থন করিবেন? দুই দণ্ড কাল অতীত হইতে না হইতেই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তবু রণে ভঙ্গ দিলেন না। 'অকাল' 'অকাল' শব্দ করিতে করিতে শত্রুধ্বংসে রত হইলেন। কিন্তু আর পারিলেন না। অচিরেই বালক শত্রুর আঘাতে জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। আর তাঁহার জ্ঞান হইল না। তিনি অনন্ত কালে মিশিয়া গেলেন।

পুত্রকে রণে পতিত হইতে দেখিয়া পিতা গোবিন্দসিংহ ঈশ্বরের জয় গান করিতে লাগিলেন,—'পিতঃ! যে বিশ্বাসে আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছি, তাহাই আজ তোমার পাদপদ্মে উপহার দিতেছি। ঐ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তুমি তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লও। আমি যে তোমারি পুত্র, প্রভু! তোমারি চিন্তায় যে আমার হৃদয় পূর্ণ—তুমিই যে আমার সুখ। তোমারি প্রসাদে, দেব! আজি আমরা—অত্যাচারিত জনবর্গ অত্যাচার দমনের জন্য এরূপ শক্তি, সাহস লাভ করি-

য়াছি। শত্রু এখনই এই দুর্গ জয় করিতে পারে বটে; কিন্তু ইহাতে তোমারই জয় যে আমি সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। প্রজাবর্গের একপ মত পরিবর্ত্তন যে, তোমারি কৃপা দেব!" গান করিতে করিতে দেব সমাধি মগ্ন হইয়া পড়িলেন।

সমাধি-অন্তে গুরু ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার হৃদয় নাচিতে ছিল। তিনি দেখিলেন—মধ্যম পুত্র জুঝারসিংহ বিনীতভাবে করযোড়ে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, পিতা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও বৎস? ওরূপ করযোড়ে দাঁড়াইয়া কেন?" পুত্র ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"দাদা যেখানে গিয়াছেন, আমি তথায় যাইতে চাহি। আমি বুঝিতেছি, আমিও অসি সঞ্চালন করিতে পারি; আমিও শত্রুর কতক সৈন্য নষ্ট করিতে সমর্থ। যদি আমার জয় হয়, সে ত, সুখের কথা। আর যদি আমি যুদ্ধে দেহ ত্যাগ করি, তবে আমি অকালদেবের শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাইব। অনুমতি করুন, আমি যেন যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে পারি।"

"কিন্তু বৎস! তোমার বয়স যে অতি অল্প!"

সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া পুত্র পুনরপি উত্তর করিলেন—"আমার বয়স অল্প হইলেও আমি অমৃত পান করিয়াছি *। আমি যুদ্ধ করিতে পারিব। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সফলকাম হই। আমি অনন্ত-ধামের প্রার্থী।"

ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের এরূপ অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া গুরু বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শিক্ষাদান বৃথা হয় নাই। পুত্র অল্পবয়স্ক হইলেও বংশের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, এ কথা জানিতে পারিলে কোন পিতার হৃদয় না আনন্দে নাচিয়া উঠে? সাধারণতঃ

* অর্থাৎ আমার দীক্ষা হইয়াছে। দীক্ষাকে শিখেরা পহল ও অমৃত উৎসব বলে।

ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক যুদ্ধের কি বুঝে? কিন্তু যাহারা ক্ষত্রিয়-পুত্র, ভীষণ যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে যাহারা প্রতিপালিত, যুদ্ধের নামে তাহাদের হৃৎকম্প হয় না, বরং সে নামে তাহাদের হৃদয় নাচিয়া উঠে।

গোবিন্দসিংহ হাসিয়া বলিলেন—"তবে আইস! আমি নিজে তোমাকে যুদ্ধসজ্জায় ভূষিত করিয়া দিই।" পুত্র নাচিতে নাচিতে যুদ্ধসজ্জা পরিতে লাগিলেন। একটি সুন্দর মখমলের পরিচ্ছদে বালকের কোমল দেহ আবৃত করিয়া দেওয়া হইল। কটিদেশে মেখলা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তদুপরি একখানি সুন্দর অসি-কোষ সংযুক্ত হইল। জরি ও পালকে সুশোভিত একটি ক্ষুদ্র শিরস্ত্রাণ বালকের মস্তকোপরি শোভা পাইল। বালক স্বীয় বেশ দেখিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। পিতা তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বারংবার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—জুঝার! তুমি অমর! মৃত্যুর ভয় করিও না। শত্রুকে পশ্চাৎ দেখাইও না। ঐ ক্ষুদ্র অসি লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিও। মৃত্যুই স্বর্গরাজ্যের প্রবেশদ্বার। ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

পিতার নিকট বিদায় পাইয়া সিংহশিশু অশ্বারোহণে শত্রুর উপর আপতিত হইলেন। বালক যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বীরত্ব দেখাইয়া অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া পিতার কণ্ঠভেদ করিয়া উচ্চারিত হইল—"তুমি ধন্য! তোমারই সত্য, তোমারই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া, আমার দুই পুত্র বীরের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছে!"

তৎপরে সিংহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার তেজের নিকট প্রবল মোগলশক্তি প্রতিহত হইল। সেনাপতি নহর খাঁ তাঁহার হস্তে হত ও খাজা মহম্মদ আহত হইলেন। কিন্তু তখন তিনি নিতান্তই ক্ষীণবল। পাঁচ জন মাত্র তাঁহার পার্শ্বচর। আর সকলেই অনন্ত নিদ্রায়

শয়ন করিয়াছে। সেই যুদ্ধে আত্মাহুতি দিবার জন্য গোবিন্দ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সহচরেরা তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিতে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিল। তাঁহার এরূপ অকাল-মৃত্যুতে শিখ-সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, এ কথা তাঁহাকে তাহারা কত বুঝাইল। কিন্তু তিনি সহজে নিবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। অবশেষে সহচরদিগের কাতর অনুরোধে মুগ্ধ হইয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এরূপ আত্মাহুতি ত আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র।

যুদ্ধে জনৈক মোগল-সেনাপতি নিহত হইয়াছেন, অপরেও আহত; এরূপ অবস্থায় মোগল-শিবিরে যথেষ্ট গোলযোগ উপস্থিত হইল। দৈবক্রমে এই সময় আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গুরু এই সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। তিনি গুপ্তভাবে রণস্থল ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন।

পথিমধ্যে গুরু, মাতার সংবাদ পাইলেন। কিন্তু সে সংবাদ বড়ই মর্ম্ম-বিদারক। মোগলের অন্যায় অত্যাচারে তাঁহার দুই পুত্র প্রাচীরমধ্যে জীবন্ত প্রোথিত হইয়াছে; মাতা সেই শোক-সংবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। * বংশরক্ষার জন্য মাতা গুজরী পুত্রের অনুমতিতে পলাইয়াছিলেন; কিন্তু বিধাতাই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ হইবেই। তাঁহার সামান্য কটাক্ষে মাতা গুজরীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি—অপরূপ আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, বিধাতা গুরুবংশে বাতি দিতে আর কাহাকেও রাখিলেন না।

এই শোকাবহ কাহিনী শুনিয়াও গুরুর হৃদয় সামান্য মাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া

* গত শ্রাবণের 'ঐতিহাসিক চিত্রে' 'সিংহশিশু' প্রবন্ধে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পড়িলেন। তাহার পর কয়েক বর্ষ পরে, চিরস্মরণীয় মুক্তসর যুদ্ধে মোগলদিগকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া গুরু স্বরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলে, গুরুপত্নী মাই সুন্দরণ অজ্ঞাতবাস দূর করিয়া তাঁহার পদতলে উপনীত হন। সেই সময় মাতা কাতরকণ্ঠে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমার পুত্রেরা আজ কোথায়?" সহধর্ম্মিণীর শোকাশ্রু মুছাইতে মুছাইতে দেব তখন বলিয়াছিলেন—"তাঁহাদিগকে হারাইয়াছি বটে; কিন্তু তাঁহাদের বিনিময়ে সমগ্র শিখ-সম্প্রদায়ের হৃদয় জয় করিয়াছি। তাহারাই সকলে তোমার সন্তান। তুমি তাহাদিগকেই মাতৃস্নেহ বিতরণ কর।"

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালায় ইংরাজ-বণিকের প্রথম কুঠি। *

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতভূমির লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, যে সমস্ত ইউরোপীয় জাতি অপন আপন শূন্যগর্ভ পূর্ণ করতঃ বর্ত্তমানে সবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তন্মধ্যে পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম এদেশে আগমন করিয়াছিল। পরে তাহাদের দেখাদেখি ওলন্দাজ, দিনেমার ও অবশেষে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথ রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিনে কতিপয় ইংরাজ বণিক "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে এক কোম্পানী গঠন করিয়া রাণীর নিকট বিদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, রাণী কোম্পানীকে ১৫ বৎসর কাল ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার জন্য এক সনন্দ-পত্র প্রদান করিলেন। এই সনন্দপত্রবলেই তাহারা ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে বাহির হইয়া ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথমেই পুনর্ব্বার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ইহাই ইংরাজদিগের পূর্ব্বদিকে সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য। ইহার পর ১০ বৎসর মধ্যে কোম্পানী ৮ বার ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে। ইতিহাসে প্রকাশ, এই বাণিজ্যে কোম্পানী প্রতি টাকায় দুই শত টাকা লাভ করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম এ দেশে আইসে। বিদেশ হইলেও এক স্থানে বহুকাল বাস-নিবন্ধন তাহারা ক্রমে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও দেশবাসীর রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-পদ্ধতি জানিতে পারিয়া

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১৫ সালের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে তাহারাই ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। স্থলে তাহাদের অধিকার ছিল না বটে, কিন্তু এ দেশের নিকটবর্ত্তী উপকূলে, তাহাদিগকে কেহ আঁটিতে পারিত না। ভারতবর্ষ হইতে জিনিষপত্র আমদানী-রপ্তানীর যত কিছু কাজ পর্ত্তুগীজদিগের হাতে ছিল; সুতরাং ইংরাজেরা ভারতবর্ষের বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গেই বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল। পর্ত্তুগীজেরাও নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূরীভূত করিতে বদ্ধপরিকর হইল। ইহার ফল স্বরূপ সুরাটের নিকট দুই জাতির পুনঃ পুনঃ জলযুদ্ধ হইতে লাগিল। ইংরাজের নৌবল চির প্রসিদ্ধ; সুতরাং জল-যুদ্ধে পর্ত্তুগীজেরাই অপদস্থ হইতে লাগিল। ইহাতেই ইংরাজদিগের প্রাদুর্ভাবের সূত্রপাত হয়। সুবিধা বুঝিয়া, তাহারা ক্রমে সুরাট, আহম্মদাবাদ ও মসলিপত্তন প্রভৃতি সহরে বাণিজ্য কুঠি সংস্থাপন করিতে লাগিল। ১৬১৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই বিষয়ে কোম্পানীকে এক রাজকীয় সনন্দ দিলেন। ইংরাজ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সুরাটে সর্ব্বপ্রধান কুঠি স্থাপন করিয়া ভারতে বদ্ধমূল হইল।

ইহার পর ১৬১৫ খৃঃ অব্দে স্যর টমাস রো নামক এক জন রাজদূত ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের নিকট হইতে মোগল দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্যর টমাস অতি কৌশলী, মিষ্টভাষী ও প্রবেশক লোক ছিলেন। নিজের স্বভাবগুণেই, তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই, জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। প্রাচ্য নৃপতিদিগের বদান্যতা ও উদারতা চির প্রসিদ্ধ। সুতরাং সুচতুর স্যর টমাস, জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে স্বদেশীয় বণিক-সম্প্রদায়ের জন্য বাণিজ্য-বিষয়ক সুবিধাজনক অনেক বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্যর টমাস বাদশাহের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার

মধ্যে কোম্পানীকে বাঙ্গালাদেশেও বাণিজ্য করিবার কতকটা সুবিধা দেওয়ার কথা থাকে—এই বন্দোবস্তের পর হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুরাটস্থ এজেণ্ট, সোণার বাঙ্গালার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিলেন। এই সময়ে কোম্পানী ব্যবসায়ে অনেকটা উন্নতিলাভ করায় তাহারা আজমীর ও আগরায় শাখা কুঠি স্থাপন করিয়া তত্তদ্দেশে কারবার চালাইতে লাগিল। আগরায় আসিয়াই ইংরাজ বণিক সর্ব্বপ্রথম ঢাকাই মসলিন ও মালদাহী রেশমী কাপড় দেখিতে পায়। এইরূপ নয়ন-মনোমুগ্ধকর উৎকৃষ্ট বস্ত্র ইংলণ্ডে চালান দিতে পারিলে, বহু লাভে বিক্রয় হইবে মনে করিয়া, অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, বিহার পাটনায় ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

আগরার কুঠিয়ালেরা সমস্ত সংবাদ সুরাটস্থ প্রধান এজেণ্টকে জানাইল। আগরার পত্র পাইয়া প্রধান এজেণ্ট দুই জন প্রতিনিধিকে বিহার পাটনায় প্রেরণ করিলেন। ইহা ১৬২০ খৃঃ অব্দের কথা।

বিহার তখন বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে শাসিত হইতেছিল। শাসনকর্ত্তা ছিলেন আফজল খাঁ। সুরাটে প্রতিনিধিদ্বয় আফজল খাঁর অনুমতি লইয়া পাটনায় এক অস্থায়ী কুঠি নির্ম্মাণপূর্ব্বক কাপড় খরিদ করিয়া আগরার কুঠিতে প্রেরণ করিতে লাগিল। আগরা হইতে তাহা সুরাটে প্রেরিত হইত। কিন্তু এখান হইতে ওখানে, ওখান হইতে সেখানে বস্ত্রাদি প্রেরণ করিতে বিস্তর খরচ পড়িতে লাগিল দেখিয়া, এক বৎসর পরে ১৬২১ খৃঃ অব্দে সুরাটস্থ প্রধান এজেণ্ট এ কারবার বন্ধ করিয়া দিলেন—পাটনার অস্থায়ী কুঠি উঠিয়া গেল।

এদিকে পূর্ব্ব উপকূলস্থ মসলিপত্তনের কুঠিয়ালেরাও নীরব ছিল না। ১৬৩২ খৃঃ অব্দে গোলকুণ্ডার শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে বাণিজ্য-বিষয়ক এক ফরমাণ লাভ করিয়া, তাহার বলেই তাহারা ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে বাণিজ্য-ব্যপদেশে বঙ্গোপসাগর-বক্ষ বাহিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে

লাগিল। এবার একখানি চীনদেশীয় বাণিজ্যপোতে রবার্ট কার্ট রাইট প্রমুখ ৮জন মাত্র লোক যাত্রা করিয়াছিল। অনুকূল বায়ুভরে ইংরাজ-পোত নির্ব্বিঘ্ন উড়িষ্যার অন্তর্গত মহানদীর মোহনায় প্রবেশ করিয়া ১লা এপ্রিল তারিখে হরিশপুর গড় নামক বন্দরের নিম্নে নঙ্গর করিল। এই বন্দরে মোগলদিগের এক শুল্কালয় ছিল। পণ্যসম্ভারপূর্ণ পোতসমূহ হইতে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করিবার জন্য এখানে একজন হিন্দু প্রতিনিধি থাকিতেন। ইনি প্রকৃত-পক্ষে বন্দর ও তন্নিকটস্থ স্থান সমূহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জনসাধারণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া জানিত। অপরিচিত বৈদেশিকগণ ইঁহার নিকট সদ্ব্যবহারই পাইয়াছিল। বাণিজ্যবিষয়ে এখানে তাহাদের আশানুরূপ সুবিধাও হয় ত হইতে পারিত, কিন্তু অকস্মাৎ তাহাতে এক অন্তরায় উপস্থিত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বার্থের হানি হওয়ায় পর্ত্তুগীজ বণিকেরা ইংরাজ বণিকদিগকে ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে দূরীভূত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিল। ইংরাজ-বণিজ্যপোত হরিশপুর বন্দরের নিম্নে নঙ্গর করিতে না করিতেই, কোথা হইতে অতর্কিতভাবে সেখানে এক খানি পর্ত্তুগীজ যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বন্দরে সুবিধাজনক স্থান থাকা সত্ত্বেও যেন ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজ পোতের গা ঘেঁষিয়া আসিয়া নঙ্গর করিল। ইংরাজেরা স্থলে অবতরণ করিলে পর্ত্তুগীজেরাও তাহাদের অনু-সরণ করিয়া চলিল। যাহারা বিবাদপ্রিয়—বিবাদ করাই যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের পক্ষে বিবাদ বাধাইতে বিশেষ কারণ বা সময়ের আবশ্যক হয় না। পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজে তখন অহি-নকুল সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং বন্দরে অবতরণ করিয়াই কথায় কথায়, সামান্য কারণে, হাতাহাতি হইতে শেষে তাহাদের মধ্যে রক্তারক্তি আরম্ভ হইল। ইংরাজেরা জনসংখ্যায় কম ছিল, তাই তাহাদেরই প্রাণসংশয় হইয়া উঠিল। কিন্তু ভগবান্ যাহার সহায়, কে তাহাকে নষ্ট করিতে পারে? বন্দরে উঠিয়া দুইটি বৈদেশিক

জাতি পরস্পর বিবাদ করিতেছে, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই বন্দরাধ্যক্ষ দুই শত সৈন্য পাঠাইয়া, প্রবল পর্ত্তুগীজদিগের হস্ত হইতে দুর্ব্বল ইংরাজ-দিগকে উদ্ধার করিলেন।

ইংরাজ পোতাধ্যক্ষ দেখিলেন, মিত্ররাজ গোলকণ্ডাধিপতির প্রদত্ত ফরমাণ বলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করা সম্যক নিরাপদ নহে, তাই তিনি বাণিজ্যপোত ও সঙ্গীয় অন্যান্য লোকজন বন্দরাধ্যক্ষের হেপাজতে রাখিয়া দুইজন মাত্র সঙ্গী লইয়া কটকাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কটকে দিল্লীর সম্রাটের অধীন একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

কটক-দরবারের জাঁকজমক, সাজসজ্জা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, ইংরাজ কার্ট রাইট অবাক হইয়া গেলেন। তখনকার নবাব বাদশাহ বা শাসনকর্ত্তা-দিগের সাক্ষাৎ লাভ করা এক কঠিন ব্যাপার ছিল। বণিকবেশে আসিয়া ছলে বলে কৌশলে যে ইংরাজ ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়, একদিন তাহাদেরই জাতভায়া কার্ট রাইটকেও সামান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার দরবারে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যাক্ সে কথা।

বহু চেষ্টার পর কার্ট রাইট-প্রমুখ ইংরাজত্রয় কটক দরবারে প্রবেশ লাভ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগের কৃত অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রার্থনায় শাসনকর্ত্তার নিকট আবেদন করিল। ইংরাজেরা কটক দরবারে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে জানিতে পারিয়া, পর্ত্তুগীজেরাও কটকে উপস্থিত হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে এক পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিল। মামলা মোকদ্দমা করিতে গেলে এখন যেমন চুনো-পুঁটি পেয়াদা হইতে আরম্ভ করিয়া আদা-লতের দেওয়ালগুলির পর্য্যন্ত মুখবন্দ করিতে হয়, সুদূর মোগল-রাজত্বের সময়েও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না।

পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজ উভয়েই বণিক। উভয়েই অর্থশালী—নিজ

নিজ সুবিধার জন্য তাহারা উভয়েই মুক্তহস্তে দরবারের উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারিবর্গকে উৎকোচ প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু অর্থব্যয় করিয়াও কোন পক্ষেরই কিছু ফল হইল না। শাসনকর্ত্তা এক অভিনব বিচার করিলেন। তাঁহার বিচারে দ্রব্যজাতপূর্ণ ইংরাজ বাণিজ্যপোত ও পর্ত্তুগীজ যুদ্ধ-জাহাজ উভয়ই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। ইংরাজ কার্ট রাইট কটক দরবারের বিচার-ব্যবস্থা দেখিয়া হতভম্ব হইলেন—বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলে, রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল—ক্রোধাতিশয্যে স্থানকাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়াই দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এখানে যখন আমার অভিযোগের সুবিচার হইল না, তখন বাধ্য হইয়াই অন্যত্র আমার বিচার প্রার্থী হইতে হইবে।" ইহা বলিয়াই ত্রস্তপদক্ষেপে দরবারগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় শাসনকর্ত্তাকে অভিবাদন পর্য্যন্তও করিলেন না। দরবার শুদ্ধ লোক কার্ট রাইটের এই ঔদ্ধত্যে বিলক্ষণ রাগান্বিত হইলেন; কিন্তু স্বয়ং শাসনকর্ত্তা ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না; বরং তিনি যেন ইহাতে অনেকটা আমোদ বোধ করিলেন।

এই ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইল— চতুর্থ দিন নবাব কার্টরাইটকে দরবারে আহ্বান করিলেন। কার্টরাইটের রাগ তখনও পড়ে নাই। তিনি সবেগে আসিয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং নবাবকে লক্ষ্যকরিয়াই যেন প্রভুত্বসূচকস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আপনি আমার মনিব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর বিশেষ অন্যায় বিচার করিয়াছেন; কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই ইহা নীরবে সহ্য করিব না!" এবার কিন্তু কার্টরাইটের কথায় নবাব বিশেষ বিরক্ত হইলেন এবং দরবারস্থিত কর্ম্মচারিবর্গের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ লোকটা কোন্ দেশীয় হে? যে জেতে এমন উদ্ধত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে জাতটাই বা কোন ধরণের?" কর্ম্মচারিবর্গ উত্তর করিলেন—"এ যে জাতির লোক

নৌবলে সে জাতি বাস্তবিকই অজেয়।” এ উত্তর শুনিয়া নবাব একটু দমিয়া গেলেন, শেষে অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ইংরাজদিগকে উড়িষ্যায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং পরদিন সম্মানার্থ এক ভোজ দিয়া ইহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

কটকের নবাবের অনুমতি পাইয়া, তাহারা প্রথমেই হরিহরপুরে এক কুঠি নির্ম্মাণ করিল—এই হরিহরপুরের কুঠি বাঙ্গালাদেশের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশসমূহের মধ্যে ইংরাজ-বণিকের সর্ব্বপ্রথম স্থায়ী কুঠি।

হরিহরপুরের এই কুঠিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে অন্যান্য প্রধান বন্দরে কুঠি স্থাপন করতঃ চতুর ইংরাজ দেশে খুটা গাড়িয়া বসিল। সপ্তদশ শতাব্দার মধ্যভাগে যে মুষ্টিমেয় ইংরাজ একদিন সামান্য বণিকবেশে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছিল, আজ তাহারাই ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। ইহা আমাদেরই অদৃষ্ট, তাহাদের হাতযশ ও সর্ব্বোপরি বিধির বিধান।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

বিজয়নগরে মুসলমান-সংঘর্ষ।

দক্ষিণভারতে বিজয়নগরের হিন্দুসাম্রাজ্য মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের শাসন সময়েই জাতীয় গৌরবের ও সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির শীর্ষস্থানে আরোহণ করে। তিনি স্বয়ং স্বীয় বিজয়বাহিনীর সেনাপতিরূপে বহির্গত হইয়া, বহুসংখ্যক জনপদ বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত করেন। কৃষ্ণদেব বহু মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নগরের সৌন্দর্য্যবৰ্দ্ধন এবং শাসন-সংক্রান্ত নানাপ্রকার সংস্কারের প্রবর্ত্তন ও উন্নতিবিধান করিয়া ১৫৩০ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করিলে *, তাঁহার ভ্রাতা অচ্যুত রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু রাজোচিত গুণাবলীর অভাবহেতু তাঁহার রাজত্ব কেবল নামমাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল। ১৫৪২ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, সদাশিবরাও ও কেবল রাজপদবাচ্য হন মাত্র, প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণদেব রাওয়ের জামাতা রামরায় প্রধান সচিবরূপে ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তিরুমল ও বেঙ্কটাদ্রি প্রধান সচিবের সহায়করূপে বিজয়নগরের সাম্রাজ্য ঘটিত সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সদাশিব স্বীয় প্রাসাদাভ্যন্তরেই বন্দিরূপে কালযাপন করিতেন। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না বা করিতে পারিতেন না। এই জন্যই ফিরিস্তা প্রমুখ

* ফিরিস্তা কৃষ্ণদেবকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পেইজ ও নুনিজ নামক পোর্ত্তুগীজ লেখকদ্বয় স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ফিরিস্তার বর্ণনা বিদ্বেষমূলক বিকৃত ভাবাপন্ন বলিয়াই উপলব্ধি জন্মে। পেইজ কৃষ্ণদেবকে ও নুনিজ অচ্যুতকে স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইঁহাদিগের বিবরণ ও মন্তব্য ফিরিস্তা হইতে অধিক বিশ্বাসযোগ্য।

তাৎকালিক ঐতিহাসিকগণ রামরায়কেই প্রকৃত রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সময়ে দক্ষিণ-ভারতে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটি মুসলমানরাজ্য বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের সদ্ভাব থাকা দূরে থাকুক, প্রবল বিরোধ-বীজই পরিলক্ষিত হইতেছিল। এদিকে রাম রায় বিজয়নগরের সমস্ত অধিকার স্বকবলগত করিয়াও দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে না পারিয়া, পরস্পর বিবদমান মুসলমান সুলতানগণের মধ্যে গোলকুণ্ডার কুতুব শাহ ও বিজাপুরের আদিল শাহের রাজ্যের সীমান্তভাগ আক্রমণ করিলেন। ইহাতে উক্ত সুলতানদ্বয়ের উভয়েই স্ব স্ব রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে গোলকুণ্ডার অধিকার হইতে রামঘান-পুরা ও পঙ্গুল নামক প্রধান জনপদদ্বয় রামরায়-কর্তৃক বিজয়নগর সম্রাজ্যের সহিত নূতন সংযোজিত হইল। ইহাতে রামরায়ের দুরাসনা-নিবৃত্তি দূরে থাকুক, তিনি স্বীয় শ্বশুর কৃষ্ণদেবের দৃষ্টান্তানুসরণে সফলকাম হইয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইহাই বিজয়-নগরে হিন্দুরাজত্বের শেষ বিজয়াভিযান। বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল দেখিলেন, রাম রায় ষষ্টিসংখ্যক-বন্দর-সমন্বিত বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রবল ও সমৃদ্ধ অধিপতি, তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বতাচরণ, তাঁহার কেন, কোন সুলতানের পক্ষেই সুসাধ্য নহে। সুতরাং সন্ধিসূত্রে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গকে সম্মিলিত করিবার জন্য, তিনি গোলকুণ্ডাধিপতি ইব্রাহিম আদিল শাহের নিকট গোপনে দূত প্রেরণ করিলেন। ইব্রাহিম এই সন্ধিবন্ধনে সম্মত হইয়া, স্বপক্ষের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ, আহমদনগরের সুলতান হুশেন নিজামশাহের সহিত আলি আদিলের চিরনিরূঢ় কলহনিষ্পত্তির ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। হিন্দুগণ, মুসলমানগণের পরস্পর অনৈক্যবশতঃই, তাঁহাদিগের ধর্ম্মাচরণে,

ব্যাঘাত জন্মাইতে সমর্থ হইতেছে;—কেবল এই মাত্র যুক্তিবলেই উভয়পক্ষের বদ্ধমূল বৈরভাব প্রশমিত হইয়া গেল। অধিকন্তু তাঁহাদের আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্দ্য ঘনীভূত ও চিরস্থায়ী করিবার আশায়, হুশেন নিজাম শাহ স্বীয় দুহিতা চাঁদবিবিকে আলি আদিলের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, যৌতুকস্বরূপ শোলাপুর দান করেন। এবং আলির ভগিনীর সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মুর্ত্তিজার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, উভয়দলের বিরোধাপগমের সহিত দৃঢ় ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করেন। এই রূপে সংমিলিত সুলতানেরা অবশেষে ধর্ম্মোৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া বিজয়নগরের উৎসাদনার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। অতঃপর আলি আদিল শাহ ইঁহাদিগের অগ্রণী হইয়া বিজয়নগরের নবাধিকৃত প্রদেশগুলি প্রত্যর্পণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া রামরায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এইরূপ গৌণ যুদ্ধ ঘোষণায় দূত রাম রায় কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইলে, একতাসূত্রে আবদ্ধ সুলতানগণ ইসলাম ধর্ম্মের সাধারণ শত্রু 'কাফের' হিন্দুগণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বিজাপুরের প্রান্তরে সংমিলিত হইয়া চারিজন মুসলমান নরপতি বিজয়নগরাক্রমণার্থ (২০ জমাদল ৯৭২ হিজিরা = সোমবার ২৫ ডিসেম্বর ১৫৬৪ খৃঃ অঃ) সদলবলে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। বহুসহস্র অশ্বসেনা নবীন শস্যক্ষেত্র উৎসাদন করিতে করিতে কৃষ্ণা নদীর অদূরবর্ত্তী টালিকোট * নামক নগর ও দুর্গের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গটি দোননদীর তীরবর্ত্তী এবং ইহার সহিত কৃষ্ণার সঙ্গম স্থলের আটক্রোশ দূরে অবস্থিত। যে সময়ে মুসলমানবাহিনী টালিকোটে উপস্থিত হয়, তৎকালে দেশের অবস্থা আকাশ ও বায়ুর গতি সমস্তই

* কেহ কেহ বলেন দক্ষিণাপথ হইতে হিন্দুরাজত্বের গৌরবাপহারক উক্ত প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রের স্থানীয় নাম তিলাই-কোটি; কিন্তু ভারতেতিহাসের পাঠকবর্গের নিকট টালিকোট নামেই সমধিক পরিচিত, সুতরাং উহার পরিবর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন।

সৈন্যনির্য্যাতনের পক্ষে সমধিক অনুকূল ছিল। আলি আদিল তৎপ্রদেশের অধিপতি, সুতরাং তাঁহার সযত্নসংগৃহীত আহার সামগ্রীতে সকলে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, বিশ্রামলাভাশায় নদীতটসন্নিহিত প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন; এবং এই অবসরে আহার্য্যদ্রব্য ও যানবাহনাদির সুবন্দোবস্ত করিবার এবং নদীর কোন্ অংশে পার হইয়া বিজয়নগরাধিকারে, পদার্পণ করা সুবিধাজনক ইত্যাদি তথ্য জানিবার জন্য সুলতানগণ দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের বৃত্তান্তের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

এ সংবাদ বিজয়নগরের রাজধানীতে পৌঁছিতেও বিশেষ বিলম্ব হইল না। কিন্তু সেখানে কোনরূপ উদ্বেগ বা অশান্তির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছিল না। বিজয়নগরের অধিবাসিগণ মনে করিয়াছিলেন, দুইশত বৎসর বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মহম্মদীয়গণ বিজয়নগরের দক্ষিণ অংশেও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, এবারেও সুতরাং তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় ভগ্নমনোরথ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে —এ বিষয়ে আর তাঁহাদের মনে অণুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছিল না। পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে, বিজয়নগরের ন্যায্য সম্রাট সদাশিব সর্ব্বদা নির্জ্জন-বাসহেতু শাসনব্যাপারের বা মন্ত্রণাগৃহের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজকার্য্যের শীর্ষস্থানাধিষ্ঠিত রামরায় স্বীয় স্বভাবানুরূপ ঔদ্ধত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুদিগকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ফিরিস্তা বলেন, 'সুলতানগণের দূতগণকে রামরায় ঘৃণিতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন'। ইহা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাম রায় স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিরুমলকে (ফিরিস্তার মতে ইয়েল তুমরাজকে) একলক্ষ পদাতি, বিশ সহস্র অশ্ব এবং পাঁচ সহস্র হস্তীর সহিত কৃষ্ণানদীর পথ অবরোধ করিবার জন্য বিজয়নগরের সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণ করেন। অতঃপর তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর বেঙ্কটাদ্রিকেও আর একদল

সেনার সহিত প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং বিজয়নগরের অবশিষ্ট সেনাবল লইয়া মুসলমান বাহিনীর গতি প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই মহতী সেনা কর্ণাট, তৈলঙ্গ, মহীসুরীয়, মালাবরীয় এবং সুদূর দক্ষিণস্থিত তামিলগণ কর্তৃক সংগঠিত ও তদ্দেশীয় নায়কগণের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হয়। কাহারও কাহারও মতে বিজয়নগরের পক্ষে ছয়লক্ষ পদাত ও একলক্ষ অশ্ব ছিল। ফিরিস্তা বলেন, ৯ লক্ষ পদাতি, ৪৫ সহস্র অশ্ব, ২ সহস্র হস্তী এবং ইহার অতিরিক্ত আরও ১৫ সহস্র সহকারী ছিল। কিন্তু তাঁহার এতদ্বিষয়ক মন্তব্য এরূপ বিসংবাদী যে, তাঁহার গণনায় কোনমতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। এই হিন্দু সেনার সাধারণ সৈনিকগণ লঘু বস্ত্র পরিধান করিয়া, ভল্ল অথবা হ্রস্ব তরবারী দ্বারা যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিত।

মুসলমানসংঘ বহুদূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। চরগণ আসিয়া সংবাদ দিল, নদীর সমস্ত অংশই সুরক্ষিত; সুতরাং প্রবলবেগে সম্মুখ হইতেই নদী পার হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। নদীর দক্ষিণাংশ হিন্দুদিগের অধিকৃত। বিজয়নগর-সেনা তীরদেশে মৃত্তিকা উন্নত করিয়া মঞ্চ প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং তদুপরি কামানশ্রেণী বিন্যস্ত করিয়া মুসলমানদিগের উত্তরণ রোধ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। মুসলমানগণ হঠাৎ বিশ্রামস্থল ত্যাগ করিয়া নদীপ্রবাহ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন অবগত হইয়াই, হিন্দু তীররক্ষকগণ, শত্রুগণ সম্মুখ দিয়া কোন মতে নদী পার হইতে না পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণতট ধরিয়া চলিলেন। ক্রমাগত তিন দিন পর্য্যন্ত মুসলমানগণের নানা চাতুরী প্রয়োগেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায়, সুলতানগণ অবশেষে রাত্রিযোগে সহসা সেনামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া নদীতটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভাগ্যক্রমে তরণস্থল হিন্দুদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ঈদৃশ মহাসুযোগ প্রাপ্ত হওয়ার পর আর

বৃথা কালক্ষয় না করিয়া সবেগে নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাতে রাম রায়ের বিস্ময়ের সীমা না থাকিলেও তিনি ভীতিবিহ্বল না হইয়া সাধ্যমত আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল সমাগত হইতে না হইতে, মুসলমানবাহিনী তাঁহার সেনানিবাসের পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতে তিরুমল ও বেঙ্কটাদ্রিও নিশ্চিন্ত বা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা অবিলম্বে ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া শত্রুসেনার সম্মুখীন হইবার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন।

১৫৬৫ খৃঃ অঃ ২৩ জানুয়ারী, মঙ্গলবার, উভয়দল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। হিন্দু সেনার বামপ্রকোষ্ঠে তিরুমল, মধ্যভাগে সাধারণ সেনাপতি রূপে স্বয়ং রামরায় ও দক্ষিণপার্শ্বে তাঁহাদের অন্যতম ভ্রাতা বেঙ্কটাদ্রি স্ব স্ব বিভাগের অধিনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্বয়ং আলি আদিলের অধ্যক্ষতায় বিজাপুরবাহিনী তিরুমলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রস্তুত, মধ্যভাগে হুশেন নিজামশাহের সেনা যুদ্ধোৎসাহে দণ্ডায়মান, এবং গোলকুণ্ডা ও আহমদনগরের সেনাদল সুলতান আলিবারিদ ও ইব্রাহিম কুতুবশাহের অধিনায়কতাধীন হইয়া বেঙ্কটাদ্রির সম্মুখীন হইল। সম্মিলিত সুলতান-দিগের সেনাদল সুদীর্ঘ কামানশ্রেণী বিন্যস্ত করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। দ্বাদশ ইমামের পতাকা সম্মুখে উড্ডীয়মান হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মান্ধতায় ও যুদ্ধোৎসাহে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছিল। মুখ্য সেনাধ্যক্ষ নিজামশাহের সজ্জিত সেনার সম্মুখভাগে ছয়শত কামান তিন-শ্রেণীতে সন্নিবেশিত ছিল। সর্ব্বাগ্রে প্রথম শ্রেণীতে বৃহৎ কামানসমূহ, মধ্য-পংক্তিতে ক্ষুদ্রতর কামান, এবং সর্ব্ব পশ্চাতের শ্রেণীতে সহজে ঘূর্ণায়মান কামান সমূহ সজ্জিত ছিল। এই আগ্নেয়াস্ত্রশ্রেণীর সম্মুখে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত শরনিক্ষেপ ও কামান রক্ষার জন্য দুই সহস্র বিদেশীয় লঘুহস্ত ধনুষ্ক (তীরন্দাজ) সুবিন্যস্ত ছিল। শত্রুসেনার আক্রমণের সহিত তাহারা অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিল, এবং রাম রায়-পরিচালিত

বাহিনী নিজামশাহের আজ্ঞানুবর্ত্তী সেনার নিকটস্থ হইবা মাত্র, তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যব্যূহের পৃষ্ঠদেশে প্রস্থান করিলে, তাহাদিগের অন্তরালে অবস্থিত কামানশ্রেণী এক্ষণে উপযুক্ত অবকাশ পাইয়া, আক্রমণকারিগণের উপর এরূপ ভাবে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল যে, হিন্দু-প্রতিযোগিগণ নিতান্ত বিক্ষোভিত ও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন এবং অনবরত সংহারজনিত অবিরাম লোকক্ষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন।

এ সময়ে রামরায়ের বয়ঃক্রম ৯৬ বৎসর হইলেও, তিনি ৩০ বৎসর বয়স্ক বীরের ন্যায় সাহসী ও উদ্যমী ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে বহুক্ষণ উপবিষ্ট থাকিতে অসমর্থ হইয়া, রামরায় সেনাধ্যক্ষগণের নিষেধ অবহেলা করিয়া শিবিকারোহণ পূর্ব্বক সোৎসাহে ও নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধব্যাপার সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পলায়ন প্রয়োজন হইলে শিবিকা হইতে তাহা অসম্ভব ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করিয়া, সকলে তাঁহাকে সংকল্প পরিত্যাগের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও, তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, নবীন যুবকের ন্যায় প্রবর্দ্ধিত উদ্যমের সহিত যুদ্ধক্রীড়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শত্রুদিগকে বালকের ন্যায় হেয় মনে করিতেন এবং যুদ্ধের এই সঙ্কট অবস্থায়ও স্বপক্ষের বিজয়লাভে এরূপ স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে, যুদ্ধে নিহত করিয়া হুসেন নিজামশাহের ছিন্ন মুণ্ড এবং আদিল শাহ ও গোলকুণ্ডাধিপতি ইব্রাহিমকে জীবিতাবস্থায়ই লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া স্ব সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য পার্শ্বচরবর্গকে আদেশ প্রদান করেন। ইহাতে বোধ হয়, প্রতিযোদ্ধগণের মধ্যে কেবল নিজামশাহকেই তিনি বীর বলিয়া গণনা করিতেন, সুতরাং সংহার ব্যতীত আয়ত্তাধীন করা সম্ভব বিবেচনা করেন নাই। অপর সকলকে তিনি এতই কাপুরুষ ভাবিতেন যে, তাঁহারা মৃত্যুভয়ে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত

হইয়া বন্দীভাবে বিধর্ম্মী শত্রুর সম্মুখীন হইতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না স্থির করিয়াছিলেন। এই অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতাবশতঃই বিজয়নগরের হিন্দু-সাম্রাজ্যের উপর দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা প্রলিপ্ত হয়।

যুদ্ধ এ সময়ে সাধারণভাবেই চলিতেছিল। হিন্দুগণের আগ্নেয়াস্ত্র অনলোদ্গীরণে বিরত ছিল না; কিন্তু তাহা হইতে ক্ষতির তুলনায় হাতাহাতি যুদ্ধেই মুসলমানগণের অধিক বলক্ষয় হইতে লাগিল। এই অবসরে রামরায় শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া স্বর্ণজড়িত ও মুক্তাগুচ্ছমণ্ডিত চন্দ্রাতপতলে রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া কোষাধ্যক্ষকে অর্থরাশি তাঁহার সমক্ষে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন এবং প্রচার করিয়া দিলেন যে, তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে যে কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ্যতাতিশয্য প্রদর্শন করিবে, তাহাকেই উপযুক্ত অর্থের সহিত রত্ন ও স্বর্ণাভরণ সংযোজিত করিয়া তদ্দণ্ডেই পারিতোষিকরূপে প্রদত্ত হইবে। যুদ্ধ ক্রমে বিজয়নগর পক্ষেরই অনুকূলে মীমাংসিত হইবে বলিয়া এক্ষণে সকলে আশা করিতে লাগিল। এমন কি, রামরায়প্রমুখ বিচক্ষণ সেনাপতিগণ যখন স্থির করিলেন যে, হিন্দুসেনার বন্দুকের আর একবার মাত্র আক্রমণেই মুসলমানগণের পরাজয় অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধ হইবে, হঠাৎ এই সংকটসময়ে মুসলমানগণ গোলাগুলির পরিবর্ত্তে তাম্রমুদ্রাপূর্ণ করিয়া কামান ছুড়িতে লাগিলেন। এই আক্রমণে হিন্দুগণের পাঁচ সহস্র সেনা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল এবং তাঁহাদিগের ব্যূহমধ্য এরূপ আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল যে, স্বপক্ষের অগ্নিবর্ষণ একটু প্রশমিত হইলেই, পাঁচ সহস্র মুসলমান অশ্বারোহী ক্ষিপ্রবেগে বিক্ষিপ্ত শত্রুসেনার মধ্য দিয়া রামরায়ের অভিমুখে অবাধে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ সেনাপতি অবিলম্বে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে এই মুহূর্ত্তে নিজামশাহের একটি যুদ্ধ-হস্তী রণোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া রামরায়ের শিবিকার দিকে ধাবিত হইল। ইহাতে বাহকগণ ভয়ে আত্মহারা হইয়া শত্রুগণ মধ্যেই

রামরায়ের শিবিকা ফেলিয়া পলায়ন করিল। রামরায় এক্ষণে স্বীয় বিপদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া,উপায়ান্তরাভাবে শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া যেমন অশ্বারোহণ করিতে যাইবেন, অমান এক দল মুসলমান সৈনিক সবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সসৈন্য পরিবেষ্টিত রামরায়কে বন্দী করিয়া লইল। অতঃপর হিন্দুগণ উপযুক্ত নেতার অভাবে ক্রমশঃ শিথিল ভাব অবলম্বন করিতে লাগিল। এদিকে রামরায় নিজামশাহের সম্মুখে নীত হইলে, তিনি বর্ষীয়ান হিন্দুবীরের মস্তক ছিন্ন করিয়া উন্নত ভল্লাগ্রে প্রোথিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এই নৃশংস আচরণ অনুষ্ঠিত হইবার পর অনভিজ্ঞ হিন্দুসৈনিকগণ, নায়ক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন অবগত হইয়া, ভগ্নোদ্যমে ঃক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল; অচিরেই বিজয়নগরের বিপুলবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে যেখানে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। এই সুযোগে মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে এরূপ পাশবিক পদ্ধতিতে হনন করিতে লাগিল যে, তাহাদিগের রুধির-প্রবাহে রণরঙ্গভূমির সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া গেল। রামরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেঙ্কটাদ্রি যথার্থ বীরের ন্যায় মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যুদ্ধান্তে বিজয়নগরের বহু যুদ্ধবিজয়ী শূরগণের মধ্যে এক তিরুমলই অবশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু বীরভ্রাতৃগণের বিরহে ও জন্মভূমির দুর্গতিদর্শনে তাঁহার জীবন ভারভূত বোধ হইতে লাগিল। আবার তিনি যখন শুনিলেন, হুসেন নিজামশাহ স্বহস্তেই তাঁহার নবতিপর বৃদ্ধ ভ্রাতা রামরায়ের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন এবং এই নিতান্ত কাপুরুষোচিত কার্য্য সম্পাদনের সময় বলিয়াছিলেন, 'তোমার উপর আমার প্রতিশোধ লওয়া হইল, আমার প্রতি ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রেত, তাহাই সম্পন্ন হউক,'—তখন তাঁহার হৃদয় কিরূপে আমূল আলোড়িত ও শোকের অঙ্কুশ তাড়নে বিক্ষোভিত হইয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহাদের অন্যতম শত্রু আদিল শাহ পর্য্যন্ত

হুশেন শাহের এতাদৃশ বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে যার পর নাই মর্ম্মবেদনা অনুভব করেন। *

মুসলমানগণ এইরূপে পাপক্লিন্ন পঙ্কিল পথ অতিক্রম করিয়া সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানভূমি বিজয়শিখরের সানুদেশে উপনীত হইয়াই দূর হইতে শিখরশোভা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল ও ক্রমশঃ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। বিজয়ী মুসলমান যোধগণ অচিরেই বিজয়নগরের রাজধানী আক্রমণে উদ্যত হইবেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া হিন্দুগণ সত্বরপদে নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন; কিন্তু তাহাতে নগররক্ষার কোন উপায়ই অবলম্বিত হইল না, কারণ তাঁহারা রণক্লান্তিতে এরূপ কাতর ও প্রাণভয়ে এরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতান্তরাল বা নগর প্রাচীর হইতে বিজয়োল্লসিত নগরগামী মুসলমানগণের গতিরোধের শেষ চেষ্টা প্রদর্শনেও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই কাপুরুষোচিত উদ্যমহীনতার ফলে, সাম্রাজ্য-গৌরবনাশের সহিত রাজধানীর শোভাসমৃদ্ধির ধ্বংসও পূর্ণ মাত্রায় সংসাধিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবারবর্গের চিন্তায় তাঁহারা ঈদৃশ নিষ্ক্রিয়ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। মুসলমান সৈনিকগণ বিজয়নগরের লুণ্ঠনলুব্ধ স্বর্ণ, রত্ন, অশ্ব, দাসাদিতে বিপুল ধনাধিকারী হইয়া গেল। যে যাহা হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, তাহাকেই তাহার পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করা হইল। কেবল মাত্র বিজয়লব্ধ হস্তিযূথ সুলতানগণ বিভক্ত করিয়া লইলেন, কারণ হস্তি-

* যাঁহারা দোষবিশেষ জাতিবিশেষের বংশানুক্রমিক বলিয়া সকলের উপরই আরোপ করিতে শশব্যস্ত, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত, যে বংশে আউরেঙ্গজীবের জন্ম, সেই বংশেই পূর্ব্বে আকবর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যে অভিজাত ইংরাজ শাসনকর্ত্তার সংকীর্ণতার চরম আদর্শ লাট কর্জ্জন, আবার সেই ইংলণ্ডীয় অভিজাত্যের ও রাজশক্তির প্রতিনিধি ভারতবন্ধু লর্ড রিপণ। ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিভিন্নতায় লোক স্তুতিনিন্দার পাত্র হয়। একজাতি সমুৎপন্ন বলিয়া সকলের ভাগ্যে সমান গৌরবলাভ ঘটিলে, কটনের ন্যায় ফুলারও ভারতবাসীর সমান প্রেমাস্পদ হইতেন। এই জন্যই প্রাচীন প্রবচন রহিয়াছে,—'জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিদ্ধন্যতে পূজ্যতে ক্বচিৎ।

সমূহ অপর সেনানী বা সৈনিকগণ-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও, তাহাদের উপর সুলতানগণ ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার ন্যায্য বিবেচিত হইত না।

এদিকে কতকগুলি পলায়নপর ভগ্নাশ সৈনিক দ্রুতপদে বিজয়নগরে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রের পরাজয়কাহিনী প্রচারিত করিল, অমনি রাজ-পরিবার ভয়চকিতচিত্তে সম্মুখে ধনরত্নাদি যাহা পাইলেন বা অনায়াসে হস্তগত করিতে পারিলেন, তাহাতে প্রায় পনের কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ, হীরক ও রত্নাদি, রাজপরিচ্ছদ এবং সুপ্রসিদ্ধ রত্নমণ্ডিত সিংহাসন ৫৫০ হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া বিশ্বস্ত অনুচরগণের রক্ষকতায় রাজকুমারগণ ত্রস্তপদে নগর পরিত্যাগ করিলেন। রামরায়ের হতাবশিষ্ট ভ্রাতা তিরুমল মহারাজ সদাশিবকে লইয়া দক্ষিণে পেনুকোণ্ডার দুর্গাভিমুখে পলায়ন করেন। সাধারণ নগরবাসিগণের পক্ষে এরূপ অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থায় পলায়নও অসাধ্য, সুতরাং মূল্যবান্ দ্রব্যসামগ্রী ভূমিতলে প্রোথিত করিয়া অপেক্ষাকৃত নবীন বয়স্কেরা আবালবৃদ্ধ বণিতাগণের রক্ষার্থ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুত হইয়া রহিল। নগরের যানবাহনাদি সমস্তই যোদ্ধৃগণের দ্রব্যাদি বহনার্থ রণক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল—মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নগর অধিকৃত হওয়ায়, প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ পায় নাই; সুতরাং লম্বাডি, কুরুবা এবং সন্নিহিত অপরাপর দস্যুদলের পক্ষে মহেন্দ্র যোগ উপস্থিত হইল। কাহারও কাহারও মতে, এই জাতীয় দস্যুদলের সমবেত ষড়যন্ত্রে নগরটি একদিনে ক্রমান্বয়ে ছয়বার আক্রান্ত ও পর্য্যুদস্ত হয়।

বিজয়োচ্ছ্বসিত মুসলমানবাহিনী, যুদ্ধক্ষেত্রেই রণক্লান্তি প্রশমিত করিয়া তৃতীয় দিবসে বিজয় নগরে প্রবেশ করে। সেই হইতে পাঁচমাস পর্য্যন্ত বিজয় নগরের ভাগ্যে আর বিশ্রাম শান্তি ঘটে নাই। লুণ্ঠন অবিশ্রান্ত ভাবেই চলিতেছিল,—সুতরাং কাহারও নিষ্কৃতির আশা ছিল

না। এই নগর লুণ্ঠনে সুলতান আদিলশাহ অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্যপুঞ্জের সহিত কুক্কুটীর অণ্ডের আকার সদৃশ একখণ্ড হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগের অভিযানের অন্যতর সহচর বিচারহীন ধ্বংসকার্য্যও নির্দ্দয়ভাবেই সমাহিত হইতেছিল। নাগরিকগণ এরূপ বর্ব্বরভাবে নিহত, এবং দেবমন্দির সৌধ প্রাসাদ এরূপ হৃদয়হীনতার সহিত ধূলিসাৎ হইতে লাগিল, যে কয়েকটি সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ও ইষ্টক-প্রস্তর খণ্ডের স্তূপ ব্যতীত বিজয়নগরের সুদৃঢ় হর্ম্ম্য প্রাসাদাদির পরিচায়ক আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের পূর্ব্বকীর্ত্তি গুলি এই সময়ে বিজয়নগর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। দেবমূর্ত্তিসমূহ চূর্ণীকৃত হয়, এমন কি এক প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড নৃসিংহ বিগ্রহ একেবারে খণ্ডবিখণ্ড করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাহার অঙ্গহানি করিয়া, ধর্ম্মান্ধ-গণ যেন কোনরূপে চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করে। সম্রাট্‌গণ উৎসব পরিদর্শনার্থ যে বেদীর উপর সমাসীন হইতেন, তাহার নানাকারুকার্য্য শোভিত ছাদও এই সময়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। সুপ্রথিত বিট্‌ঠলস্বামীর সুসজ্জিত মন্দির-গৃহে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়, তাহাতে মন্দিরের কারুনৈপুণ্যের সহিত দেবমূর্ত্তিও একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। সংক্ষেপতঃ মুসলমান-গণ ধর্ম্মবিদ্বেষে প্রোৎসাহিত হইয়া এরূপ শিল্পান্ধতার পরিচয়-প্রদান করেন যে, মুসলমান অভিযানের পর বিজয়নগর শ্মশানাকারে পরিণত হয়। এত ঝটিতি এতাদৃশ সুসম্পন্ন ও সমৃদ্ধ নগরের বিনাশসাধন জগতের অপর কোনও স্থানে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কথিত আছে, অতঃপর তিরুমল রায় ধ্বংসাবশিষ্ট বিজয়নগরে পুনরায় বসতিস্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রভুত্বে ও প্ররোচনায় অনেকে তথায় বাসস্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও, নগরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংকল্পে তিনি সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে পারেন নাই। বিজয়নগর সাম্রাজ্যধ্বংসী টালিকোটের যুদ্ধের পর হইতে, পূর্ব্ব-কালের প্রথিতনামা নগরটি অতীত গৌরবধ্বংসের সাক্ষীরূপে কেবল

নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। এখনও ভগ্নাবশেষের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অংশসমূহ কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিগত সমৃদ্ধির স্মৃতি কথঞ্চিৎ জাগরিত করিয়া দিতেছে। বন্ধুর, গুহা-সঙ্কুল ও নিম্ন পার্ব্বত্যভূমি জলপ্রণালি-সাহায্যে কিরূপে ইক্ষু ধান্য সমাচ্ছন্ন উর্ব্বরা ভূমিরূপে পরিণত হইত, যেন তাহাই বিবৃত করিবার জন্য, কালের কঠোর কবল উপেক্ষা করিয়া সেগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। নচেৎ বিস্তৃত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সুসম্পন্ন রাজধানীর উল্লেখযোগ্য তাদৃশ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই;—কতকগুলি গ্রাম্যকুটীর এক্ষণে সুদৃশ্য সৌধমালার ও প্রাসাদ শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়া আছে। এইরূপে ভারতের একটি মহা সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য কালগ্রাসে নিষ্পিষ্ট হইয়া অতীতের বিরামদায়ী বিস্মৃতিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে। এই যুগান্তরের পর সে স্মৃতির সম্পূর্ণ উদ্বোধন একরূপ অসম্ভব হইলেও, ভারতের এই অধঃপতনের দিনে তাহার দুঃখময়ী অস্ফুট স্মৃতিও যেন আমাদের কিয়ৎ-পরিমাণে সুখাবহ ও শিক্ষাপ্রদ। তাই বিরুদ্ধধর্ম্মী, বিভিন্ন প্রকৃতি, বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে যে টুকু তত্ত্ব সংগ্রহ সম্ভব, নির্ব্বিচারে তাহাই সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্য সমাজের গোচরার্থ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। যে উপাদান হইতে ইহা সংগৃহীত তাহা পক্ষপাত পরিশূন্য বা বিদ্বেষাসম্পৃক্ত হওয়া কদাপি সম্ভাবিত নহে। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে ইহার সহিত আনুসঙ্গিত আরও কত নূতন তথ্য সমুদ্‌ঘাটিত হইতে পারে, বা যেগুলি উপন্যস্ত হইয়াছে তাহা কতদুর সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার বিচার এক্ষণে হওয়া সম্ভবপর নহে;—তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ ও প্রমাণ প্রয়োগ পরবর্ত্তী অনুসন্ধারকগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের মাত্রার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যে অধঃপতিত জাতি আপনার পূর্ব্বগৌরব জিজ্ঞাসু হইয়া জাতীয় ইতিহাস আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে শিখে নাই, তাহার অবনতি প্রতিরোধের সাধ্য জগতের

ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং এরূপ জাতিকে যে অধো-গতির নিম্নতম স্তরে সংস্থাপিত দেখিতে পাই, তাহাতে আর বৈচিত্র কি? যাহারা মঙ্গলময় বিধাতা কর্তৃক কর্ম্ম-দোষে এইরূপে অভিশপ্ত, তাহা-দের পুনরভ্যুদয়ের কথা দূরে যা'ক, উন্নতির ছায়াও তাহাদের পক্ষে সুদূর পরাহত, এবং দূর হইতেও প্রণিধান করিয়া দেখিতে গেলে, তাহা পর্য্যন্তও ভবিষ্যদ্রূপ অন্তরিক্ষের আবরণে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

সেকালের দুর্গোৎসবের ফর্দ্দ

স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়া অঞ্চলে হস্তলিখিত মহাভারতের অনুসন্ধান করিবার সময়ে একখানি মহাভারতের মধ্যে একটি দুর্গোৎসবের ফর্দ্দ পান ; উহা কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হস্তগত হইয়াছে। ১১৮৭ সালে (১৭৮০ খৃঃ) বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ কোন গ্রামে জনার্দ্দন শর্ম্মার বাটীতে যে দুর্গোৎসব হইয়াছিল, তাহার খরচ দেখুন :—

প্রতিমা	৫৲	চূণ	৴১০
পুরোহিতের দক্ষিণা	৮৲	চন্দন ধূপাদি	।৵১০
ভাল চাউল ১৭/মণ	৬।০	বাস্তুকর	৩৲
কাপড়	৮৲	গুড়	৬৲
ভাল আতপ চাউল ৪/ মণ	২।০	দধি	৫৲
		দুগ্ধ	৩৲
কলাই	॥০	চিনি	॥০
ঘৃত ১/মণ	৫৲	কাষ্ঠ	২৲
ময়দা ৪/ মণ	২।৵০	নারিকেল	২৲
ক্ষীর	৫৲	লবণ	॥০
সন্দেশ	৭৲	পান ও সুপারি দিঃ (?)	১৲
তরকারী দিঃ	২৲	পাঁঠা ১টা	॥০
তৈল ১॥০ মণ (?)	২৲	নাপিত	॥০
ফল ফুলারী	১৲	বেহারা	১৲
মসলা দিঃ	১৵০	মোট খরচ	৮০৸৵১০

দেখিলেন, পূজা বড় মন্দ হয় নাই। দ্রব্যাদির মূল্যের অনুপাতে পুরোহিত মহাশয়ের (বা দুই জনের) দক্ষিণার ব্যবস্থা এবং বাদ্যকর বিদায়ের কথাটাও এই সঙ্গে অনুধাবন করিবেন। পুরোহিত ঠাকুরেরা এখনও সাধারণতঃ ঐরূপ দক্ষিণাই পাইয়া থাকেন। সে কালে কাটোয়া অঞ্চলে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে প্রায় সকলেরই অল্প বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। এখনও অনেকের সেইরূপ আছে; ক্রমশঃ দৈন্যদশার প্রসার হইতেছে। জনার্দ্দন শর্ম্মাকে মোটা চাউল ক্রয় করিতে হয় নাই, তাহা তাঁহার জমি হইতেই হইত, উল্লিখিত ফর্দ্দ দৃষ্টে অনুমিত হইবে। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য সরু চাউল এবং নৈবেদ্যের আতপ মাত্র ক্রয় করিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহার পূজায় কত লোকে প্রসাদ পাইয়াছিল অনুমান করুন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ টাকায় কত কার্য্য হইত, তাহা একালের সস্তা টাকার আমলের অন্নহীন আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না।

তখন সামান্য মজুরের বেতন দিন এক আনা ছিল। পল্লীর মজুর এখন সাধারণতঃ দিন চারি আনা পায়। দ্রব্যের মূল্যের অনুপাতে পারিশ্রমিক তুলনা করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা অনুভব করিবেন। অবশ্য এই ব্যবস্থায় কৃষককুলের বড় সুবিধা হয় না। কিন্তু তখন উৎপন্ন অধিক হইত এবং খাদ্য দ্রব্যের বেশী রপ্তানী ছিল না; সুতরাং সকলেই পেট ভরিয়া দুবেলা খাইতে পাইত। বর্ত্তমানের মত নিজের সৃষ্ট অভাবে সেকালের লোকের কষ্ট পাইবার অভ্যাসও জন্মে নাই। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই ভদ্র লোকও সন্তুষ্ট থাকিতেন; গৃহিণীর রূপার খাড়ু পুঁইচেই যথেষ্ট মনে করিতেন। এখন পেটে না খাইয়াও সাজ পোষাক করান হয়। শত বর্ষ পূর্ব্বে দ্রব্যাদির সুলভতার কথায় নবাবী আমলের ইতিহাসের শেষে যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে। সে কালে শস্যাদি এতই সুলভ ছিল যে, কাটোয়া অঞ্চলে আশু ধান্যের গ্রাহক জুটিত না। ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের

এক ষষ্টিবর্ষবয়স্ক তন্তুবায়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার পিতার যৌবনা-বস্থায় তাহার পিতামহ এক কৃষক মণ্ডলের গৃহজাত কার্পাসসূত্র দ্বারা আট খানি বস্ত্র বয়ন করে। উহার বাণী (মজুরী) এক টাকার বিনিময়ে মণ্ডল তন্তুবায়ের গৃহ হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে খামারে আশু ধান্য বিক্রয় করেন। পিতাপুত্রে সমস্ত দিন ধরিয়া মস্তকে বহন করিয়া ঐ ধান্য আনা শেষ হইল না দেখিয়া বৃদ্ধ তন্তুবায় মহা ক্রোধে মণ্ডলকে বলিল,—'তুমি আমার ধানে আরও ধান মিশাইয়া দিয়াছ, বড়ই অন্যায়!'

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাণীপুষ্পবতী।

কত যুগ যুগান্তর শতাব্দীর ঢেউ
গিয়াছে বহিয়া, তবু কাব্যকর কেউ
তোমার চরিত্ত মধু হর্ষে করি পান
করেনি গুঞ্জন, দেবি, করে নাই গান
কাব্যের কাননে ; তুমি আছ উপেক্ষিতা,
শারদ-পার্ব্বণ গতে পুলিনে পতিতা
দেবী-পঞ্জরার মত ! বিজয়ার সুরে
ক্ষীণা স্মৃতিটীর গীতি কাঁদে আর ঘুরে
ক্ষুব্ধ ইতিহাস বুকে, আমি ক্ষুদ্র অতি
আসিয়াছি উদ্বোধিতে তোরে পুষ্পবতি !
বিন্ধ্যগিরি পদতলে নাম চন্দ্রাবতী
প্রসিদ্ধ নগরী ; রাজা ধর্ম্মশীল অতি—
তাঁরি গৃহে অজানিত সুমুহূর্ত্তে কেন
লভিয়াছ জন্ম তুমি ; সেথা যে কখনো
তপোবন উপকণ্ঠে স্নাতকের মুখে
শুনি উচ্চ বেদধ্বনি, শুকসারি সুখে
বসিয়া বন-বীথির শ্যামল প্রচ্ছায়ে
করে নাই প্রতি ধ্বনি কার সাধ্য কহে ?
সেথা যে কখনো নীল শান্তনীরাময়
স্বচ্ছ দীর্ঘিকার পারে, নিশীথ সময়

শব্দহীন তালী কুঞ্জ মৃদু মর্ম্মরিলে,
কূজনিলে কুঞ্জ-সখী, পবন স্বাননে,
বিয়োগ-বিধুরা কেন ধীরে অতি ধীরে
জাগিয়া, ঢালেনি প্রাণ দীর্ঘিকার নীরে
কে পারে কহিতে তাহা? কে বলিতে পারে,
সসামন্ত বসন্তের প্রথম সঞ্চারে
সেথা যে তরুর শাখে পাখিটী গাহিত
সর্ব্ব অগ্রে, যে তরুটি প্রথমে ফুটিত,
সেই তরু তলে কোন প্রোষিতা ভর্ত্তৃকা
সঙ্গিনী-বেষ্টিতা, মৌন যৌবন-চারিকা,
বসন্ত-উৎসব-কালে প্রাণকান্তে স্মরি
সজল জলদ মত গুমরি গুমরি
কাঁদে নাই! জন্মভূমি তব পুষ্পবতি,
স্বর্গ সম পুণ্যভূমি শোভান্বিতা অতি!
কল্পনার নেত্রে কবি হেরিয়াছে তোরে,
প্রফুল্ল শারদ প্রাতে উঠি ভোরে ভোরে,
শেফালি নিকুঞ্জ তলে কুড়াইছ ফুল
কুমারি পূজার—লুটে রক্তিম দুকুল!
দ্বিপ্রহরে বেণু বন কীচকে কূজনে
যবে মুখরিত, দেখি নম্র সখী সনে
আত্মহারা স্তব্ধ মৌন রয়েছ বসিয়া,
প্রতি গানে গুঞ্জরণে পূর্ণ ধরা দিয়া!
সায়াহ্নে দীঘির পাড়ে জননীর মত,
শুভ্র রাজ হংস দলে সম্বোধিছ কত
তীরে আগমন হেতু, নীবার কনিকা

স্বর্ণ থালে—সবে তুমি কিশোরি বালিকা !
ধূসর সন্ধ্যায়, যবে ধীরে চক্রবাকী
যেতেছে উড়িয়া পদচিহ্ন তীরে আঁকি,
নদীর পাষাণ-ঘাট বিশাল মন্দিরে
সাঁজের আরতি-ধ্বনি ললিত গম্ভীরে
উঠেছে বাজিয়া, ভেদি কুঞ্জতল আর
পূর্ণিমার চন্দ্র সবে জোছনা বিস্তার
করিতেছে, হেনকালে সেই নদী পারে,
অভ্রভেদী মন্দিরের অলিন্দের দ্বারে,
ঘৃতসিক্ত দীপ গুলি প্রজ্বলিত করি,
আছ তুমি দাঁড়াইয়া হে দিব্য সুন্দরি !
গাত্র তব কণ্টকিত, চোখে তব জল,
করুণায় উচ্ছলিত শ্রীমুখ-মণ্ডল !
তোমার রূপের কথা, গুণের কাহিনী,
ভ্রমি বহু জনপদ কানন তটিনী—
অবশেষে এক দিন আনিল ডাকিয়া
উপযুক্ত পতি তব ভারত খুঁজিয়া।
শৈশবে কৈশরে ভ্রমি বনে উপবনে
নদী-তীরে, শৈলে শৈলে রম্য তপোবনে
মাতৃ অঙ্কে, হৃদয়ের প্রান্তে যেই মধু
সঞ্চিত করিয়াছিলে, তুমি নব বধূ
নিমেষে ঢালিয়া দিয়া পতির চরণে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে বহিলে স্তবনে ;
কুসুম স্তবক ভারে নম্র অবনত—
লতাইলে পতি বক্ষে লতিকার মত !

কঙ্কন সঙ্কেতে তব পতির ভবনে
উড়িয়া আসিত কিনা ললিত কূজনে
খাদ্য লোভী পক্ষিকুল? তব জলষেকে
নব বসন্তের প্রাতে? করতালি তালে
নাচাইতে কিনা তুমি তাম্রীকুঞ্জ-তলে
ভবন-শিখীরে? দেবি, সংবাদ তাহার
গ্রাসিয়াছে অতীতের মহা পারাবার।
ইতিহাস কহে শুধু ছিলে পতিপ্রাণা,
একখানি পূর্ণিমার অনন্ত জোছনা
একটি বিশ্বের মুখে, অনাহত ধ্বনি
যোগীর শ্রবনে মাত্র উথলে যেমনি।

বসন্তের অন্তে যথা মলয় পবন
ভীম প্রভঞ্জন রূপে দিয়া দরশন
পুষ্পিত কানন ভাঙ্গে, নিয়তি তোমার
অলক্ষ্যে ফিরায়ে দিল গতি আপনার!
সৌরকর-রাশি যেই জল কণাটীরে
লয়েছিল বাষ্পাকারে স্বচ্ছ নীলাম্বরে,
আজি তারে নিক্ষেপিলা বহু উচ্চ হ'তে
আঁধার পাতাল গর্ভে কাঁদিয়া ভ্রমিতে
অবরুদ্ধ জলদলে! আহা আচম্বিতে
খসিল সিন্দুর তব সীমন্ত হইতে!
আসন্ন প্রসবা হেতু রাখিলে জীবন,
রবিহীন দেশে সূর্য্যমুখিটী যেমন!

একদা বসন্ত প্রাতে, মালিয়া গিরির
স্তব্ধ শাল-বন-প্রান্তে শিখা চিতাগ্নির

উঠিল জ্বলিয়া; ক্ষুব্ধ প্রচ্ছন্ন গুহায়
নিজ পুত্রটীরে সঁপি ঋষি-পত্নী পায়—
দাঁড়াইলে রাজেন্দ্রাণী চিতাগ্নির পাশে
উষার সকাশে যথা শুকতারা ভাসে
রজনীর অবসানে। ধ্বনিল অমনি
প্রনব ঝঙ্কার আর রুদ্র শঙ্খধ্বনি
সংযত তাপস দলে; মৃদু মন্দ হাঁসি
বিধূনিত বহ্নিমুখে নিজ-তনু নাশি,
অপার আনন্দ রাজ্যে করিলে গমন,
মরু অতিক্রমি পাখী নন্দনে যেমন!
শ্যামল প্রান্তর লগ্ন ঘন বন শিরে
দেখি যবে দিনান্তের রশ্মি কাঁপে ধীরে
অন্তিম শয্যায়, শীর্ণা নদীটির বাঁকে
ধবল বালুকা স্তূপে যবে পড়ে থাকে
মুমূর্ষু জোছনা, তব স্মিরিতীর সনে
কত যে পাগল করা কথা আসে মনে।
মনে হয় যে দেশের ইতিহাসে আঁকা
তোমার মতন নারী প্রতিমার লেখা,
সে দেশ কি রবে দেবি, চির অজানিত
বনজাত সুরভিত কুসুমের মত।
স্বর্গে আছে কল্পতরু ভারতের মেয়ে,
ভারতের স্বর্ণযুগ নিও তুমি চেয়ে!

শ্রীমোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক চিত্র।

বাঙ্গালায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের শাসনভার পরিত্যাগ করিলে, আদিম খাঁ মোগল-রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ইহাকে লোভী ও অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু সুবাদার তাঁহাদের উপর কিরূপ অত্যাচার করিতেন, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত নাই।

১৬৭৮ সালে আজিম খাঁর মৃত্যু হইলে সম্রাট আরংজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম সুবাদার হইয়া ঢাকায় আসিলেন। ঐ বৎসরের শেষেই আসামরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিল। রাজকুমার, ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া যথেষ্ট সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং আসামযুদ্ধের জন্য কয়েকজন নিপুণ গোলন্দাজের সাহায্য চাহিলেন। উভয় কোম্পানিই অসামর্থ্য জানাইয়া অব্যাহতি পাইল। ইংরাজেরা এই সময়ে ২১০০০ টাকা দিয়া বিনা শুল্কে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিবার সাময়িক অধিকার কিনিয়া লইল। সুলতান মহম্মদ আজিমের প্রদত্ত নিশান নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রদত্ত নিশানের অনুরূপ বলিয়া এখানে প্রদত্ত হইল না।

আসামযুদ্ধে মোগলসেনা জয়লাভ করিল। সুবাদার আরাকানজয়ের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়ে কিন্তু পশ্চিম ভারতে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সুলতান আজিমকে আরাকানবিজয়ের সংকল্প ত্যাগ করিয়া সম্রাটের আদেশে রাজপুতানায় যাত্রা করিতে হইল।

ভারতের এই দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র সমরে দেশের হিন্দুমুসলমান রণরঙ্গে মাতিল। যুদ্ধের শেষে মুসলমান রাজশক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং তাহার ভগ্নাবশেষ লইয়া দুই একটি হিন্দু রাজশক্তি অভ্যুত্থিত হইলেও দেশের এরূপ বলক্ষয় হইয়া গেল যে, ঐসকল হিন্দুরাজশক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিল না। শেষে দেশের এরূপ দুর্ব্বল অবস্থা দাঁড়াইল যে, সুযোগ বুঝিয়া বৈদেশিক ইংরাজ বণিক বিজেতা হইয়া বসিল; ভারতে ইংরাজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিল। ক্রমে হীনবল হিন্দু ও মুসলমান রাজ্য সকল বিজিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিল। সুতরাং ঐ সময়ের সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বলিয়া সংক্ষেপে তাহার কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বিবৃত হইল।

সকলেই জানেন—মহাবীর সুলতান বাবরশাহ যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষে মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। পাঠানেরা হিন্দুদিগের হস্ত হইতে ভারতের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিল; কিন্তু দেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। জয়া হইলেও পূর্ব্বাপর হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিল। বাবরসাহ কর্ত্তৃক মোগল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেই বন্দোবস্তই চলিল; হিন্দু ও পাঠান পরস্পরে মিলিত না হইলেও মোগলের শত্রু হইয়া রহিল।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন শাহ পাঠানশক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন। আবার হিন্দুপাঠানে পূর্ব্ববৎ দাবাখেলা চলিল। দেশে শান্তি নাই; পাঠান একটু নরম হইয়া

পড়িল ; অমনি আবার হুমায়ুন সাহ আসিয়া উপস্থিত। পাঠান হারিল ; আবার মোগলেরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহান্ আকবর শাহ মোগলের নেতৃপদ গ্রহণ করিলেন। আকবর বালক ও নিরক্ষর (১) হইলেও অসামান্য প্রতিভাশালী ও দূরদর্শী ছিলেন। ঘোর বিপদের ক্রোড়ে তাঁহার জন্ম, ঘোর বিপদের ক্রোড়ে তাঁহার লালন পালন—বর্দ্ধন, শিক্ষা, বিপদের ন্যায় প্রতিভা-পোষক সংসারে আর নাই. আকবর ভারতের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং হিন্দুদের সহিত মিশিয়া ভারতে হিন্দু মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। দেশবাসী হিন্দুজাতি বৈদেশিক মোগলদিগকে 'আপনার' করিয়া লইল।

আকবরের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অবসান হইল। তাহার পর বিলাসী জাহাঙ্গীর ও চতুর রাজনীতিজ্ঞ শাহ জেহানের সময়েও আকবর-প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি দৃঢ়মূল হইতে লাগিল। তাহার পর আসিলেন—আরংজেব। এই সম্রাট যদি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের কার্য্য-সুদৃঢ় করিবার জন্য আপনার অসীম শক্তি নিয়োজিত করিতেন, তাহাহইলে হয়ত ভারতবর্ষ আজি মহা-সমৃদ্ধ পরাক্রান্ত হিন্দু মুসলমান সাম্রাজ্যে অর্থাৎ ভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া শুক্র তারার ন্যায় পৃথিবীর পূর্ব্বাংশ উজ্জ্বল করিয়া থাকিত। ভারতের দুরদৃষ্টবশে হিন্দুমুসলমানের যুক্তসাম্রাজ্য আরংজেবের সহিল না।

(১) আকবরের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে কবির একটি সুন্দর কবিতা আছে। এক সময়ে তুরস্ক হইতে এক রাজদূত আকবরের সভায় আইসে, সে তুরস্ক সুলতানের পত্র লইয়া আসিয়া ছিল। আকবর উপযুক্ত সম্মানের সহিত পত্র গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু বর্ণজ্ঞান ছিল না বলিয়া পত্র খানি উল্টা ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তুর্কি রাজদূত দেখিলেন ; নিতান্ত বে-আদবি হইলেও তাঁহার মুখে একটু হাস্য রেখা দেখা দিল। তখন রাজকবি ফয়েজি বলিলেন—

দর হজরতে মা সুখুন মগুইদ্
পয়গম্বরে মানিজ উম্মি বুদ।

অর্থাৎ আমার বাদশাহকে নিরক্ষর বলিয়া উপহাস করিও না, জান ত আমাদের হজরত মহাম্মদ নিরক্ষর ছিলেন।

তিনি হিন্দুদিগকে ছাটিয়া ফেলিয়া দ্বিতীয় স্পর্শশূন্য মোগলরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। নানারূপে হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তখন আবার ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড সামরিক শিবিরে পরিণত হইল। ভারত-রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। আরংজেব বিধর্ম্মী-দের উপর উৎপীড়ক জিজিয়া কর বসাইলেন। জিজিয়া হিন্দুদের সকল সম্পত্তির উপর হাজারকরা ৬৷৷০ টাকা এবং ইউরোপীয় ও অন্য খৃষ্টানদের ব্যবসায়ের উপর শতকরা ১৷৷০ দেড় টাকা হারে নির্দ্ধারিত হইল।

সুলতান আজিম বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলে নবাব সায়েস্তা খাঁ আবার সুবাদার হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই দেশে জিজিয়া চালাইলেন। ইংরাজ কোম্পানির হুগলিস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকটও এই করের দাবি করা হইল, তাঁহারা এই নূতন কর দিতে অস্বীকার করিলেন; শেষে নবাবের ব্যবহারার্থ কয়েকটি পারস্য দেশীয় অশ্ব দিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নূতন সুবাদার আসিলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নূতন করিয়া নিষ্কর ব্যবসায় চালাইবার আদেশ লইতে হইত। ইহাতে পরিশ্রম ও ব্যয়ভূষণ ছিল। এই ঝঞ্ঝাট একবারে মিটা-ইবার জন্য কোম্পানি সম্রাটের দরবারে একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার বলে সম্রাটের নিম্নলিখিত নূতন ফারমান বাহির হইল এবং ঐ ফারমান ইংরাজি ১৬৮০ সালের ৮ জুলাই তারিখে হুগলিতে আসিল।

হিজিরা ১০৯১ (ইংরাজি ১৬৮০ সাল)

ঈশ্বরের নামে প্রদত্ত

সুরাটের বর্ত্তমান ও ভাবী শাসনকর্ত্তৃগণ, যাঁহারা বাদশাহের অনুগ্রহ কামনা রাখেন, তাঁহাদের প্রতি আগে—

ইহা সাধারণের বিদিত হউক যে এই সুসময়ে উভয় পক্ষের সম্মতি

অনুসারে ইংরাজ জাতির সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত স্থির হইল যে তাহারা যে এতদিন শতকরা ২ টাকা হিসাবে ব্যবসায়ের শুল্ক দিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়া তাহাদের নিকট শতকরা দেড় টাকা হিসাবে জিজিয়া আদায় হইবে।

অতএব এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে ঐ বন্দরে আমার রাজত্ব কালের ত্রয়োবিংশবর্ষের ১লা শাবান তারিখ হইতে ভবিষ্যতে ঐ জাতির নিকট ব্যবসায়ে শুল্ক ও জিজিয়া মোট শতকরা ৩।৷০ সাড়ে তিন টাকা হিসাবে আদায় হইবে। অন্য সকল স্থানে কে যেন কোন কর্ম্মচারী এই জাতির নিকট শুল্ক,রাদারি,পেশকশ,ফারমায়েশ বা অন্য কোন বাবতে কিছু দাবি না করেন বা তাহাদের কার্য্যে বাধা না দেন। কারণ ইহা সম্রাটের আদেশে নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশ সকলে পালন কর।

আমার রাজ্যশাসন কালের ত্রয়োবিংশবর্ষে ২৩ শফর তারিখে লিখিত।

[এই রাজাদেশে সুরাট বন্দরে যে সকল পণ্য আমদানি হইত, তাহার উপর শুল্ক নির্ণয় হইয়া গেল, কিন্তু এ আদেশের বলে কোম্পানি দেশের অন্যান্য বন্দরে তাহাদের যে সকল পণ্য আমদানি হইত, তাহার উপর কোন প্রকার শুল্ক দিতে অস্বীকার করেন; কারণ সুরাট বন্দর ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র শুল্ক আদায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং এই কথা লইয়া অন্যান্য প্রদেশে বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রদেশের শাসন-কর্ত্তারা বোধ হয় রাজশাসনের এইরূপ অর্থ করেন, যে সুরাট বন্দরে যে সকল পণ্য আমদানি হইবে, তাহার উপর সুরাট ভিন্ন অন্যত্র যে যে স্থানে ঐ সকল পণ্য বিক্রীত হইবে, সেই সকল স্থানে স্বতন্ত্র শুল্ক লাগিবে না। কিন্তু যে সকল পণ্য বিলাত হইতে অন্যান্য প্রদেশের বন্দরে নূতন আমদানি হইবে, তাহার উপর অবশ্য শুল্ক লাগিবে। ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন যে, বাদশাহের উক্ত আদেশ ইচ্ছা করিয়া অস্পষ্টার্থ করা হইয়াছিল এবং তাহাতেই শেষে গোল বাধিয়া উঠে, কিন্তু কিরূপ আবেদন ও কিরূপ

নিবেদনের উপর ঐরূপ আদেশ হয়, তাহা না জানিলে ঐরূপ ডিক্রী দেওয়া যায় না।]

যাহাই হউক কোম্পানীর হুগলিস্থ কর্ম্মচারিগণ সকলকে জানাইবার জন্য এই বাদশাহি আদেশ মহা জাঁকজমকের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাহাদের কুঠী হইতে ৩০০ তোপ হইল এবং নদীতে যে সকল ইংরাজি জাহাজ ছিল, তাহারাও ঐরূপ তোপ দাগিল।

বঙ্গদেশে কোম্পানীর বাণিজ্য ও কুঠী সকল এতদিন মান্দ্রাজের অধীন ছিল, ক্রমে বাঙ্গালার বাণিজ্য বেশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল; মূলধন বেশ বাড়িল; এবং সম্রাটের উপরি-উক্ত সনন্দও আসিল। সেই জন্য কোম্পানী এখন বাঙ্গালার বাণিজ্য ও কুঠী সকল স্বাধীন করিয়া দিলেন। কোম্পানির এক ডিরেক্টর হেজেস্ সাহেব বঙ্গদেশে গবর্ণর হইয়া আসিলেন। বঙ্গসাগরকূলে ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে যত ইংরাজ কুঠী ছিল, সমস্তই তাঁহার অধীনে আসিল, হুগলি তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাঁহার মানগৌরব রক্ষার নিমিত্ত এক কর্পোরালের অধীনে ২০ জন ইংরাজ-সৈনিক মান্দ্রাজের সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গ হইতে আসিল এইরূপে বঙ্গদেশে ইংরাজ-সামরিক শক্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা হইল; ইংরাজরাজশক্তির ভিত্তি স্থাপন হইল। (ইংরাজি ১৬৮১-৮২ সাল)।

১৬৮২ সালে বিহারের এক জমিদার গঙ্গারাম বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং প্রচার করিয়া দেয় যে, সম্রাটের পুত্র সুলতান আকবর পিতার সহিত বিরোধ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন এবং তাহার আশ্রয় লইয়াছেন, অনেক লোক গঙ্গারামের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহীর সংখ্যা পুষ্ট করে। গঙ্গারাম পাটনা অবরোধ করিল। সুবাদার যুদ্ধে সাহসী না হইয়া নগরমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন। শেষে কাশী ও ঢাকা হইতে সৈন্যসাহায্য আসিলে বিদ্রোহীরা অবরোধ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

এই বিদ্রোহের সময় পাটনার কুঠিয়াল পিকক ও অন্যান্য ইংরাজেরা

নগরের ছয় ক্রোশ দূরে শিঙ্গির কুঠীতে ছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। কিন্তু এই সাহেবেরা বিদ্রোহীদের পক্ষ—এই সন্দেহ করিয়া নবাব তাহাদের সোরা ক্রয় বন্ধ করিয়া দেন এবং পিকক সাহেবকে কারারুদ্ধ করেন। অনেক চেষ্টার পর অনেকের মধ্যস্থতায় শেষে পিককের কারামুক্তি ঘটিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডবাসী আরও অনেক লোক বঙ্গদেশে আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ ইহাদিগকে অনধিকার ব্যবসায়ী বলিয়া আখ্যাত করে। এদেশে তাহাদের ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবার জন্য এবং আপনাদের সম্পত্তি সুরক্ষিত করিবার জন্য হুগলির ইংরাজ গবর্ণর ১৬৮৫ সালে নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট গঙ্গানদীর মুখে বা তীরে দুর্গনির্ম্মাণের অনুমতি চাহিলেন।

সায়েস্তা খাঁ চতুর ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বুঝিলেন —বিদেশীয় ইংরাজ এ দেশে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া বসিলে দেশীয় রাজশক্তির বিরোধী স্বতন্ত্র শক্তি এখানে দৃঢ়মূল হইবে। তিনি কোম্পানীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না ; আরও আদেশ দিলেন যে, তদবধি ইংরাজ কোম্পানীর দেয় বার্ষিক মোট ৩০০০ টাকার পরিবর্ত্তে তাহাদের সকল আমদানির উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে শুল্ক আদায় হইবে।

এই আদেশ লইয়া কাশিমবাজারের ফৌজদারের সহিত তত্রত্য ইংরাজ কুঠিয়ালদিগের বিরোধ উপস্থিত হইল। সেই বিরোধের ফলে ইংরাজের জাহাজ সকল মাল না পাইয়া বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া গেল। তখন বাঙ্গালার বাণিজ্য একবারে ত্যাগ করা অথবা যুদ্ধ করিয়া ঐ বাণিজ্যের অধিকার স্থাপন করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর রহিল না।

স্বেচ্ছাচারী মুসলমানের নিকট অতিরিক্ত বশ্যতা দেখাইয়া তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ কোম্পানির বঙ্গদেশীয় বাণিজ্য নষ্ট করিতে বসিয়াছেন বলিয়া বিলাতস্থ ডিরেক্টরগণ তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা মাদ্রাজের

গবর্ণরকে আদেশ করিলেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া সম্রাটের এরূপ হুকুম করিবেন—যাহাতে ইংরাজেরা গঙ্গানদীর মুখস্থিত একটা জনশূন্য দ্বীপ অধিকার করিয়া বসিতে পারে ; আর যাহাতে নবাব বা তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর নিকট কোন প্রকার শুল্ক বা বাব আদায় করিতে না পারে, সেই জন্য তাহাদিগকে যেন গঙ্গামুখের পশ্চিমবর্ত্তী ইংলিবন্দর দুর্গ সুরক্ষিত করিবার অধিকার প্রদত্ত হয়।

ডিরেক্টারেরা বুঝিয়াছিলেন যে সম্রাট তাঁহাদের এই আব্দার শুনিবেন না। সেই জন্য আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিপূরণার্থ নবাব ও তাঁহার প্রভু সম্রাট আরংজেবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমসের অনুমতিগ্রহণ করিলেন।

ইংলণ্ডে সমরোদ্‌যোগ আরম্ভ হইল। ছোট বড় দশ খানি রণপোত সুসজ্জিত হইল। দশ অবধি সত্তর পর্য্যন্ত কামান এক এক জাহাজে বসিল। এড্‌মিরাল নিকলসন সেনাপতি হইলেন। ৬০০ গোরা বিলাত হইতে আসিল। মান্দ্রাজ হইতে আরও ৪০০ সৈন্য লইয়া এই বাহিনী বঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

সেনাপতি নিকলসনের উপর আদেশ ছিল—তিনি প্রথমে বালেশ্বর গিয়া সেখানকার কুঠিয়ালদিগকে জাহাজে তুলিয়া লইবেন। তাহার পর চট্টগ্রামে গিয়া ঐ বন্দর অধিকার পূর্ব্বক দুর্গ সুরক্ষিত করিবেন। এই উদ্দেশে দুই শত কামানও ঐ বাহিনীর সহিত আসিয়াছিল। চট্টগ্রাম অধিকারের পর নিকলসন মোগলদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আরাকানের রাজাকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া স্বপক্ষ করিবেন এবং ঐ অঞ্চলের হিন্দুরাজা ও জমিদারদিগের সহিতও ঐরূপ সন্ধি করিবেন। চট্টগ্রামে টাকশাল স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের নামাঙ্কিত টাকা প্রস্তুত করিবেন এবং রাজ্যাধিকার করিয়া রাজস্ব আদায় করিবেন।

চট্টগ্রামে কোম্পানির সম্পূর্ণ প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইল, নিকলসন ঢাকায়

যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ডিরেক্টরেরা ধরিয়া লইলেন যে ইংরাজ সৈন্যের আগমনেই নবাব সসৈন্য নগর ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তখন নবাব নিম্নলিখিত সর্ত্তে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন।

১ম। নবাব চট্টগ্রাম বন্দর ও চট্টগ্রাম রাজ্য ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিবেন।

২য়। মোগল প্রজাদের নিকট ইংরাজ বণিকদিগের যে টাকা পাওনা আছে, তাহা নবাব দিবেন।

৩য়। ইংরাজেরা চট্টগ্রামে টাকা প্রস্তুত করিবেন, ঐ টাকা নবাব বাঙ্গালায় চালাইবেন।

৪র্থ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাটেরা কোম্পানীকে যে সকল অধিকার দিয়া গিয়াছেন, তাহা পুনঃস্থাপিত হইবে।

৫ম। উভয় পক্ষের ক্ষতি ও খরচা উভয় পক্ষের জিম্মা।

৬ষ্ঠ। সম্রাট ও সুরাটের প্রবল ইংরাজ কর্ম্মচারী এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মঞ্জুর করিবেন।

কোম্পানির ডিরেক্টরেরা সম্রাট ও সুবাদারকে দিবার জন্য দুখানি পত্র এডমিরাল ওয়াট্‌সনের হস্তে দিয়াছিলেন। এ দেশীয় কর্ম্মচারীরা মোগল সম্রাটের আদেশ পত্রের বিধান লঙ্ঘন করাতে কোম্পানির যতপ্রকার ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা সমস্ত এই দুই পত্রে বিবৃত ছিল।

এই সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া সকলবিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই বিবাদের চারিটি মূল কারণ লক্ষিত হয়।

১ম। ইংরাজের বঙ্গদেশীয় ব্যবসায় যখন অল্প প্রসর ছিল, সেই সময়ে একটা মোট শুল্কের বন্দোবস্ত হয়। ক্রমে ব্যবসায়ের বহুবিস্তৃতি হইলে মোগল কর্ম্মচারীরা তদনুরূপ অধিক শুল্কের দাবি করিল; পূর্ব্ব বন্দোবস্তের দোহাই দিয়া কোম্পানির এজেন্টেরা ঐ দাবি পূরণ করিতে অসম্মত হন।

২য়। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা এদেশের লোক ও এদেশের রাজ-শক্তিকে অতি হীন বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্ববর্ণিত যুদ্ধযাত্রা ও পরবর্ণিত হাঙ্গামাঘটিত ব্যাপার তাহার প্রমাণ।

৩য়। ইংরাজেরা এদেশে সোরা প্রস্তুত করিয়া বিলাতে রপ্তানি করিত। সোরা সামরিক উপকরণ বলিয়া মোগল কর্ম্মচারীরা এই রপ্তানি সুচক্ষে দেখিত না।

৪র্থ। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা এদেশে থাকিয়া ক্রমে দেশের দলাদলিতেও মিশিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহাদের কুঠিয়াল পিকক সংসৃষ্ট ব্যাপার তাহার প্রমাণ। পিকক নির্দ্দোষ হইতে পারেন। কিন্তু প্রবাসী ইংরাজ যদি নির্লিপ্ত ভাবে কেবল আপনাদের বাণিজ্য লইয়াই থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের উপর কখনই রাজকর্ম্মচারীদিগের সন্দেহ জন্মিত না। বিশেষতঃ এই সময়ে চতুর ও সূক্ষ্মদর্শী সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের সুবাদার। তাঁহার ন্যায়পরতার খ্যাতিও ছিল। ফরাসি রত্নবণিক খ্যাতনামা টাভার নেয়ার সায়েস্তা খাঁকে ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিয়াছিলেন। তথাপি এই নবাবকে তিনি অত্যাচারী ও অধার্ম্মিক বলিয়া আখ্যাত করেন নাই।

প্রতিভাশালী, অসমবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রবলপ্রতাপ, মহাতেজস্বী আরংজেব কেমন এক দুর্ব্বুদ্ধিবশে এইসময়ে দেশের অনেক স্থানে অনেক অন্তঃশত্রুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রবল দাবানলের ন্যায় বিদ্রোহানল জ্বলিতে ছিল। নব অভ্যুদয় মাহারাট্টা বহুবিস্তৃত মহাসমৃদ্ধ মোগলসাম্রাজ্য টলমলিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই অন্তঃশত্রু দমনেই আরংজেবের সমগ্রশক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। বহিঃশত্রুদমনের অবকাশ তাঁহার আদৌ ছিল না; সে উদ্যোগও ছিল না; সেই ঘোর বিপদের সময় সেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করাও চলে না। আরও বঙ্গদেশে সায়েস্তা খাঁর গুণে অন্তঃশত্রু ছিল না। সেই কারণে এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য-সামন্তও ছিল না। বিশেষতঃ সুদূর পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী চট্টগ্রামাদি স্থান প্রায়

একরূপ অরক্ষিতই ছিল। এ সকল অবস্থা কোম্পানির অবিদিত ছিল না। ভারতে সাম্রাজ্যস্থাপনের অভিপ্রায় তখন না থাকিলেও কোম্পানি এই সুযোগে বলপূর্ব্বক আপনাদের বাণিজ্য সম্পূর্ণ দৃঢ়মূল ও নির্ব্বিঘ্ন করিয়া লইতে প্রয়াসী হইতেন।

ইংরাজের উপরিবর্ণিত রণপোত বাহিনী বঙ্গসাগরে আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ডিরেক্টরদিগের উপদেশ কার্য্যে ঠিক পরিণত হইল না। প্রতিকূলবায়ুবশে জাহাজগুলি সুশৃঙ্খল থাকিল না। আসিতেও অনেক বিলম্ব ঘটিল। অধিকাংশ জাহাজ চট্টগ্রামে না গিয়া গঙ্গামুখে প্রবিষ্ট হইল এবং হুগলি বন্দরের সম্মুখে আসিয়া নঙ্গর করিল।

ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে মান্দ্রাজের গবর্ণর ৪০০ সৈন্য বাঙ্গালায় পাঠাইলেন এবং এখানে এক দল পর্টুগিজ পদাতি সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চার্ণক সাহেবকে আদেশ করিলেন।

ইংরাজ সৈন্যের হুগলি আগমন সংবাদে সায়েস্তা খাঁর সন্দেহ ও উদ্বেগ জন্মিল। তিনি উভয় পক্ষের নির্ব্বাচিত মধ্যস্থ দ্বারা বিবাদ মিটাইবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। পাছে ইংরাজেরা তাঁহার কথায় অসম্মত হইয়া বিবাদ বাধায়, এই অঞ্চলের একদল সৈন্যও হুগলিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। ১৬৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর তিন জন ইংরাজসৈনিক নবাবের সৈন্যদিগের সহিত বিবাদ বাধাইয়া মার খাইল। অমনি দলে দলে ইংরাজ সৈন্য চলিল; নবাবের সৈন্য নগরের বাহিরে শিবিরে ছিল। সংবাদ শুনিয়া তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রীতিমত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ৬০ জন মোগল সৈনিক হত ও অনেকে আহত হইল। এড্‌-মিরাল নিকালসন জাহাজ হইতে নগরের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ৫০০ বাটী ভাঙ্গিয়া পুড়িয়া গেল; ইংরাজের কুঠিতেও আগুন ধরিয়া গেল। এই কুঠিতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের সোরা ও অন্যান্য পণ্য-দ্রব্য ছিল।

এক দল নাবিক সৈন্য জাহাজ হইতে নামিয়া নগর প্রাকারস্থ কামান-গুলার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তখন হুগলির ফৌজদার ভীত হইয়া যুদ্ধ নিবৃত্তির প্রার্থনা জানাইল। ইংরাজেরা বলিয়া পাঠাইলেন—ফৌজদার যদি দহ্যমান কুঠি হইতে তাঁহাদের সোরা ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যগুলি বাহির করিয়া জাহাজে তুলিয়া দিতে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহারা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবেন। ফৌজদার তখনই সম্মত; প্রস্তাব মত কার্য্য হইল।

তখন ফৌজদার ও চার্ণক সাহেবে সাক্ষাৎ হইল। এইরূপ স্থির হইয়া গেল যে যতদিন পর্য্যন্ত ইংরাজেরা নূতন ফারমান না পাইবেন, ততদিন তাহাদের পূর্ব্ব স্বত্ব সমস্ত বজায় থাকিবে।

এই যুদ্ধের সংবাদ যথা সময়ে ঢাকায় পৌঁছিল। নবাবের ক্রোধের ইয়ত্তা রহিল না। পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশিম বাজারে কোম্পানির যে সকল কুঠি ছিল. সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ হইয়া গেল, এবং ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য পাঠাইলেন।

ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন,—হুগলিতে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত সুতানটিতে থাকিলে জাহাজের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। এই পরামর্শ স্থির হইল। তাহারা ২০শে ডিসেম্বর হুগলি ছাড়িয়া সুতানটিতে আসিলেন। এই সুতানটি বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর অন্তর্ভুক্ত।

ক্রমশঃ

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

"শোণপুরে হরিহর ছত্রের মেলা।"

হরিহর ছত্রের মেলা অনেকেরই নিকট—অপরিচিত নহে। ভারত-বর্ষের মধ্যে এরূপ বৃহৎ মেলা আর কুত্রাপি হয় না। এই মেলা অবশ্যই একটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। এজন্য এতৎসম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত করিতে যত্নবান হইলাম।

বিহারের অন্তর্গত সারণ জেলার শোণপুর গ্রামে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই মেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই শোণপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ হরিহর নাথ (হরি অর্থাৎ বিষ্ণু, এবং হর অর্থাৎ শিব) ঠাকুর দ্বয়ের মন্দির আছে। হরিহর নাথের মন্দির সমীপে এই মেলা হয় বলিয়া এই মেলার নাম হরিহর ক্ষেত্রের মেলা। হিন্দুস্থানীরা ক্ষেত্রকে "ছেত্র" উচ্চারণ করিয়া থাকে; ছেত্র হইতে এখন ছত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে ইহাকে হরিহর ছত্রের মেলা বলা হয়।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার প্রায় পনর দিন প্রথম হইতে এই মেলা বসিতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে নানাস্থানের সওদাগরগণ ঘোড়া, হাতী, মহিষ, বলদ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ এই মেলাতে আনিতে আরম্ভ করে। গোরক্ষপুর, কানপুর, ছাপরা, বাঁকিপুর, পাটনা, কলিকাতা এবং অন্যান্য বহুস্থানের অনেক বড় বড় দোকানদার এই মেলাতে আসিয়া দোকান করিয়া থাকে। ক্রমে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে লোকজন আসিয়া জমা হইতে আরম্ভ হয়। দ্বাদশীর দিন হইতে দর্শক বৃন্দের সংখ্যা ভয়ানক রূপে বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণিমার দিন এই মেলা পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণিমার দিনই জনতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ক্রেতা, বিক্রেতা ও দর্শক-

বৃন্দ লইয়া অন্যূন দেড়লক্ষ লোক এই দিন মেলায় সমবেত হইয়া থাকে। এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা এতদ্দেশে একটী প্রসিদ্ধ স্নানের যোগ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শোণপুরের প্রায় এক ক্রোশদক্ষিণে গণ্ডক ও গঙ্গা নদীর সঙ্গম। এই সঙ্গম স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে বলিয়া এতদ্দেশে কথিত হইয়া থাকে। এই স্নান উপলক্ষেই পূর্ণিমার দিন এত অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই মেলা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এমন কোনই জিনিষ নাই যাহা এই মেলাতে বিক্রীত হয় না। প্রায় একক্রোশ দীর্ঘ এবং অর্দ্ধক্রোশ প্রস্থ স্থান ব্যাপিয়া মেলা বসিয়া থাকে। চাউল, ডা'ল, তেল, লবণ, তরকারী ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি সকল রকমের জিনিষ এই মেলায় বিক্রীত হয়। হাতী ও ঘোড়ার বিক্রয়ই এই মেলার একটী বিশেষত্ব। এত অধিক সংখ্যক হাতী ঘোড়া ভারতের আর কোন বাজারে একত্রিত হয় না। যেথানে ঘোড়া বিক্রয় হয়, সেথানে কেবল ঘোড়া; সুশিক্ষিত হৃষ্ট পুষ্ট উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সওদাগরী ঘোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া তিন টাকা দামের পর্য্যন্ত সকল রকমের ঘোড়া। যেথানে হাতীর বাজার, সেথানে এইরূপ নানা রকমের অসংখ্য হাতী। দেখিলে বাস্তবিকই যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হয়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইদিকেই কেবল অসংখ্য নরমুণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। এই মেলাতে যেমন সুন্দর অশ্ব হস্তী পাওয়া যায়, তেমনি অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গরু বলদও পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের রংপুর, দিনাজপুর এবং ঢাকা অঞ্চলের অনেক পাইকার আসিয়া এই মেলা হইতে গাই ও বলদ ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

এই মেলা উপলক্ষে স্থানীয় রেল কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। দ্বাদশীর দিন হইতে চারিদিক হইতে স্পেশাল ট্রেণ চলিতে আরম্ভ

হয়। গঙ্গার দক্ষিণতীরস্থ বাঁকিপুর হইতে ভয়ানক লোকের ভিড় হইয়া থাকে। এই সময় শোণপুর ও দিঘাঘাটের মধ্যে ঘন ঘন স্পেশাল ট্রেণ চলিতে থাকে। পূর্ণিমার দিন চারিদিক হইতে স্পেশাল ট্রেণ আসিতে থাকে। এই দিন শোণপুর ষ্টেশন হইতে মেলা পর্য্যন্ত কেবল নরমুণ্ডে আচ্ছাদিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য মেলাস্থলে চারি পাঁচটী বুকিং আফিস খোলা হয়।

নানাস্থান হইতে অনেক বড় বড় রাজা, জমীদার, নবাব প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি সৌখীন দ্রব্য ক্রয়ের জন্য এই মেলাতে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোড়া ও হাতী ক্রয়কারীর সংখ্যাই অধিক। পূর্ণিমার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই ছাপরা হইতে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া মেলার চার্জ্জ গ্রহণ করেন। এইখানেই তাঁহার আদালতও বসিতে থাকে। কার্য্যাধিক্যের জন্য এই সময় মেলাতে অস্থায়ী ভাবে একটী অতিরিক্ত পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হয়। এই ঘটনা হইতেই প্রতীত হইবে যে, এই মেলা কিরূপ অসাধারণ। বাস্তবিক যিনিই দেখিবেন, তাঁহাকেই বিস্মিত হইতে হইবে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে লোক যেন মেলাতে আসিয়া ঢালিয়া পড়ে। শোণপুর সামান্য একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র। কিন্তু কিছুদিনের জন্য ইহার এমনি পরিবর্ত্তন হইয়া যায় যে, দেখিলে বোধ হয় যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ।

কিন্তু পরাধীন দেশের লোকের যে দুর্দ্দশা, তাহা এই মেলাতেও সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। প্রজার সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ কখনও কোনস্থানেই দৃষ্টিপাত করেন না। এই খানেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? জেলা বোর্ডের ও মিউনিসিপ্যালিটির আফিস পর্য্যন্ত এইখানে খোলা হইয়া থাকে, কিন্তু মেলার স্বাস্থ্যের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নিপতিত হয় না। অনবরত জনস্রোত ও গাড়ীঘোড়ার চলাচলে

সমগ্র মেলাস্থানে এত ধূলি উড়িতে থাকে যে, মধ্যাহ্নকালে লোকজনের চলাচল অতীব কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। কিছু দূর হইতে দেখিলে ইহাকে ধূলি-সমুদ্র বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে পুলিশের ঘাটী বসে, চারিদিকে পুলিশের কড়া পাহারা থাকে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তায় জলসেচনের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য মনে করেন না। কেবল যে স্থানটুকু ব্যাপিয়া সাহেব মহল, সেই স্থানে জলসেচন করা হয়; অন্য স্থানে নহে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কেবল রাজদ্রোহ দমনেই ব্যতিব্যস্ত, প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপাত করিবার অবসর অল্প বলিয়া বোধ হয়। ফলে সমাগত লোকদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের, এমন কি গো, মহিষ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতিরও ক্রয়বিক্রয় এই মেলাতে হইয়া থাকে। নাচ, গান, তামাসারও অবশ্য অভাব হয় না। নানাস্থান হইতে আগত অনেক থিয়েটার, সার্কাস্ প্রভৃতি মেলায় সমাগত দর্শকমণ্ডলীর মনে হর্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে। মেলার সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অংশ হইতে বেশ্যা পল্লী; সে নরকচিত্রের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। তবে একটি কথা এই যে, এদেশে চরিত্রের মূল্য অতি অল্প।

মেলার যে অংশে সাহেবদিগের আড্ডা, সেই অংশে যে বাজার বসে, তাহার নাম ইংলিশ বাজার। এই ইংলিশ বাজারেই সব বড় বড় দোকান থাকে। ঘোড়ার সাজ বিক্রী ইহার একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কানপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘোড়ার সাজের দোকান এইখানে আসিয়া থাকে।

মেলার মধ্যভাগকে নাখাশ এবং দক্ষিণ ভাগকে মিনাবাজার নামে অভিহিত করা হয়। মিনাবাজারে সাধারণতঃ কাপড় ও মণিহারীর দোকান বেশী। এই বাজারে অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট লাঠি ও ধনুক বিক্রীত হয়। ইহা ছাড়া মেলার যে অংশে ঘোড়া বিক্রয় হয় তাহাকে ঘোড়াহাটা;

যথায় গো-মহিষাদি বিক্রীত হয় তাহাকে বয়েল হাটা এবং যথায় হস্তী বিক্রীত হয় তাহাকে পিলহাটা বলা হইয়া থাকে।

পূর্ণিমার পরও প্রায় দশ দিন পর্য্যন্ত দোকান পত্র এবং পনর ষোল দিন পর্য্যন্ত গরু ও হাতী ঘোড়ার বাজার থাকে। সর্ব্বসমেত গরু ও হাতী-ঘোড়ার বাজার প্রায় একমাস এবং অন্যান্য জিনিষের দোকান প্রায় বিশ দিন ধরিয়া থাকে।

মেলার উত্তরাংশে সাহেবদিগের একটি নাচঘর আছে। সাহেবেরা মিলিত হইয়া এইখানে আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রযত্নে ঘোড়দৌড়ও হইয়া থাকে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার।

গৌড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ

(৭)

চতুর্থ অধ্যায়।

পাণ্ডুয়া।

পুরাকালে পাণ্ডুয়া এক বৃহৎ জনপদ-রূপে পরিচিত ছিল। উহ আংরেজাবাদের (ইংরেজবাজারের) বারো মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নগরে অসংখ্য লোকের বাস ছিল এবং সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজ্যারম্ভ হইতে রাজা কংস পর্য্যন্ত ৫২ বৎসরে ছয় জন নরপতি তথায় রাজত্ব করেন। (১) ৭৯৫ হিজরীতে (১৩৯২ খৃঃ) কংসের পুত্র জালাল উদ্দীন এথান হইতে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। তদীয় পিতার রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ায় বহুতর দেব-মন্দির নির্ম্মিত হয়; কিন্তু জালাল উদ্দীনের (২) সময় তৎসমুদয় ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। তথাপি তাঁহার রাজত্বকালেও নগরে ঘন বসতি ছিল। এক্ষণে পাণ্ডুয়া বন জঙ্গলে

(১) হিজরী ৭৪৩—৭৯৫ সন মধ্যে; ইলাহি বক্স সম্ভবতঃ শামসুদ্দীনের পূর্ব্বাধিকারী আলীমোবারককেও ইহার মধ্যে ধরিয়াছেন। কাহারও মতে মোবারক এক বৎসর পাঁচমাস এবং কাহারও মতে পাঁচবৎসর রাজত্ব করেন। ৭৪১ সন (১৩৪০ খৃঃ) হইতে তাঁহার রাজত্বারম্ভ বলিয়া কথিত হয়। গোলাম হোসেনও জালাল উদ্দীনের মন্দিরের বিষয় এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াসের পাণ্ডুয়ায় আগমন এবং আলী মোবারক কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ব্লকম্যান সাহেব পাণ্ডুয়াকে আলী শাহের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(২) ইহাঁর পূর্ব্ব নাম যদু; নুর কুতব তাঁহার জালাল উদ্দীন নাম করণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সাধু জালাল উদ্দীনের নামানুকরণেই এই নাম প্রদত্ত হয়। মালদহের ভোলানাথ নামক স্থানের নিকট 'যদুনগর' নামে এক পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিপূর্ণ হওয়ায় হিংস্র জন্তু প্রভৃতির আশ্রয় স্থান হইয়া আছে। অধিবাসী-দিগের মধ্যে কেবল শাহ জালাল উদ্দীন তাব্রিজি ও নূর কুতব আলমের সমাধি ও মস্‌জেদের রক্ষকগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। নগরের স্বাস্থ্য অতি কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর হর্ম্ম্য অট্টালিকার চিতাভস্ম বনানী-সমাকীর্ণ হইয়া থাকিলেও, নিম্নলিখিত ধ্বংসাবশেষ গুলিই উল্লেখ যোগ্য এবং কতকটা ভাল অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

বড়ি দর্‌গাহ (বড় মন্দির।)

এই দর্‌গাহের মধ্যে আরবাইন খানা (১) এবং হজরত (২) শাহ জালাল তাব্রিজির অপরাপর অট্টালিকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান হর্ম্ম্যটি ৭৪২ সনে (১৩৪১ খৃঃ) সাধুর জন্য সুলতান আলী মোবারক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় কিন্তু বর্ত্তমান কালে উহার এমনি শোচনীয় অবস্থা যে, পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। (৩) ভগ্নাবশিষ্ট হর্ম্ম্যসমূহের কতক ফিরোজপুরের (গৌড়ের) মাতোয়াল্লি শাহ নিয়ামতুল্যা এবং কতক অপরাপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বড় আরবাইনখানা। এই হর্ম্ম্যটি অতি বৃহৎ এবং পূর্ব্বমুখে অবস্থিত; ১০৭৫ হিজরীতে শাহ-নিয়ামতুল্যা মাতোয়াল্লী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণের সন অট্টালিকার পূর্ব্বদিকের বাম ধারের এই মুখবন্ধ বাক্য দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে;—"এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার নির্ম্মাণ শেষ

(১) আরবাইন খানা ও মাকান আরবাইন উভয়ই চিল্লাখানার প্রতিশব্দ; এতদ্দ্বারা মুসলমান সাধু ফকিরগণের উপাসনার স্থান বা গুহা বুঝায়।

(২) আমাদের মনে হয়. এই সাধুর নিমিত্তই পাণ্ডুয়াকে হজরত বলা হয়; সুলতানগণের প্রভাবে উহার এই আখ্যা প্রদত্ত হয় নাই।

(৩) গোলাম হোসেনের ১৭৮৬ সনের রচনায় ইহার নিদর্শন থাকার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

হইবার সময় 'মন্দির যেন' উজ্জ্বল হয়।' অন্যত্র লিখিত আছে, "ইহা সাধু শাহ জালালের মন্দির। পবিত্রচেতা শাহ নিয়ামতুল্যা ইহার পুনঃ সংস্কার করেন।" নবাব সিরাজদ্দৌলা যে রৌপ্য জলপাত্র উপহার প্রদান করেন, তাহা এখনও এই আরবাইন খানায় বিদ্যমান আছে। (১)

২। লক্ষ্মণসেনী-দালান। ইহাও শাহ নিয়ামতুল্যার কীর্ত্তি। বড়ি দরগাহের অভ্যন্তরস্থিত পুষ্করিণীর তীরে উহা প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমের দেওয়ালের প্রস্তরলিপির মর্ম্ম—"শাহ জালাল তাব্রিজির মন্দির সৈয়দ শাহ নিয়ামতুল্যা কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার দক্ষিণ দিকের দেওয়ালখানি সেরূপ দৃঢ় না হওয়ায়, হৈবতুল্যা মাতোয়াল্লির সময় অট্টালিকাটি প্রভূত পরিমাণে প্রকম্পিত হয়। বারজির মোহাম্মদ আলী ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া বিকাল রাজের পুত্র রাম রামকে ইহার পুনঃ সংস্কারে প্রেরণ করেন। ১১৩৪ হিঃ ২২ রজব তারিখ বাংলা ১১১৯ সনে মন্দির পুনঃ নির্ম্মিত হয়।"

এই অট্টালিকা 'লক্ষ্মণসেনী দালান' নামে অভিহিত হইবার কারণ কি এবং কেনই বা তদ্রূপ নাম করণ হইল, তাহা প্রকৃতই কৌতূহলোদ্দীপক।

৩। ভাণ্ডারখানা। ১০৮৪ হিজরীতে (১৬৭৩ খৃঃ) চাঁদখাঁ কর্ত্তৃক দক্ষিণমুখী করিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার লিপির মর্ম্মানুবাদ ইতি পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। তামুরখানা। এই গৃহে একটি চুল্লি ছিল, তাহা এক সাধু মস্তকোপরি রক্ষা করতঃ স্বীয় গুরুর আহারীয় দ্রব্য সিদ্ধ করিতেন। ভগবান জানেন, ইহা সত্য কি মিথ্যা। এই গৃহের এক কক্ষের দক্ষিণ

(১) স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহোদয় বেভারিজ সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা কোন জল-পাত্র উপঢৌকন দেন নাই। তিনি প্রকৃত পক্ষে এক 'কাটরা' (রৌপ্য রেলি) দান করেন এবং তাহা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।—J. A. S. B. 1895, p. 201.

দিকস্থ এক লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১০৯৩ হিঃ (১৬৮২ খৃঃ) সাদুল্লা কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। লিপিখানি এইরূপ :—

হজরত জালালউদ্দীন

পারস্যের তাব্রিজ (Tabriz) নগরে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি তৎস্থানের সেখ আবু সৈয়দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু পরলোক যাত্রী হইলে, তিনি সুহ্‌রাওয়ারদির (Suhrawardi) সেখ শিহাবুদ্দীনের ভৃত্য নিযুক্ত হন এবং তাঁহার জন্য এরূপ বহুতর কার্য্য সম্পন্ন করেন, যাহা কখনও কোন সাধুর শিষ্য গুরুর জন্য সম্পন্ন করে নাই। কথিত আছে, সেখ শিহাবুদ্দীন প্রতি বৎসর মক্কায় তীর্থ যাত্রা করিতেন; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জরাজীর্ণ হইয়া তিনি পথের আহার্য্য সমুদয় হজম করিতে সক্ষম হইতেন না। তন্নিমিত্ত সেখ জালাল উদ্দীন মস্তকে একটি 'দেগদানি' (চুল্লি) (১) এবং একটি রন্ধনপাত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতেন এবং গুরুর অভিপ্রায়ানুসারে উষ্ণ খাদ্য সরবরাহ করিবার নিমিত্ত ঐ চুল্লি নিরন্তর প্রজ্বলিত রাখিতেন। সেখ জালাল উদ্দীনের সহিত খোওয়াজ কুতবউদ্দীন ও সেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়ার মিত্রতা ছিল; এই ভাবে তিনি খোওয়াজের সময়ে দিল্লী আগমন করেন। সেখ নাজামুদ্দীন শাঘ্‌রি সেই খুল ইস্‌লাম—যাহার সমাধি বাল্‌কের বারহান উদ্দীনের পার্শ্বে অবস্থিত,—তাহার সহিত জালাল উদ্দীনের মনোমালিন্য ঘটে। তিনি জালালের বিরুদ্ধে এমনি এক কুৎসিত অভিযোগ আনয়ন করেন যে, তাহাতে জালাল বিলক্ষণ বিব্রত হইয়া অবশেষে দিল্লী পরিত্যাগ করতঃ বঙ্গদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। (২) বঙ্গদেশে উপনীত

(১) এই চুল্লি এখনো পাণ্ডুয়াতে আছে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাবৃত, তজ্জেতু উহার আদিম বর্ণ—তাম্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

(২) আবুল ফজল বলেন যে, জালাল উদ্দীন এই ঘৃণিত অভিযোগ হইতে

হইয়া তিনি এক জলাশয়ের ধারে উপবেশন করেন। পরে গাত্রোত্থান করতঃ অবগাহন করিয়া পার্শ্বস্থ লোকদিগকে বলেন যে, তিনি সেই খুল ইস্‌লামের আত্মার কল্যাণার্থ উপাসনা করিলেন,—ইস্‌লাম এই মুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। উপাসনানন্তর জালাল উপস্থিত জনমণ্ডলী সম্বোধন করিয়া বলেন যে, সেই খুল ইস্‌লাম আমাকে যেমন দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, আমার সেখ মোল্লা—ভাই তেমনি তাহাকে এই পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিলেন। (১)

জালাল বঙ্গদেশে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু তৎসমুদয় ফকির ও দরিদ্র সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়। এই সব সম্পত্তি তাহার মন্দিরের এলাকার অন্তর্গত এবং 'বাইশ হাজারী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে সাধুর 'ফতিহা' রজব মাসে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং ঐ মাসের প্রথম হইতে ২২শে তারিখ মধ্যে তথায় বহুদেশ হইতে নানা শ্রেণীর ফকির ও ভিক্ষুকের সমাবেশ হয়। ফতিহার দিন অর্থাৎ ২২শে রজব তারিখে ২২টি গো, ২২টি ছাগ, ২২ মণ তণ্ডুল এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য দ্রব্য ব্যয়িত হয়। এতদ্ব্যতীত সারাবৎসর আগন্তুক পথিকদিগকে আহারীয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। সাধুর স্মৃতি চিহ্ন—ঐ চুল্লি

বাহাউদ্দীন জাকারিয়ার সাহায্যে পরিত্রাণ লাভ করেন। বাহাউদ্দীনের দ্বারা স্ত্রীলোকটি স্বীকার করে যে, নাজামুদ্দীন কর্ত্তৃক তাহার সন্তান প্রসূত হইয়াছে এবং জালাল উদ্দীন জীবন-সলিল অপেক্ষাও পবিত্রতর। (See the story at length in the Siyaru-l-Arifin of Hamid commonly called Darvish Jamah.)

(১) জারালি কাম্বুর (Jarali Kambur শিয়ারূপ আরিফনের গ্রন্থানুসারে এই দ্বিতীয় দর্শন ঘটনা বদৌসে সংঘটিত হয়। তিনি আরো বলেন যে, সুলতান আলতামাস নাজামুদ্দীনের মিথ্যা রটনার প্রমাণ পাইয়া তাহাকে দণ্ডিত করতঃ তৎস্থলে সাহাউদ্দীনকে নিযুক্ত করেন।

এবং নাগরি অক্ষরে লিখিত একখানি পুস্তক (১) ঐ মন্দিরে অদ্যাবধি রক্ষিত হইতেছে। প্রাগুক্ত পুস্তকে তাঁহার কার্য্যাবলী বিবৃত হইয়াছে। তাহার সমাধি বঙ্গদেশের দেও (Deo) মহল বন্দরে অবস্থিত। হিজরী ৭৩৮ সনে (১৩৩৭ খৃঃ) জালাল মৃত্যুমুখে পতিত হন ; নিম্নলিখিত বাক্যে তাহা পরিব্যক্ত :—"জালালউদ্দীন ভগবানের তথা সাধুদিগের গৌরব স্থল।" (২) অনেকে বলেন যে, ইহা তাঁহার পাণ্ডুয়া পরিত্যাগের তারিখ;—ঐ খানে তিনি পাণ্ডুয়া হইতে চিরপ্রস্থান করিয়াছিলেন।

ছোটি দরগাহ।

বড়ি দরগাহের উত্তর পশ্চিম কিঞ্চিন্ন্যূন অৰ্দ্ধ মাইল দূরে হজরত নূর কুতবের মসজেদ। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, তথায় বহুতর সাধু ফকির ধরণীর শান্তশীতল গহ্বরে শয়ন করিয়া বিশ্রামসুখানুভব করিতেছেন। নূর কুতবের পরিবারবর্গও এই স্থানে সমাহিত হইয়াছে,—পশ্চিম ও উত্তর ভাগে তাহাদের সমাধি অবস্থিত। কালের কঠোর নিষ্পেষণে তৎসমুদয় বহু নিপীড়িত হইলেও ফটক ও কূপটি এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে।

মাকাল আরবাইন বা চিল্লাখানা। ইহা নূর কুতবের সমাধির পশ্চিম-সংলগ্ন। গৃহটি পুরাতন হইলেও তাহার ছাত প্রভৃতি একরূপ নূতনই আছে। পূর্ব্ব পার্শ্বে তিনটি প্রবেশ দ্বার, তাহার প্রত্যেকটির মস্তকে একখানি করিয়া লিপি খোদিত আছে ; উহা পূর্ব্বে অপর এক

(১) বেভারিজ মহোদয় বলেন যে, তিনি বটব্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে অবগত হন যে, এই গ্রন্থখানি নাগরি অক্ষরে লিখিত নহে, পরন্তু সংস্কৃত অক্ষরে ও ভাষায় গ্রথিত। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলয়ুধ ইহার গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া কথিত হন। গ্রন্থখানি প্রকাশের উপযুক্ত।

(২) বেভারিজ সাহেবের মতে, এই Chronogramএর গূঢ়ার্থ ৭৩৮ হিজরী না হইয়া ৭৩৭ হিজরী হয়।

অট্টালিকায় সংলগ্ন ছিল বলিয়া জানা যায়। দক্ষিণের লিপিখানি ৯১৫ হিঃ (১৫০৯ খৃঃ) হোসেন শাহের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত কোন মস্‌জেদে ছিল এবং বামপার্শ্বের খানি নসিরুদ্দীন মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত এক মস্‌জেদে সংলগ্ন ছিল। এই উভয় লিপিই সুপাঠ্য নহে।

মধ্যস্থানের লিপিখানি সাধুর 'সুফিখানায়' ছিল ; ইহার অক্ষর অতি ক্ষুদ্র, এই লিপিপাঠে জানা যায় যে, ৮৯৮ হিঃ (১৪৯৩ খৃঃ) সুফিখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। মোহম্মদ খাউস্, হজরত নূর কুতবের একতম বংশধর বলিয়া লিপিতে কথিত হইয়াছেন। (১)

সিজদা ঘর্ (বা উপাসনা স্থান।) ইহা মাকান আরবাইনের উত্তরস্থ একটি প্রাচীর পরিবেষ্টিত স্থান। এই প্রাচীরের শীর্ষদেশে একখানি সুদীর্ঘ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। মজ্‌লিসুল-মজালিস্ নামক এক রাজ-কর্ম্মচারীর দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত রাজকর্ম্মচারীচ ৮৮২ সনে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াতে একটি এবং শ্রীহট্ট জেলায় আর একটি মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবতঃ ইনিই ৮৭৬ হিজরীতে মালদহের মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করান। প্রাগুক্ত লিপিখানি সর্ব্বপ্রথম ইউসফ শাহের রাজত্বকালে ৮৮৪ হিঃ (১৪৭৯ খৃঃ) নির্ম্মিত এক মস্‌জেদে খোদিত ছিল ; পরে তথা হইতে এস্থানে আনিত হইয়াছে।

মস্‌জেদ্ কাজিনূর।

ইহা মুকদম আলাউল্‌হকের সমাধির নিকটবর্ত্তী ইষ্টক নির্ম্মিত এক মস্‌জেদ। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩৬ হস্ত এবং প্রস্থ ১৬ হস্ত।

(১) ইনি নূর কুতবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রফি উদ্দীনের পৌত্র। খুরশিদ্ জাহা নামায় ইহাঁর বংশতরুর তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

পাণ্ডুয়াবাসিগণের মতে, কাজিনূর ও নূর কুতব অভিন্ন ব্যক্তি নহে। এই মস্জেদে কোন লিপি খোদিত নাই। (১)

গৌড়ের খাদেম রশুল।

দুর্গ-বেষ্টনীর অভ্যন্তরে সম চতুষ্কোণ এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি অট্টালিকা। ইহার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উভয়ই ২৪ হস্ত পরিমিত। এখান হইতে ত্রিশ রশি ব্যবধানে (১৫০০ গজ দূরে) প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে। ৯৩৭ হিঃ (১৫৩০ খৃঃ) সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নছরৎ শাহ্ কর্ত্তৃক খাদেম রসুল নির্ম্মিত হয়। দ্বারের উপরে তোগ্‌রা অক্ষরে তিনছত্রে একখানি লিপি আছে।

মস্‌জেদের ভিতর ডোমের নিম্নে একখণ্ড প্রস্তরের উপর সেই পবিত্রচেতা প্রেরিত পুরুষের পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। (২) শুনিতে পাওয়া যায়, এই প্রস্তর খণ্ড পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় শাহ জালাল উদ্দীন তাব্রিজির চিল্লাখানায় স্থাপিত ছিল; হোসেন শাহ তাহা স্থানান্তরিত করেন। প্রস্তরখানি অবশ্য আরব হইতে ঐ সাধু বা অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল। মস্‌জেদ-পরিবেষ্টিত দক্ষিণ-দেওয়ালে একখানি খোদিত প্রস্তর আছে, তাহা ৮৮৫ হিঃ (১৪৮০ খৃঃ) নির্ম্মিত কোনও মস্‌জেদ হইতে সংগৃহীত।

লিপিখানির ভাবার্থ এইরূপ :—"মহাপুরুষ (পরমেশ্বর তাঁহার

(১) গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রকাশিত অংশের সহিত গৌড়ের নিম্নলিখিত নিদর্শনগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য প্রেরিত হয় কিন্তু প্রেসের কর্ম্মচারীদিগের অসাবধানতা ক্রমে তাহা বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। গত শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় গৌড় বিবরণ শেষ হইয়াছে। সুতরাং ঐ সংখ্যাতেই এই অপ্রকাশিত অংশ সংযোজিত করা উচিত ছিল কিন্তু তাহাও ঘটিয়া না উঠায় বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রদত্ত হইল।—লেখক।

(২) বেভারিজ সাহেব গৌড়ে গিয়া এই প্রস্তর দেখিতে পান নাই; চুরি যাওয়ার কথা শুনিয়াছিলেন।

ইত্যাদি) বলিয়াছেন,—'যে কেহ পরমেশ্বরের নিমিত্ত একটি মস্জেদ নির্ম্মাণ করিবে ইত্যাদি'। এই মস্জেদ, মোহাম্মদ শাহের পুত্র বারবক শাহ সুলতান তৎপুত্র ইউসফ সাহের রাজত্বকালে ৮৮৫ হিজরীর ১৮ই রমজান তারিখে প্রসিদ্ধ খাঁ মীরসাদ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।"

খাদেম রসুল মসজেদের ডোমের পশ্চাতে পশ্চিম দিকে একটি অট্টালিকা ছিল, তাহার ছাত ও দেওয়ালের কতকাংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে। অভ্যন্তরে কতিপয় পাকা সমাধি—শোচনীয় দশায় কালাতিপাত করিতেছে। সম্ভবত ইহা হোসেন শাহ ও নছরত সাহের সময়ের উক্ত রাজকর্ম্মচারী ও রাজপুত্রগণের সমাধি মন্দির। খাদেম রসুলের পশ্চিমে একটি জলাশয় আছে, তাহা সুলতান জালাল উদ্দীনের স্মৃতিচিহ্ন হইতে পারে ; কারণ তাহা 'জালালী পুকুর' (১) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ফতে খাঁ মস্জেদ।

খাদেম রসুলের সীমা-বহির্ভাগে এবং অধুনা বিধ্বস্ত ও লিপি-শূন্য এক অট্টালিকা মধ্যস্থিত মসজেদ। কথিত আছে দিল্লীর পাদশাহ ঔরঙ্গজেব আলমগীর শাহ নিয়ামতুল্যার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া তদীয় শিষ্য সুলতান সুজাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইবার জন্য প্রবৃত্ত করান এবং তদ্ধেতু পাদসাহ মত্ত মাতঙ্গের সহিত ক্রীড়ানুরক্ত দিলেয়ার খাঁ নামক তাঁহার এক সেনানীকে সাধুর শিরশ্ছেদ করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে নিয়োজিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু কখনও সুলতান সুজাকে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করেন নাই, পক্ষান্তরে বহুবার তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ করিয়াছিলেন। দুই পুত্র সহ দিলেয়ার খাঁ গৌড়ে উপনীত

(১) গোলাম হোসেন জালালী পুখুরকে জালাল উদ্দীনের কীর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হইলে, ফতেখাঁ নামক এক পুত্র রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে পৃথিবী পরিত্যাগ করে। শোকাতুর পিতা পুত্রের দেহ সমাহিত করিয়া সাধুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে এই ঘটনা সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হয়। তিনিও অবশেষে সাধুর প্রতি আস্থাবান্‌ হইয়া উঠেন।

সালুল্যা সাহিব। পূর্ব্বোক্ত নামধেয় সাধু পাণ্ডুয়ার নূর কুতবের সমসাময়িক। তাহার মসজেদ খাদেম রসুলের বিপরীত দিকে—দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত।

চিকা মস্‌জেদ।

খাদেম রসুলের ২।৩ রশি দক্ষিণে—এক প্রাচীন মসজেদ। ইহার গম্বুজটি অতি বৃহৎ এবং ব্যাঘ্রাদি-নিষেবিত। সাধারণ লোকে ইহাকে চিকা মসজেদ নামে অভিহিত করিয়া থাকে এবং শুনা যায়, বহু প্রাচীন কালে ইহা জেলখানা রূপে ব্যবহৃত এবং 'কারখানা' নামে অভিহিত হইত। এতৎ-সন্নিকট অপর একটি মসজেদ আছে। সম্ভবতঃ উক্ত কারখানা একটি কার্য্যালয় এবং শেষোক্ত ক্ষুদ্র মসজেদটি রমণীগণের আবাস-গৃহ ছিল; নতুবা এত নিকটে ছোট বড় দুইটি মসজেদ থাকার তাৎপর্য্য কি? কিন্তু লিপির অভাবে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় নাই।

লুকাচুরি (?)

দুর্গ-কারাভ্যন্তরে এবং খাদেম রসুলের দক্ষিণ পূর্ব্বে দ্বিতল বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই গৃহটি প্রবেশ-দ্বার এবং এমনি মনোহর ও অলঙ্কৃত যে মনে হয়, ইহা রাজপরিবারের প্রবেশ দ্বার ছিল। ইহার

প্রত্যেক পার্শ্বে শান্ত্রিগণের অবস্থানের স্থান এবং তদূর্দ্ধে নাগারখানা আছে। সম্ভবতঃ হোসেন শাহ বা তৎপুত্র কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত। (১)

বাইশ গজি-দেওয়াল।

খাদেম রসুলের দশরশি পশ্চিমে এক অত্যুচ্চ প্রাচীর। সাধারণ লোকে 'বাইশ গজি' ও 'ঘোড়দৌড়' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। দেওয়ালের যে অংশ দণ্ডায়মান আছে তাহার উচ্চতা ৪৪ হস্ত।

খাজাঞ্চি।

খাদেম রসুল হইতে কুড়ি রশি পশ্চিম উত্তরে, বাইশ গজি প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। গৌড়বাসিগণ ইহার এক খণ্ড ভূমিকে (ভাবাক্) খাজাঞ্চি বলিয়া থাকে। এই ভূমি খণ্ডের মধ্যস্থানে এক বৃহৎ জলাশয় (২) এবং তৎপশ্চিমে একটি বৃহৎ বারাণ্ডা-খানিত চিহ্ন সহ দেদীপ্যমান। সম্ভবতঃ ইহা রাজ্যের ধনাগার ছিল ; ইহা 'মহল সরাই' (অন্তঃপুর) নামেও কথিত হইয়া থাকে।

গম্বুজ গম্বুল ঘর।

ইহা একটি উচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট সমচতুরস্র ক্ষুদ্র গৃহ—মসজেদের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা সম্ভবতঃ রমণীগণের স্নানাগার রূপে ব্যবহৃত হইত।

গৌড় সমাপ্ত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

(১) র‍্যাভেনশা ইহাকে 'পূর্ব্ব ফটক' এবং মিঃ কিং 'লক্ষ শিল্পি-ফটক' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(২) সাধারণতঃ টাকশাল দীঘিনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"বদোয়ালের যুদ্ধ।"

—):*:(—

পক্ষপাত দোষে দূষিত ইংরাজ ইতিহাসের কল্যাণে সুবিখ্যাত বদোয়ালের যুদ্ধ সাধারণের নিকট সুপরিচিত নহে। কিন্তু এই বদোয়ালের যুদ্ধের কথা সাধারণ ইংরাজ ইতিহাসকারগণ কর্ত্তৃক যেরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ ইহা সেরূপ পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য নহে। এই স্থানে ইংরেজ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে শিখসৈন্য যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা প্রকৃতই সুদুর্লভ। এজন্য আমরা সেই সুবিখ্যাত বদোয়াল যুদ্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর তারিখে রণজিৎ রাজ্য ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রথমে মুদ্‌কি ও তৎপরে ফিরোজ-সহরে ইংরাজের সহিত শিখসৈন্যের দুইটি যুদ্ধ হইয়া যায়।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে সার হ্যারি স্মিথ এক ব্রিগেডসৈন্য সমভিব্যাহারে ধরমকোট অবরোধ করিতে প্রেরিত হন। ধরমকোট বিনাযুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে ইংরাজ-করে প্রদত্ত হইল। বহুসংখ্যক কামান বারুদ ও মুদ্রার রক্ষক হইয়া যে সমুদায় সৈন্য ফিরোজপুরে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগের গতি শিখসেনা হইতে প্রচ্ছন্ন রাখাই হ্যারি স্মিথের এই রণযাত্রার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, রণজোর সিংহ শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া লুধিয়ানা আক্রমণের ভয় দেখাইয়াছেন, তখন তাঁহাকে অগত্যা তৎপ্রদেশ রক্ষার্থই যাইতে হইল।" জানুয়ারী মাসের বিংশতি দিবসে তিনি লুধিয়ানা হইতে প্রায় দ্বাদশক্রোশ দূরস্থিত জগ্‌রাওন নামক নগরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সেই দিনই স্মিথ জ্ঞাত হইলেন যে, রণজোর সিংহ লুধিয়ানার পশ্চিমে অব-

স্থান করিতেছেন এবং জগ্‌রাওনের প্রায় নয় ক্রোশ দূরস্থিত বদোয়াল গ্রামে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

মধ্য রজনীতে ইংরাজ সেনানী চারি রেজিমেণ্ট পদাতি, তিন রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী ও ১৮টি কামান লইয়া রণযাত্রা করিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে ইংরাজ-সৈন্য বদোয়াল হইতে চারিক্রোশ দূরে উপস্থিত হইল। সার হ্যারিস্মিথ মনে করিলেন যে, যদি তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া শিখসেনা হইতে তাঁহার বামপার্শ্ব দেড়ক্রোশ দূরে রাখিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই লুধিয়ানার সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। ইংরাজসৈন্য যতই বদোয়ালের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই স্পষ্ট প্রতীত হইতে লাগিল যে, শিখসেনা তাহাদের গতিরোধ করিবে শিখসেনার সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক স্মিথ আরও দক্ষিণে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু শিখগণ ইংরাজ অশ্বারোহী সৈন্যের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে সমরে আহ্বান করিতে লাগিল। এই রূপে ইংরাজসৈন্য শিখসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পর, তত্রত্য বালুকাস্তূপে রক্ষিত হইয়া তাহারা গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

ইংরাজগণ আশা করিতে ছিলেন যে, তাঁহাদের পদাতি সৈন্যের আক্রমণে শিখগণ বিতাড়িত হইলে সেই অবসরে লুধিয়ানাস্থিত ইংরাজ সৈন্য আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু সবিস্ময়ে ইংরাজ দেখিল যে, শিখগণ তাহাদের তোপ বালুকা রাশির পশ্চাতে লইয়া গিয়াছে। "তখন তাহাদের তোপের অব্যর্থ সন্ধানে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত গোলা মহাবেগে ইংরাজসৈন্যোপরি পতিত হইতে লাগিল। সেই দুর্ব্বার আক্রমণে শত শত ইংরাজ এককালে নিহত হইতেছিল। স্বন স্বন্ শব্দায়মান সেই জ্বলন্ত লৌহ বৃষ্টি ধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়া এককালে সমুদয় বিভাগস্থ ইংরাজ নিঃশব্দে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইতেছিল।" *

* বরদা কান্ত মিত্র প্রণীত শিখ যুদ্ধের ইতিহাস পৃঃ ৮৮।

সেই জ্বলন্ত অনল বৃষ্টিতে ইংরাজসৈন্যের অবস্থা সাতিশয় ভীতিপ্রদ হইয়া গেল। অরাতির এই দুর্ব্বার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্লান্ত ইংরাজসৈন্য রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ লুধিয়ানা অভিমুখে বেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

এই সময় শিখগণ ইংরাজসৈন্যের অনুসরণ করিলে, তাহাদিগের ঘোরতর বিপর্য্যয় সাধন করিতে পারিত; অতি অল্প সংখ্যক ইংরাজই শিখগণের কৃপাণের প্রচণ্ড আঘাত হইতে রক্ষা পাইত। কিন্তু স্বদেশরক্ষা মহাব্রতে দীক্ষিত কিংবা ইংরাজের পরাজয় দর্শনেচ্ছু কোন সেনানী তাহাদিগকে পরিচালিত করে নাই, এই নিমিত্ত শিখ সৈন্য পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিল না। শিখসেনানী রণ্‌জোর সিংহ শিখগণকে কেবল সমরে লিপ্ত হইতে দিয়াছিল মাত্র; কিন্তু সে স্বয়ং সেই অজেয় সৈন্যের সহিত রণক্ষেত্রে অবস্থান করে নাই। * নেতৃহীন শিখসৈন্যের লুণ্ঠন ইচ্ছা অতীব বলবতী হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ রসদাদি নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তাহারা পরাজিত পলায়নপর অরির অনুসরণ না করিয়া রসদ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। "ইংরাজের যুদ্ধ করণোপযোগী সমুদয় দ্রব্য এবং রসদাদি বিজেতার করায়ত্ত হইল। এই সমরে ইংরাজগণের হতাহত সংখ্যা প্রায় দুইশত হইবে।"

এইরূপে শিখসৈন্য বিশ্বাসঘাতকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও বিশ্ব প্রশংসিত মহাবীর ইংরাজগণকে বদোয়ালের চিরস্মরণীয় ক্ষেত্রে পরাজিত করিল। ইংরাজদিগের সে দম্ভ আর নাই, যাঁহারা শিখসৈন্যকে হেলায় পরাজিত করিবেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে; বরং ভাবী আশু সমরের কথা ভাবিয়া তাঁহাদিগের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক নৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাতে আহত হইতেছিল। যে প্রসিদ্ধ

* বরদা কান্ত মিত্র-প্রণীত শিখ যুদ্ধের ইতিহাস।

ইংরাজ সৈন্য গর্ব্বভরে শিখসৈন্যকে বেগে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা একণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দারুণ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত।

এইরূপে বদোয়ালের চির স্মরণীয় যুদ্ধের অবসান হয়। নেতৃহীন শিখসৈন্য এই স্থানে যে বীরত্বের অভিনয় করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদিগের গৌরব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অনেক পাশ্চাত্য ইতিহাসকার এই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পক্ষপাত শূন্য ঐতিহাসিকগণের ইতিহাসে এই সত্য চিরকাল গৌরবের সহিত ঘোষিত হইবে। মহামতি কানিংহাম পাশ্চাত্য ইতিহাসকার হইয়াও এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মত প্রচার করিয়াছেন। এজন্য তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীরই কৃতজ্ঞতা লাভের উপযুক্ত।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার

শিখ-সাধনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনর্মূ্ষক।

নাদির শাহের ভারতাক্রমণে উত্তর ভারতে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। সে বিপ্লব শিখদিগের উন্নতির পক্ষে পরম সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় তাহারা মোগলের অত্যাচারের ভয় বিস্মৃত হইয়া পঞ্জাব লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হয়। স্বদেশ-গামী নাদির শাহের রসদ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া, তাহারা নাদিরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের এরূপ দুঃসাহসে বিস্মিত হইয়া নাদির জকারিয়া খাঁকে তাহাদের ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন—'ইহারা সকলেই ফকির। অমৃতসর ইহাদের তীর্থস্থল। প্রতি ষষ্ঠ মাসে ইহারা তথায় গমন করিয়া থাকে।' নাদির জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহারা থাকে কোথায়?' খাঁ বাহাদুর উত্তর করিলেন—"অশ্বপৃষ্ঠই ইহাদের আবাস। পারস্যপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন—'ইহাদের আবাস নষ্ট করিয়া ইহাদিগকে দমন করিতেই হইবে।'

সে আদেশ মান্য করিয়া জকারিয়া খাঁ শিখ দমনের জন্য বিধিমত প্রয়াস পান; কিন্তু শিখশক্তি দমিত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। নানা চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহাদের উন্নতির প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

নাদিরের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া পঞ্জাবের নিরীহ ধনীরা ধন-সম্পত্তি লইয়া পর্ব্বত-সমূহে পলাইয়া যায়। কিন্তু শিখেরা তাহাদের উপক

আপতিত হইয়া, তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লয়। তাহাদের এ দস্যুতায় পঞ্জাবের অনেক ধনীই নির্ধন হইয়া পড়ে। * তাহারা দল বাঁধিয়া রীতিমত দস্যুতা আরম্ভ করে। গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করিয়া নিরীহ অধিবাসীদিগকে তাহারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। লোভে পড়িয়া অর্থহীন ক্ষুৎকাতর অনেক ব্যক্তিই তাহাদিগের দলে যোগ দিয়া শিখশক্তি বাড়াইয়া তুলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা স্বকার্য্য সাধনে ব্যাপৃত হইত প্রতি দলেরই একজন করিয়া নেতা থাকিতেন। নেতাকে তাহারা গভীর ভক্তির সহিত মান্য করিত। নেতৃগণ তাঁহাদের লুণ্ঠিত ধন সম্পত্তি দ্বারা প্রতি শিখকেই এক একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া দেন। † অশ্বারোহণে শিখেরা আরও প্রবল-ভাবে দস্যুতা করিতে থাকে। তাহারা জকারিয়া খাঁর সকল উদ্যম বিফল করিয়া প্রতি ষষ্ঠ মাসে প্রকাশ্যে অশ্বারোহণে অমৃতসর যাত্রা করিত। এইরূপ অশ্বারোহণে তাহারা ক্রমে নিপুণ অশ্বারোহী যোদ্ধা হইতে শিখিয়াছিল।

যদিও শিখেরা খণ্ড খণ্ড দলে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিত, তথাপি সে সব খণ্ড দল নিতান্ত স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিত না। ‡ তাহাদের প্রতি দলের সহিত একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল। তৎকালীন রাষ্ট্র বিপ্লবের অবকাশে তাহারা একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছিল।

* Cunningham's History of the Sikhs.

† The wealthlest of them purchased horses and mounted their followers, while the more adventurers sought celebrity by daring exploits and aspired to military honours:—Latif's The Punjab,

‡ The different associatons were united by common interest, no less than by the profession of a new faith ; and a system of general confederation for defence, of for operations requiring more than single efforts, was early arranged between the chiefs.—Allen & Co. The Punjab.

শিখ শক্তিকে সাফল্য প্রদানই সেই গুপ্ত সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বৎসরে দুইবার মাত্র এই সভার মহা অধিবেশন হইত। অমৃতসর এই অধিবেশনের ক্ষেত্র ছিল। ধর্ম্ম সাধনার নামে তথায় উপস্থিত হইয়া সকল শিখই সেই সভায় যোগদান করতঃ যথাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইত। পরে যাহা মীমাংসা হইত, ছয় মাস কাল তাহাই সকলে পালন করিত।

শিখদিগের বল যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদিগের লোক সংখ্যাও ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহারা ইরাবতীর তীরে দালীবাল ক্ষেত্রে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আরও প্রবল ভাবে সংকল্পিত কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইল। এই সময় তাহারা পঞ্জাবের দূরস্থ প্রদেশ গুলি লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। লাহোরের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলিও তাহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যখন পঞ্জাব দস্যু শিখদিগের এইরূপ কর-কবলিত, সেই সময় জকারিয়া খাঁ নিতান্ত ভগ্নমনাঃ হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। * তাঁহার মৃত্যুর পর মীর মহিমখাঁ পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এই সময় পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মম্মদ খাঁর ভ্রাতা নবাব কমরুদ্দীন খাঁ দিল্লীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অচিরে মীর মহিম খাঁ পদচ্যুত হয়েন ও জকারিয়া খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যহরিয়া খাঁ লাহোরের রাজপ্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হইলেন।

যহরিয়া খাঁ পিতামহের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতার কোমল বৃত্তি সকল তাঁহার হৃদয়ে পারস্ফুট হয় নাই। শিখদিগের প্রতি তাঁহার নিদারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। লাহোরের রাজতক্তে বসিয়াই তিনি শিখদমনে মনঃসংযোগ করেন। এই সময় শিখেরা লাহোরের উত্তরস্থিত

* ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে জকারিয়া খাঁ দেহত্যাগ করেন।

এমিনাবাদ সহরের চতুঃপার্শ্ব হইতে রীতিমত কর আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যহরিয়া খাঁ শিখদিগের এরূপ আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি দেওয়ান যশপত রায়কে শিখদমনের জন্য নিয়োগ করিলেন। যশপত রায় শিখদিগকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলে, শিখ-মোগলে প্রবল সংঘর্ষ হইল। সে সংঘর্ষে উভয় পক্ষ যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়া ছিল এই যুদ্ধে মোগলেরা বিশেষ ভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা পরাজিত হইয়া পলাইয়া যায়। যশপত রায় যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। *

এই দুঃসংবাদ লাহোরে পৌঁছিলে যহরিয়াখাঁর ক্রোধাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল। প্রধান মন্ত্রী লখ্‌পত রায় ভ্রাতৃশোকে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নবাবের নিয়োগক্রমে তিনি বহু সহস্র সৈন্য লইয়া আচরে শিখদিগের উপর আপতিত হইলেন। সমরক্লান্ত শিখেরা এই আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তথাপি শিখোচিত বীরত্বের সহিত সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু মোগলসৈন্যের সংখ্যাধিক্যে তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইল। সে যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহুতর সৈন্য হত হইয়াছিল। যুদ্ধশেষে এক সহস্র শিখ লখপত রায়ের হস্তে বন্দী হয়। লখপত তাহাদিগকে লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া উন্মুক্ত-পৃষ্ঠে গর্দ্দভে চড়াইয়া লাহোরে লইয়া যান। সেই অবস্থাতেই তাহাদিগকে লাহোরের সর্ব্ব স্থানে পরিভ্রমণ করান হইল। পরে তাহাদিগকে দিল্লী ফটকের বাহিরে নখাজ খানা বাজারে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় একটির পর একটি শিখকে নিদারুণ ভাবে হত্যা করা হয়। হত্যার পূর্ব্বে প্রত্যেককেই ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাদের বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছিল, যদি

* Allen & Co's The Punjab.

তাহারা শিখ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাহারা প্রত্যেকেই মুক্তি পাইবে, অধিকন্তু মোগল সরকার হইতে বহুবিধ রত্নরাজি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ শিখেরা মুক্তির বিনিময়েও ধর্ম্মত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। দৃঢ়তার সহিত মোগলের সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিল। গুরুর জয়—ধর্ম্মের জয় গাহিতে গাহিতে তাহারা একে একে দেহত্যাগ করিল।

যে স্থানে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়, শিখদিগের নিকট তাহা শহিদগঞ্জ নামে পরিচিত। আজও শিখেরা শহিদগঞ্জের ইতিবৃত্ত ভয়-ভক্তির সহিত স্মরণ করে। এখানে ভাই তরুসিংহের একটি সমাধি-মন্দির আছে। মন্দিরটি শিখদিগের একটি পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। ভাই তরু মঞ্ঝা প্রদেশের একজন রাজভক্ত কৃষক ছিলেন। শিখ-সেবার জন্য তিনি 'তন-মন-ধন' সমস্তই অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজ-অত্যাচার-ক্ষুব্ধ শিখগণকে তিনি অন্ন-জল দানে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন। এই অপরাধে বীর পরবর্ত্তী নবাব মীর মন্নুর কঠোর আদেশে ও হিন্দু-চর হরভগত নিরঞ্জনীর চেষ্টায় ধৃত হইয়া চক্রযন্ত্রে পেষিত হয়েন। কিন্তু সে যন্ত্রণাতেও মৃত্যু না হওয়ায় নবাব মীর মন্নু তাঁহার কেশাদি মুণ্ডন করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু বীরের প্রবল চেষ্টায় নবাবের উদ্দেশ্য সফল হইতে পায় নাই; কিন্তু প্রবল আকর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার কেশগুচ্ছ সচর্ম্ম উঠিয়া আসে। সেই যন্ত্রণাতেই বীর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মূর্চ্ছাভঙ্গে বীর অম্লানবদনে গুরুস্তোত্র গান করিতে করিতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন।*

শহিদগঞ্জে শিখদিগের হত্যাকার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, নবাব যহরিয়া খাঁ রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলেন যে, যেখানে পাইবে, নির্ব্বিচারে শিখ-

* 'শিখ-চিত্র' গ্রন্থে শিখবীরগণের জীবনী বিস্তৃতভাবে সংকলিত করিতেছি।

হত্যা করিবে। এরূপ হত্যায় কেহই রাজবিধানে দণ্ডনীয় হইবে না। যে কেহ গুরু গোবিন্দের জয়গান করিবে, সেই কঠোর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। শিখ-মুণ্ডের জন্য রাজাময় বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। এই ঘোষণা প্রচারিত হইবামাত্র অর্থলোভে দেশবাসীরা শিখ দ্রোহী হইয়া উঠিল। যে যেখানে পারিল—স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে শিখদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। প্রতিদিন সহস্র সহস্র শিখমুণ্ড লইয়া জনমণ্ডলী রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে লাগিল।

এরূপ অত্যাচারে শিখেরা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মরিতে ভয় করে না। ধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ তাহারা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই জানে। আর মোগলের হস্তে নিহত হওয়া ধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু তাহা হইলেও এরূপভাবে নিহত হওয়া তাহারা বিশেষ শুভজনক বিবেচনা করিল না। এরূপ ভাবে নিহত হওয়ায় ও আত্মহত্যায় বিশেষ প্রভেদ কি ? তাই তাহারা তাহাদের বিশেষত্ব কেশাদি মুণ্ডন করিয়া সাধারণ প্রজার ন্যায় বসবাস করিতে লাগিল। এইরূপ গুপ্ত ভাবে বাস করিয়া অনেকেই রাজ-অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল। কিন্তু কেশাদি মুণ্ডন করিতে যাহারা স্বীকৃত হইল না, তাহারা শতদ্রু পার হইয়া দূরদেশে ও নিরাপদ স্থানে পলাইয়া গেল। পঞ্জাব হইতে কিছুকালের জন্য শিখের প্রভাব একেবারে নির্ব্বাপিত হইল।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সধবার বৈধব্য।*

"জীবিত থাকিতে পতি বিধবা কিশোরী।
হেন অভাগিনী কেবা আছে মরি মরি॥"

গৌড়বাদশার সুবিস্তৃত রাজভবনের অন্তঃপুরে একটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠে একটি প্রশস্তললাট, আয়তনয়ন, বিশালবক্ষ: বীরমূর্ত্তি, অপরাধীর ন্যায় অতীব সঙ্কুচিত এবং দীনভাবাপন্ন হইয়া, অধোবদনে অবস্থিতি করিতে-ছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ নয়নমোহন সুন্দর মুখকান্তি, প্রাবৃটের মেঘাবৃত শশধরের ন্যায়, বিষাদকালিমায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কমলাক্ষ পত্র সদৃশ উজ্জ্বল নয়নযুগল, শিশিরাসিক্তা সরোজিনীর ন্যায় অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া উজ্জ্বলতর ভাব ধারণ করিয়াছে। ঘনকৃষ্ণ সুকোমল কুন্তলকলাপ স্বেদনীরে নিষিক্ত হইয়া, ললাটতলে ইতস্ততঃ লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার বস্ত্রাবৃত বক্ষঃস্থল উন্নমিত এবং অবনমিত হইতেছে। হৃদয়ের তুমুল আন্দোলনে সর্ব্বশরীর ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। চিন্তার এবং অনুতাপের দারুণ দহনে তাঁহার বাহ্যান্তর দগ্ধ

* ইহার মূলভাগ মান্যবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত, অতি উপাদেয় গ্রন্থ,—"বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" (১ম খণ্ড) হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। সান্যাল মহাশয় 'বাঙ্গালী চিরদিনই ভীরু' এই মিথ্যাপবাদের দূরীকরণাভিলাষে, এই গ্রন্থে অনেক গুলি বঙ্গজ বীরসন্তানের ইতিহাস গ্রথিত করিয়াছেন; ইহাতে অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অতীব দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়,—এই স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা বৃদ্ধ বয়সে, অদৃষ্টাবপাকে পতিত হইয়া, রাজদণ্ডে এক্ষণে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন! সকলই কর্ম্মফল! কে জানে, এই পবিত্রচরিত্র মহাপুরুষ, মুক্তিলাভ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁর মা'র সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন কি না?—তাঁর এই সংকল্পিত মহা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সক্ষম হইবেন কি না? সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাধীন! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই করতলগত ক্রীড়াভাণ্ড!

হইয়া যাইতেছে। বীরবরের আপাদশরীর রোমাঞ্চিত—ঘর্ম্মাক্ত। অদূরে দীপাধারে একটি ক্ষুদ্র রজতদীপ, তাঁহারি ক্ষীণালোকে কক্ষতলের অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত করিয়া, অনন্যমনে স্বকর্ত্তব্য পালন করিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ—নীরব।

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইল। বীরবর পূর্ব্ববৎ চিন্তামগ্ন। কক্ষতল পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ—নীরব। এমন সময়, বহির্দ্দেশে সহসা কাহার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। এবং তৎসহ দ্বারদেশ ঈষৎ উন্মুক্ত হইল। বীরবর চমকিয়া উঠিলেন এবং চকিতনয়নে দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল; শুষ্কাধর হইতে কম্পিত অর্দ্ধ-স্ফুটস্বরে ধ্বনিত হইল—"কে আসে!"

"আমি দাসী।"—একটি অপরূপ-রূপলাবণ্যবতী নম্রমুখী যুবতী কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

আগন্তুককে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ যুবক কহিলেন—"কে—আশ্‌মান্!—আঁ বাঁচ্‌লেম্!"

যুবতী। কেন? তুমি মনে করেছিলে কি?

যুবক। আমি মনে ক'রেছিলাম, বুঝি আমার সেই কর্ত্তব্যকঠিনা, ভ্রুকুটিনয়না, অনলরূপিণী জননী, অথবা সেই নৈরাশ্যপাগলিনী মণিহারা-ভুজঙ্গী, এই কুলকলঙ্ক কামমোহিত নরাধমকে দগ্ধ করিবার জন্য এস্থলে আগমন কচ্ছেন। আশ্‌মান্! তুমি জাননা কি, আজ আমি সেই ক্রোধোন্মত্তা সিংহ যুগলের ক্রোধানলের উগ্রতাপ হ'তে এই পাপপ্রাণ বাঁচাইবার জন্যই, ভীরু কাপুরুষের ন্যায়,—এই গুপ্ত কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি?

যুবতী। জানি: কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রাণে যখন এত ভয়, তখন তুমি এমন কাজ কেন করলে? নিজেও মজিলে, আমাকেও মজা-ইলে; অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, এমন সর্ব্বনাশ করলে কেন?

যুবক। আশ্মান্!—আশ্মান্! ক্ষমা কর; দারুণ অনুতাপে আমার অন্তর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে; এসময় তুমি আর আমাকে লজ্জা দিয়ে, মড়ার উপর খাঁড়ার প্রহার ক'রো না। :আশ্মান্! আমি অনেক চিন্তা করেছি; হৃদয়ের সহিত অনেক যুদ্ধ করেছি;—কিন্তু, কিন্তু, প্রাণাধিকে! তোমার ঐ মোহিনী মূর্ত্তিখানি স্মৃতিপথে উদিত হয়ে, আমাকে সকল স্থলেই পরাজিত করেছে, আমার সকল চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়েছে। অতি বাল্যকালে, বালসুলভ চপলতার বশীভূত হয়ে, যে ভুবনমোহিনী প্রতিমূর্ত্তিখানি হৃদয় পাষাণে অঙ্কিত ক'রেছিলেম্—পার্লেম্ না, আশ্মান্! পার্লেম্ না,আর কিছুতেই তারে মুছে ফেল্তে পারলাম না। অধিকন্তু, আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের ফলে, এক্ষণে তুমি গর্ভবতী; এ অবস্থায় আর উপায়ান্তরই বা কি আছে? তাই, যা ক'রবার তাই করেছি; এক দিক রক্ষা ক'রে সকল দিক হারিয়েছি।

যুবক নীরব হইলেন; তাঁহার নেত্রযুগল হইতে ঝর ঝর করিয়া দুইটি অশ্রুধারা গণ্ডতল বাহিয়া ভূমিতলে চুম্বন করিল। যুবতীরও চক্ষুর্দ্বয় ছল্ ছল্ করিয়া আসিল;—রুদ্ধস্বরে কহিল—"হায়, হায়, আজ এই পাপিনী আশ্মান্তারার জন্য একটি সুখের সংসার শোকসাগরে চিরদিনের জন্য মগ্ন হ'লো!

যুবক। আশ্মান্! অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডন কর্‌তে পারে? যা' হ'বার তা' হয়েছে। এখন গত বিষয়ের বৃথা অনুশোচনা ক'রে আর ফল কি আছে?—এখন তাঁদের সংবাদ কি বল; আমার উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর কর।

যুবতী। অনেক চেষ্টা ক'রেও আজ তাঁরা রাজভবন পরিত্যাগ কর্ত্তে পারেন নাই। রাণী নবকিশোরী ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন; কুমার অনুপ, জননীর পার্শ্বদেশে উপবেশন ক'রে অবিরাম অশ্রুপাতে ধরাতল সিক্ত কর্‌ছেন। বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা বিবিধ উপদেশ ও সান্ত্বনা বাক্যে তাঁদিকে শান্ত

কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন; কখনও বা ক্রোধভরে আরক্তনেত্রে ব'লে উঠ্‌ছেন—"তোরা সেই কুলাঙ্গারের জন্য কেন বৃথা কেঁদে মর্‌ছিস্? সে আর আমার পুত্র নয়, সে বিধর্ম্মী যবন!" কখনও বল্‌ছেন—"যদু আমার মরেছে; যে মরেছে তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকেছে, তার জন্য আবার কান্না কিসের?" আহা! তাঁদের দুর্দ্দশা দেখ্‌লে পাষাণও বিদীর্ণ হয়—বজ্রও বিগলিত হয়! বৃদ্ধা রাণীর শত চেষ্টাতেও আজ তাঁরা রাজভবন পরিত্যাগ কর্‌তে পারেন নাই। কল্য প্রত্যূষেই তাঁরা নৌকাযোগে সাতগড়া অভিমুখে যাত্রা কর্‌বেন। দেওয়ানজী মহাশয়ের পরামর্শেই তাঁরা যুক্তিযুক্ত ও শুভদ ব'লে গ্রহণ করেছেন।

যুবক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নীরব নিশ্চলভাবে যুবতীর সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। প্রত্যেক কথা, তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া, অন্তরের অন্তঃস্থলে তপ্ত শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল; যুবক নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন; যেন শত সহস্র ভীষণ বিষদন্ত বৃশ্চিক তাঁহার সর্ব্বশরীরে অন্তরে বাহিরে দংশন করিতে লাগিল। সেই গুপ্ত প্রকোষ্ঠে, এই অসহ্য যন্ত্রণায়, সমস্ত রাত্রি উভয়ে অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন।

২

প্রিয় পাঠক! জানেন কি এই যুবক ও যুবতী কে? এবং কি জন্যই বা ইহারা এরূপ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছেন? আপনাদের অবগতির জন্য এক্ষণে ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

বারেন্দ্র ভূমিতে 'চলনবিল্' নামে একটি অতি প্রসিদ্ধ বিস্তীর্ণ হ্রদ আছে। বহুসংখ্যক নদ নদী আসিয়া, এই হ্রদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং এক অতি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই হ্রদের উত্তরাংশে একটি দ্বীপ আছে। ভাদুড়ী বংশীয় সুবুদ্ধি খাঁ * নামক এক

* "খাঁ"টি রাজদত্ত উপাধি।

ব্রাহ্মণসন্তান, গৌড় বাদশাঃ সম্সুদ্দিনের * নিকট জায়গীর পাইয়া, রাজা উপাধি ধারণ করতঃ এই দ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন। এই দ্বীপটি সপ্তসংখ্যক সুদৃঢ় দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া, ইহাকে সকলে 'সাতগড়া' বা 'সপ্তদুর্গা' কহিত। এই সাতগড়ার নৃপতিগণ, প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেন; কিন্তু অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ বার্ষিক একটি মাত্র টাকা তাঁহাদিগকে সম্রাটের নিকট নজর পাঠাইতে হইত। তজ্জন্যই এই ভাদুড়ীবংশীয় নরপতিগণ "একটাকিয়া ভাদুড়ীরাজ" নামে সর্ব্বত্র অভিহিত হইতেন। ইহাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ, এবং প্রায় সকলেই স্বধর্ম্মপরায়ণ, রাজোচিত গুণসম্পন্ন ও যুদ্ধবিশারদ বীর ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণও শাস্ত্রবিদ্যার সহিত শস্ত্রবিদ্যাও রীতিমত শিক্ষা করিতেন। পাঠক! মনে রাখিবেন, যে বাঙ্গালী কালচক্রের অবিরাম আবর্ত্তনে আজ অবনতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছে এবং ভীরু কাপুরুষ নামে দেশ বিদেশে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে † ইহারাও সেই বাঙ্গালীই ছিলেন। আজি কালিকার মত শিক্ষা ও সুযোগের অভাব না থাকায়, তৎকালে বঙ্গসন্তানগণ অন্যান্য বীরজাতির নিকট কোনও অংশে ন্যূন বা হীন ছিলেন না, বরং অনেকাংশে উন্নতই ছিলেন। শুদ্ধ এই একটাকিয়া ভাদুড়ী রাজবংশ নহে, এমন অনেক রাজবংশেই বঙ্গের গৌরব স্বরূপ অসংখ্য কর্ম্মবীর জ্ঞানবীর ও রণবীর জন্ম গ্রহণ করিয়া, বাঙ্গালার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অমর নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন ‡ এই ভাদুড়ী

* ইনি সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক ও ফেরোজ তোগলকের সময় গৌড়ে আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুবুদ্ধি খাঁ ইহাঁকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্যেরই প্রতিদান স্বরূপ তিনি তাঁহাকে অনেক জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন।

† সর্ব্বমঙ্গলময় সাম্যপ্রিয় বিধাতার মঙ্গল বিধানে, আজিকালি যেন কিঞ্চিদধিক ইহার বিপরীত ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারই ইচ্ছা।

‡ অতীব দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়,—সেই ইতিহাস এক্ষণে স্বার্থপর যথেচ্ছাচারিগণের 'খেয়ালখাতা' স্বরূপ হওয়ায়, এই মহাত্মগণের পবিত্র চরিত্রগাথা তাহাতে

বংশেরই বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ মহারাজ গণেশ নারায়ণ, সম্মুখ সমরে গৌড়বাদশাঃ নসেরিৎশাঃকে * পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাষ্ট্রসিংহ শিবাজী এবং পঞ্জাববীর কেশরী রণজিৎ ব্যতীত আর কোনও হিন্দু রাজাই এরূপ বীরত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। আমাদের এই চিন্তাপীড়িত অনুতপ্ত যুবক, এই গৌড়েশ্বর সম্রাট গণেশেরই জ্যেষ্ঠপুত্র; নাম যদুনারায়ণ। পিতার অবর্ত্তমানে ইনিই এক্ষণে গৌড় সিংহাসনের অধিকারী। এবং এই যুবতী সমসুদ্দিনের পুত্র আজিম শাঃর দুহিতা, ও যদুনারায়ণের নবপরিণিতা পত্নী; নাম—আশমান্ তারা।

যদুনারায়ণের জননী, বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরাদেবী, পুত্রবধূ রাণী নবকিশোরী ও শিশুপৌত্র কুমার অনুপনারায়ণ সহ পাণ্ডুয়াতে অবস্থান করিতেছিলেন। † পুত্র যদুনারায়ণের সহিত আশমান্ তারার এই বিসদৃশ ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরিণয়ের সংবাদে, তিনি স্বগণপরিবৃতা হইয়া, হৃতপুত্রা উন্মত্তা সিংহীর ন্যায় এই গৌড়দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আসিয়াই ঘোষণা করিলেন—"আমার অযোগ্য পুত্র যদু মরিয়াছে; কারণ শাস্ত্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যু তুল্য। এক্ষণে তৎপুত্র অনুপ নারায়ণই গৌড়সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রজাগণ! তোমরা যদি যথার্থ রাজভক্ত ও ধর্ম্মানুরক্ত হও, তবে আইস সকলে আমার অনুপের আজ্ঞানুবর্ত্তী হও এবং তাহাকে সিংহাসন প্রদান কর।"

দুর্ল্ভ হইয়া উঠিয়াছে! অসংখ্য আ-গাছা উৎপন্ন হইয়া উদ্যান শোভা ফলপুষ্পতরুগণকে আবৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে!

* ইনি সমসুদ্দিনের ছোট বেগমের গর্ভজাত পুত্র এবং আজিম শাঃর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহাঁর দ্বারাই আজিম শাঃ যুদ্ধে নিহত হন।

† সম্রাট গণেশের সময় হইতেই ইহাঁদের পরিবারবর্গ পাণ্ডুয়ার বাটীতে থাকিতেন এবং মৃত নসেরিৎ শাঃ ও আজিম শাঃ পৌরস্ত্রীগণ উপপত্নীরূপে গৌড়ের রাজভবনে অবস্থিতি করিত।

প্রজাগণ সকলেই বৃদ্ধা রাণীর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিল, অনেকেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না; কিন্তু, প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট যদু-নারায়ণের বিরুদ্ধাচারী হইতে কেহই সাহস করিল না।

তাবিরপুরের রাজা জীবনচন্দ্র রায়, যদুনারায়ণের মাসতুত ভাই; ইনি তৎকালে গৌড়ের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও বৃদ্ধা রাণী কর্ত্তৃক ধর্ম্মত্যাগী সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু দূরদর্শী বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞ দেওয়ান, সেই ক্রোধোন্মত্তা বৃদ্ধার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বিনীত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন—"মাতঃ, ক্ষমা করুন, আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে পারিলাম না; হইলেও, ইহাতে কোনও সুফল ফলিবার বিন্দু মাত্রও সম্ভাবনা নাই। কারণ, গৌড়েশ্বরের অধিকাংশ সৈন্যসামন্তই মুসলমান; তাহারা কখনই অবিবাদে এই ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট যদুনারায়ণকে সিংহাসনচ্যুত হইতে দিবে না। ফলে, উভয় পক্ষে একটি তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিবে; এবং পরিণামে অনুপেরই সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। অতএব, এ ক্ষেত্রে এই অমঙ্গলকর পন্থা পরিত্যাগ করাই বিধিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত। আমার মতে, আশ্‌মান্ তারা, ভূতপূর্ব্ব মুসলমান্ সম্রাটের উত্তরাধিকারিণী তাহার বংশাধিকার ক্রমে আপন পরিণীত পতির সহ গৌড়সিংহাসনে অধি-ষ্ঠিতা থাকুক; পক্ষান্তরে অনুপনারায়ণ সপ্তদুর্গাধিপতি স্বর্গগত মহারাজ গণেশ নারায়ণের পৌত্র, সপ্তদুর্গের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া স্বরাজ্য পালন করুক্। তাহা হইলে উভয় রাজবংশই অক্ষুণ্ণ থাকিবে; হিন্দু ও মুসলমান, উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট থাকিবে। এরূপস্থলে ইহা ব্যতীত নিরাপদ ও শুভপ্রদ পন্থা আর নাই।" এই যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ বাক্যে, উপস্থিত সকলেই সাধুবাদ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরাও অগত্যা তাহাতেই সম্মতি দান করিলেন।

তাঁহার পুত্র যদুনারায়ণের সহিত সকল সম্বন্ধ জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইল।

বৃদ্ধা পৌত্র এবং পুত্রবধূ সহ অতি প্রত্যূষেই সেই পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে 'সাতগড়া' যাত্রা৹ করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহজীবনে আর পাপিষ্ঠ পুত্রের মুখাবলোকন করিবেন না। বিদায়কালে তিনি পুত্রবধূকেও জন্মশোধ একবার পাতের চরণ দর্শন করিতে দিলেন না। তিনি, রাণী নবকিশোরীকে গম্ভীর স্বরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন —"তুই অদ্য হইতে বিধবা হইলি!—স্মরণ রাখিস্, তুই বিধবা!" হায়, সেই দিন হইতেই, সেই নিরপরাধা পতিপরায়ণা সাধ্বী সতী সধবা হইয়াও বৈধব্য ব্রত অবলম্বন করিলেন!

ধন্য হিন্দু! ধন্য তোমার ধর্ম্মভাব! ধর্ম্মের জন্য তুমি কি না করিতে পার? আর, ধন্যা তুমি রাণী ত্রিপুরা, ধন্য তোমার চিত্তবল,—ধন্য তোমার কর্ত্তব্য কঠোরতা!

(৩)

পতি সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও, পতিগত প্রাণা সতীর চক্ষে তিনি সর্ব্বত্রই পূতচরিত্র দেবতাতুল্য একমাত্র আরাধ্য নিধি। যে দিন হইতে রাণী নবকিশোরী তাঁহার হৃদয়ের অমূল্যধনকে পরহস্তে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে জন্মের মত পর করিয়া, শূন্যহৃদয়ে এই সাতগড়ায় আগমন করিয়াছেন; সেই দিন হইতেই তাঁহার জীবনের সুখশান্তি সাধ আশা চিরকালের জন্য উন্মূলিত হইয়াছে। তাঁহার আহারে তৃপ্তি নাই—নিদ্রায় শান্তি নাই, সুখৈশ্বর্য্যে স্পৃহা নাই;—এ সংসার এখন তাঁর পক্ষে বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর কারাগার তুল্য। তাঁহার সেই হাস্য কৌমুদীমাণ্ডিত চন্দ্রাননের মুগ্ধকর মধুর ভাব, আয়ত নেত্র যুগলের সেই দয়ামায়া স্নেহ মিশ্রিত স্বর্গীয় জ্যোতিঃ এবং সেই লোকমোহিনী মধুরা প্রকৃতি;—কালবশে সকলই আজ বিকৃত বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে! দেবশিল্পীর দক্ষ তুলিকা প্রসূত শোভাধার সুন্দর চিত্রখানি দুষ্ট গ্রহের বিষ দৃষ্টিতে বিগতশ্রী হইয়াছে! অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে

এখন তাঁহার অন্তর বাহির সমাচ্ছন্ন; কেবলমাত্র তাঁহার বংশের বাতি কুলতিলক পুত্র অনুপনারায়ণ সেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে, দূরাকাশে একটিমাত্র ধ্রুবতারার ন্যায় ক্ষীণালোক বিস্তার করিতেছে।

তিনি এক্ষণে প্রকৃতই ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী বিধবা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপদেশ মত, যদুনারায়ণের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হইয়াছে; সতীর হৃদয়-গ্রন্থিগুলিও সেই সঙ্গে সব ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা দেবীর ভয়ে, প্রকাশ্যে কোনও প্রকার বিলাপ পরিতাপ করিতে না পাইলেও সেই পতিদেবতা সাধ্বী সতীর সন্তর্জগতে আজ কি যে সর্ব্বনাশকর ভীষণ দাবদাহ দিবানিশি ধূ ধূ করিতেছে, তাহা সেই সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণ ব্যতীত আর কে জানে? শয়নে স্বপনে সর্ব্বদাই তাঁর মনে হইতেছে— "হায়, হায়, আমার যে আর নরকেও স্থান নাই! আমি কি মহাপাপিনী! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন হ'লো? তিনি আমাকে পরিত্যাগ করলেও আমি কেন তাঁকে পরিত্যাগ করলাম? তাঁর পত্নীত্বের অধিকারে বঞ্চিতা হলেও, তাঁর সেই বিশাল রাজপুরে সামান্য দাসীবৃত্তি অবলম্বন ক'রেও কেন আমি তাঁর চরণদর্শন সুখলাভের স্বর্ণসুযোগ উপেক্ষা করলাম? —সতীর আবার অন্যধর্ম্ম কি? পতি সেবাই তো তার একমাত্র পরমধর্ম্ম; পতিবিধর্ম্মী চণ্ডাল হলেও সতী তাঁহারই পাদসেবিকা সহধর্ম্মিণী। —হায়, হায়, আর কি সেই সর্ব্বার্থরূপিণী মোহিনী মূর্ত্তিখানি এই পাপিনীর নয়ন পথের পথিক হবে? আর কি সেই পীযূষনিস্যন্দিনী মৃত-সঞ্জীবনী মধুরবাণী; এই অভাগিনীর দগ্ধ হৃদয় শীতল করবে? ইহজীবনে আর কি সেদিন ফিরে আসবে? যা' হারিয়েছি, আর কি সে জীবনসর্ব্বস্ব অমূল্য নিধি জীবনপাতেও পুনঃ প্রাপ্ত হ'বো? এই দীনাহীনা কাঙালিনীকে আর কি তাঁর স্মরণ আছে?—হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে এই ছিল!"

দেখিতে দেখিতে পঞ্চবর্ষ, অনন্ত কালসাগরে অতি ক্ষুদ্র পঞ্চ তরঙ্গের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। সময় কাহারও অপেক্ষা করে না; কি সুখী,

কি অর্থী, দিন সকলেরই সমভাবে বহিয়া যায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমার অনুপনারায়ণের অভিভাবিকা স্বরূপ বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা দেবী সপ্তদুর্গা রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্য মধ্যে অবাধ শান্তি বিরাজ করিতেছে; শান্তিপ্রিয় প্রজাগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া একবাক্যে স্বীকার করিতেছে "আমরা রামরাজ্যের প্রজা; রাণী ত্রিপুরা দেবী আমাদের সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী জননী।" রাজ্যের অশান্তিকর দুরন্ত দস্যু তস্করগণ দমিত ও অবনমিত হইয়াছে; তাহারা তাঁহাকে "সিংহিনী" আখ্যা প্রদান করিয়াছে। তিনি এক্ষণে আর পূর্ব্ব প্রথামত নজর স্বরূপ 'একটাকা' গৌড়বাদশাহকে প্রেরণ করেন না। তিনি এখন একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য কুমার অনুপের জন্য গঠিত করিতেছেন। পূর্ব্বাধিকৃত সাতগড়া ও বাজুচতুষ্টয় ব্যতীত, তিনি এক্ষণে ছিন্দাবাজু প্রভৃতি আরও তিনটি পরগণা অতিরিক্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত, প্রতাপ অক্ষুণ্ণ। শত্রুমিত্র সকলেই পদানত—বশীকৃত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক চিত্র।

রাঠোর-কুমারের চরিত্র-গঠন।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের প্রশান্ত তপোবন হইতে কোলাহলময়ী রাজধানী পর্য্যন্ত একই পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাহাকে জগতের মধ্যে চিরপূজ্য করিয়া রাখিয়াছিল। যে কঠোর সংযমের উপর ভারতের সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সেই সংযম শিক্ষা মুনিকুমার ও রাজকুমার উভয়কেই সমভাবে অভ্যাস করিতে হইত। উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া পরে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইত। ভারতের রাজধর্ম্ম ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র শক্তির মিশ্রণে গঠিত হইয়াছিল। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাইব, তপোবনের পবিত্রতাস্বরূপ মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া শকুন্তলা ও মূর্ত্তিমান রাজধর্ম্ম দুষ্মন্তের মিলনে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই ভারতবর্ষ বা ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাই ভারতের রাজন্যবৃন্দ ব্রাহ্ম-শক্তি ও ক্ষাত্র-শক্তি উভয়কেই অবলম্বন করিয়া জগতে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের রাজধর্ম্মে পদে পদে সংযমের পরিচয় পাওয়া যাইত। রামচন্দ্র বল, যুধিষ্ঠির বল, তাঁহাদের চরিত্র

অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংযমই তাঁহাদিগকে অমর করিয়া গিয়াছে। সেই জন্ত তাঁহারা ভারতের আদর্শ নরপতি-রূপে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত সেই অপূর্ব্ব সংযত চরিত্র চিত্রিত করিয়া আজিও আমাদিগকে সংযম-শিক্ষার জন্ত উপদেশ দিতেছে। কিন্তু হায়, আমরা কোন্ পথে চলিয়াছি!

আমরা যে পথে চলি না কেন, ভারতবর্ষ সে আহ্বান একেবারে উপেক্ষা করে নাই। বর্ত্তমান যুগের পবিত্র তীর্থ রাজস্থান সেই আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া নিজের যে গৌরব-কাহিনী প্রচার করিয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। রাজস্থানের মিবার, মাড়বার প্রভৃতির মহাপুরুষগণ সংযম-শিক্ষা-বলে যে অপূর্ব্ব চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিয়াই বোধ হয়। যাঁহারা রাজস্থানের ইতিবৃত্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, রামায়ণ-মহাভারতে চিত্রিত অনেক চরিত্র তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত আছে, এবং সেই সকল চরিত্রের মূল যে সংযমশিক্ষা তাহা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। রাজস্থানের ইতিবৃত্তের ন্যায় জীবন্ত রামায়ণ-মহাভারত ভারতের অল্প স্থানের ইতিহাসেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাঠান মোগলের শাণিত তরবারি যাহার বক্ষকে নিরন্তর রুধির-প্লাবিত করিয়াও অবসন্ন করিতে পারে নাই, জহরব্রতের অগ্নিকাণ্ড যাহাকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াও ভস্মসাৎ করিতে পারে নাই, যাহার প্রতি ধূলিকণা ও প্রতি ভস্মকণা হইতে মহাপুরুষ ও মহাসতীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত জগতের কোন্ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়? বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে তাহার তুলনা কোথায়? আমরা বারংবার বলিয়াছি ও আবার বলিতেছি যে, প্রাচীন আর্য্য নর-নারীগণের অপূর্ব্ব সংযম-শিক্ষার আস্বাদ লাভ করিয়া রাজস্থানের

নরনারী জগতে এই উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের জীবনে রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অপূর্ব্ব সংযম-শিক্ষার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

মরুস্থলী মাড়বার তাহার কঠোর প্রকৃতি লইয়া চিরদিনই রাজস্থানে অবস্থিতি করিতেছে। মাড়বারের রাঠোর-বীরগণ আপনাদের পরাক্রমের জন্য ভারতের ইতিহাসে চিরবিখ্যাত হইয়া আছেন। কেবল পরাক্রম বলিয়া নহে, তাঁহাদের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ তাঁহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। রাঠোর-রাজগণ ও রাঠোর-সর্দ্দারগণের বীরত্ব ও আত্মত্যাগে সমগ্র রাজস্থান মোহিত। রাঠোর-রাজগণ যেমন স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য জীবন বলি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, রাঠোর-সর্দ্দারগণ তেমনই প্রভুর কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। রাঠোর-রাজগণের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া রাঠোর-সর্দ্দারগণ যেরূপ প্রভুভক্তি ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে তাঁহাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। এই প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগ যে সংযম শিক্ষার ফল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাঠোর-রাজগণ সংযম শিক্ষা করিয়া যেরূপ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, রাঠোর-কুমারগণও সেইরূপ সংযম শিক্ষা করিয়া আপনাদের চরিত্র গঠন করিতেন। রাঠোর কুমারগণ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বকালে যেরূপ পঞ্চবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল, তাহারই অনুকরণ করিয়া রাঠোর-কুমারগণ ইন্দ্রিয় বিজয় করিয়া আপনাদের চরিত্র-গঠনে প্রবৃত্ত হইতেন। সংযম অভ্যাস করিয়া তাঁহারা বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতেন, এবং কঠোরমাড়বারের প্রকৃতির ন্যায় আপনাদের

প্রকৃতিও কঠোর করিয়া তুলিতেন। যাঁহারা বাল্যকাল হইতে ইন্দ্রিয় বিজয় করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারা সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া সংযতভাবে যে কর্ত্তব্য পালন করিতেন, তাহা বোধ হয় সকলেই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। যখন এই সমস্ত কুমারগণের মস্তকে রাজছত্র ধৃত হইত, তখন তাঁহাদের তপস্তা-প্রভাবে আলোকিত হইয়া রাজলক্ষ্মী আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তাঁহাদের হস্তের শানিত তরবারি চিরদিনই অক্ষয়ভাবে তাঁহাদের হস্তে বিরাজ করিত। পাঠান মোগলের শাণিত তরবারি সহসা তাহাকে হস্তচ্যুত করিতে সক্ষম হইত না। সংযমের বজ্রমুষ্টি যাহাকে ধারণ করিয়া রাখিত বিলাসের কম্পিত হস্ত তাহার সহিত যে স্পর্দ্ধা করিতে পারিত না তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ফলতঃ রাঠোর-রাজগণ বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাসের বলে ইন্দ্রিয় বিজয় করায় ভারত ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। রাঠোর রাজগণের সংযম-শিক্ষা বংশ-পরম্পরায় এরূপভাবে চলিয়া আসিয়াছিল যে, কেহ তাহা লঙ্ঘন করিলে চিরদিনের জন্য তাঁহার অধঃপতন হইত। কেবল অধঃপতন বলিয়া নহে, তাঁহার সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইত। দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

মাড়বার-রাজ মালদেবের পুত্র উদয় সিংহ বাল্যকালে সংযম শিক্ষা করিয়াও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অনেকগুলি রমণীকে অন্তঃপুরচারিণী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া এক ব্রাহ্মণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। মাড়বারের ভিলারগ্রামে অনেক আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণের বাস। ইহারা আর্য্যামাতার উপাসক। উদয় সিংহ ভিলারের কোন আর্য্যপন্থী ব্রাহ্মণের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অঙ্কশায়িনী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কন্যার পিতা কলঙ্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য

কন্যাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস দ্বারা দেবীর হোম ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, এবং নিজে আত্মহত্যা করিয়া রাঠোর বংশের প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, উক্ত বংশের কেহ কোন রমণীর প্রতি কামভাবে নিরীক্ষণ করিলে তাঁহার প্রেতাত্মা তাহাকে আশ্রয় করিবে, এবং উক্ত ব্রাহ্মণের অভিশাপে উদয় সিংহেরও মৃত্যু সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এই যে, উদয় সিংহের প্রপৌত্র সুপ্রসিদ্ধ যশোবন্ত সিংহ তাঁহার কোন সচিব-কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় প্রণয়িনী করিবার অভিলাষ করিয়া ছিলেন, এবং তাহাকে কোন নিভৃত স্থলে লইয়া গিয়া তাহার সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা তাঁহাকে আশ্রয় করে। যশোবন্তের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সর্দ্দার নাহুর খাঁ তাঁহার পরিবর্ত্তে আত্মদান করিয়া যশোবন্তকে সেই প্রেতের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অবশ্য এ দুইটি দৃষ্টান্ত কাহিনী মাত্র। কিন্তু ইহা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? ইহা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি না, যে, এই দুইটি কাহিনী রাঠোর-কুমার ও রাঠোর-রাজগণকে স্ব স্ব চরিত্র রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া রাখিত। সংযম-শিক্ষা যাঁহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র তাঁহারা অসংযত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের পরিণাম যে ভয়াবহ হইয়া উঠে, উপরোক্ত ঘটনা দুইটি কি তাহারই সমর্থন করিতেছে না। তাই ভট্ট কবিগণ উক্ত ঘটনা দুইটিকে বিচিত্র ভাবে চিত্রিত করিয়া রাঠোর-কুমার ও রাজগণের মনে সর্ব্বদা সংযমের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। সুতরাং উপরোক্ত ঘটনা দুইটি কাহিনী হইলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

কেবল মাড়বার বলিয়া নহে, এইরূপ সংযম শিক্ষা রাজস্থানের অন্যান্য

স্থানেও যথানিয়মে প্রতিপালিত হইত। তাই রাজপুত জাতি জগতে চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছে। এই সংযম শিক্ষার ফলে সমর সিংহ, সংগ্রাম সিংহ, প্রতাপ সিংহের অভ্যুদয় হইয়াছিল। যশোবন্ত সিংহ, নাহুর খাঁ ও দুর্গাদাসের কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছিল। পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, কৃষ্ণকুমারী বসুন্ধরাকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাই রাজপুতনার প্রদেশে প্রদেশে রামায়ণ-মহাভারতের জীবন্ত লীলা অভিনীত হইয়াছিল।

সধবার বৈধব্য।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪)

কুমার অনুপ এক্ষণে ষোড়শ বর্ষীয় যুবা। বৃদ্ধা রাণী অচিরে তাঁহার শুভ রাজ্যাভিষেক ও পরিণয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন দিবারাত্র তাঁহার একমাত্র ঐ চিন্তা ও ঐ কথা। মহা ধুম্‌ধামের সহিত চারিদিকে আয়োজন ও উদ্‌যোগ হইতেছে; রাজ্যমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সুবিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দ্বারা শুভদিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী।

মল্লযুদ্ধবিশারদ বীরবর যদুনারায়ণ * এক্ষণে 'জেলালুদ্দিন' নাম ধারণ করতঃ, গৌড়ের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রবল প্রতাপে সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন। রাণী ত্রিপুরা পৌত্রের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে কোনও সংবাদই তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন না। কিন্তু, রাণী নবকিশোরী থাকিতে পারিলেন না। তিনি, গোপনে স্বহস্তে একখানি ব্যঙ্গপূর্ণ পত্রিকা রচনা করিয়া, দূতহস্তে বাদশাঃর নিকট প্রেরণ করিবার প্রবল প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

গভীর নিশীথে, সমগ্র জীবজগৎ শান্তিরূপিণী নিদ্রাদেবীর শীতল অঙ্কে অচেতন হইলে, তিনি একাকিনী স্বীয় কক্ষে অর্গলবদ্ধ করিয়া, দীপালোকে

* ইনি মল্লযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া, 'যদুমল্ল' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফেরেস্তা ইহাঁকে 'চেৎমল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'যদুমল্ল' হইতে 'যদ্‌মল্ল' এবং তাহারই অপভ্রংশে 'চেৎমল' শব্দের উৎপত্তি।

লিপি রচনায় রত হইলেন। বহুদিবসের পর আজ তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল ; চক্ষুর্দ্বয় মুহুর্মুহুঃ অশ্রুপূর্ণ হইয়া দৃষ্টিহারা হইতে লাগিল ; লেখনী বহুবার করচ্যুত হইয়া ভূমিতল স্পর্শ করিল ; লিপিপত্র অশ্রুজলে পুনঃ পুনঃ সিক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইল, তথাপি তিনি সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও একটি বর্ণমাত্রও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। আর কি-ই বা লিখিবেন? প্রথমতঃ, তাঁহাকে যে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তাহাই স্থির করিতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল ; নেত্রপথে চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া, রাত্রির শেষ যামে বহুক্লেশে ধৈর্য্যধারণ করতঃ তিনি সঙ্কল্পিত কার্য্য অতি সংক্ষেপে একপ্রকার সমাধা করিলেন। পরদিবস দূতহস্তে, বৃদ্ধা রাণীর অজ্ঞাতসারে, পত্রিকাখানি অভীপ্সিত স্থানে প্রেরিত হইল।

পত্রিকা যথাসময়ে গৌড়েশ্বরের হস্তগত হইল। তিনি দৃষ্টিমাত্র সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলেন। পত্রিকা স্পর্শমাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ; মস্তক ঘূর্ণিত হইল ; পলকের মধ্যে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সমগ্র জগত কাঁপিয়া উঠিল ; এক নিমিষে কি-যেন-কি-এক মহাপ্রলয় ঘটিয়া গেল। বহুক্ষণ পরে তিনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, পত্রিকাখানি উন্মোচন করতঃ পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"শ্রীশ্রীহরি।

প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত জেলালুদ্দিন শাঃ বাহাদুর

রাজোন্নতিষু—

লম্বা সেলামপূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মৃত মহারাজ যদুনারায়ণ শর্ম্ম খাঁ সাহেবের পুত্র শ্রীমান অনুপনারায়ণ শর্ম্মা খাঁ সাহেবের — তারিখে শুভ বিবাহ ও ভাদুড়ী রাজ্যে অভিষেক হইবে।

পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। হুজুর আলি বেগম সাহেবা সহ আগমন পূর্ব্বক শ্রীমানের কল্যাণ প্রার্থনা এবং সময়োচিত সভাসৌষ্ঠব করিবেন।

ইতি—তারিখ—

আজ্ঞাধীনা—

শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ।”

পত্রপাঠান্তে গৌড়েশ্বর একান্ত অধীর হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন! তাঁহার অন্তরজগতে আজ মহাপ্রলয় উপস্থিত।

(৫)

কে উনি? গৌড়নগরাধিপের এই বিবিধকোলাহলমুখরিত সুবিস্তৃত রাজপুরে, একটি সুসজ্জিত জনশূন্য প্রকোষ্ঠে, একটি বিচিত্র-কারুকার্য্য-খচিত পর্য্যঙ্কোপরি, করলগ্নকপোলে অবনতমস্তকে উপবিষ্ট—কে উনি? উন্নত ললাট, আয়তলোচন, বিশালবক্ষঃ, আজানুলম্বিতভুজ, দিব্যকান্তি ঐ যুবাপুরুষটি কে? এই নির্জ্জন স্থানে, তিনি আজ একধ্যানে অনন্যমনে কাহার চিন্তায় এরূপ চিত্তহারা? এত দীর্ঘনিশ্বাস, এত হা-হুতাশ কাহার জন্য?—ও কি? যুবকের মুষ্টিমধ্যে কি দেখা যাইতেছে না?—একখানি পত্র! এ পত্র কাহার? এই পত্রখানিই কি তাঁহার চিত্তবিকারের মূলীভূত কারণ?

পাঠক! ঐ শুন—আর অধিক উদ্বেগের প্রয়োজন নাই—ঐ শুন যুবক চিত্তবেগে বিহ্বল হইয়া আপনিই আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন:—

“মৃত মহারাজ যদুনারায়ণ”—হাঁ যথার্থই আজ যদুনারায়ণ মৃত!—কুলাঙ্গার নরাধম যদুনারায়ণ যথার্থই আর ইহজগতে নাই! যদুর সেই স্নেহময়ী মাতা, প্রণয়িনী পতিপ্রাণা পত্নী, প্রাণাধিক পুত্র,—সকলেই বর্ত্তমান; কিন্তু, যদুর সহিত তাহাদের আজ সকল সম্পর্ক, সকল বন্ধন

চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন ; যে মাতা, তাঁর যদু ভিন্ন আর কিছুই জান্‌তেন না ; যদুর এক বিন্দু অশ্রুপাত দেখ্‌লে, যাঁর বক্ষঃ হতে শত বিন্দু শোণিত-পাত হয়ে যেতো ; যদুর স্বাস্থ্য, যদুর শুভ, যদুর উন্নতি, যাঁহার একমাত্র চিন্তা ও প্রার্থনার বস্তু ছিল ; শয়নে, স্বপনে, যাঁর 'আমার যদু' ভিন্ন আর অন্য বুলি ছিল না ; যদুকে দেখ্‌লে, যদুর মুখের 'মা' বুলি শুন্‌লে, আনন্দে যিনি অধীরা হয়ে পড়্‌তেন ; যদুর একটুমাত্র শরীর অসুস্থ হলে, যিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে অবিশ্রান্তভাবে তার শুশ্রূষা করতেন, দেবমন্দিরে মাথাকুঁড়ে রক্তপাত করতেন ;—হায়, হায়, আজ যদুর সেই পুত্রবৎসলা স্নেহশীলা মাতা, যদুর নামমাত্রে জ্বলে উঠেন ; উঠ্‌তে বস্‌তে তার মৃত্যুকামনা করেন। যাহারা যদুর পদসেবা সুখলাভের জন্য, যদুর পাদোদক পান করিবার জন্য সতত লালায়িত থাক্‌তো, তারা আজ যদুর ছায়ামাত্র স্পর্শ করলেও অপবিত্র হয়েছি ব'লে মনে করে! যদুর নামোচ্চারণ করতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করে!—তবে, কিরূপে বল্‌বো, যে, আমি এখনও সেই যদুনারায়ণই আছি? কিরূপে বল্‌বো, আমিই সেই স্বর্গগত মহাত্মা মহারাজ গণেশের ও সেই দেবীরূপিণী রাণী ত্রিপুরার বংশধর পুত্র?

" 'ভদ্রং ন কৃতং' !—হায়, অতি কুকার্য্যই করেছি! সামান্য রূপ-মোহে মুগ্ধ হয়ে, দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণজন্ম বৃথা বিসর্জ্জন দিয়েছি! মূর্খ আমি—অতি মূর্খ আমি—প্রলোভনের বশীভূত হয়ে, দেবধাম স্বর্গের সহিত ক্রিমি-কীটপূর্ণ কুৎসিত নরকের বিনিময় করেছি! সুরসেব্য চন্দনের পরিবর্ত্তে চণ্ডালোচিত শকৃৎ গ্রহণ করেছি!—আমি জীবন্তেও নিশ্চয়ই মৃত!

"হা রাণী নবকিশোরি! হা মানবরূপিনী দেবি! হা পতিপরায়ণা সাধ্বি!—তোমার স্বর্গোপম পবিত্র হৃদয়ে এই ধর্ম্মত্যাগী কুলত্যাগী পাপি-ষ্ঠের স্থান এখনও কি আছে? পার' নাই সতি! আজও কি তুমি তোমার এই অকৃতজ্ঞ পিশাচপ্রকৃতি পতির জ্বালাময়ী স্মৃতি হৃদয় হ'তে

নির্ব্বাসিত করতে পার নাই? সকলেই অকে পরিত্যাগ করেছে, সকলেই তার পাপস্মৃতি চিরদিনের মত অন্তর হতে উন্মূলিত করেছে;—কিন্তু, কিন্তু, দেবি! তুমি কি তা' অদ্যাপিও পার নাই?—হা নিষ্ঠুর—হা কৃতঘ্ন যদুনারায়ণ! নরকেও কি তোর স্থান হবে?

"হায়, এখন আর অনুতাপ বিলাপ সব বৃথা! সহস্র চেষ্টাতেও, আমার অশ্রুপাতেও,—ত্রিভুবন বিনিময়েও আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পা'ব না। এখন এরূপ অধৈর্য্য হয়ে আত্মগ্লানি প্রকাশ করাও মূর্খতা এবং এতদ্দ্বারা মুসলমান সমাজে লঘু ও ঘৃণাস্পদ হওয়ারই সম্ভাবনা। এক্ষণে মনোভাব গোপন রাখাই কর্ত্তব্য। যাই হোক্, এখন রাণীর পত্রের উত্তর কি লিখি?"

যুবক অশ্রুমার্জ্জন করিলেন এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। বলা বাহুল্য এই যুবকই গৌড়নগরাধিপ বাদশাঃ জেলালুদ্দীন।

বহুক্ষণ পরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, যুবক শিরঃ উত্তোলন করিলেন। অনেক চিন্তা করিয়াও, রাণী কিশোরীকে কি বলিয়া পাঠ লিখিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে, অনেক তর্কবিতর্কের পর, তিনি নিজ পক্ষ হইতে কিছু না লিখিয়া, বেগম আশমান্ তারার নাম দিয়া একখানি পত্রিকা রচনা করিলেন। পর দিবস নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ, দেওয়ানজী শ্রীযুক্ত রাজা জীবনচন্দ্র রায়, অভিষেক সামগ্রী ও সেই পত্রিকাখানি সহ, সাতগড়া অভিমুখে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার সহিত হস্তী অশ্ব এবং বিবিধ ধনরত্নাদি ও অনেক লোকজন প্রেরিত হইল।

(৬)

আজ সেই শুভদিন। কুমার অনুপনারায়ণের আজ পরিণয় ও অভিষেকের দিন। আজ রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্রই উল্লাসের উচ্চ কোলাহল, গীতবাদ্যের গম্ভীর ও মধুর নিনাদ এবং অসংখ্য নরনারীকণ্ঠের অবিরাম

কলকলায় ধ্বনি শ্রবণকুহর বধির করিবার উপক্রম করিয়াছে। কোনও স্থানে পত্রপুষ্পপতাকাসজ্জিত অত্যুচ্চ মঞ্চোপরি সুমিষ্টস্বরে নহবত বাজিতেছে এবং সেই বিবিধ তানলয়সমন্বিত সুসঙ্গত স্বরলহরী চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া, উৎসবকারিগণের উৎসাহবর্দ্ধন করতঃ অনন্তাকাশে বিলীন হইতেছে; কোনও স্থানে জগঝম্প জয়ঢাক প্রভৃতির গুরুগম্ভীর শব্দে দিগ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে; কোনও স্থানে মণিমুক্তাখচিত বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে সুচারু বেশভূষায় বিভূষিতা মনোমোহিনী নর্ত্তকীগণ, স্বভাব-মধুর বামাকণ্ঠের সুস্বর সঙ্গীত-তরঙ্গে শ্রোতাবর্গের চিত্তক্ষেত্র আন্দোলিত করিয়া বাদিত্রের তালে তালে নৃত্য করিতেছে; কোথাও মৃদঙ্গ-খোল-করতালে সর্ব্বসঙ্গীতসার সুধাধার হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছে—উর্দ্ধবাহু ভক্তবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। * স্থানে স্থানে দেবমন্দিরে, পট্টবস্ত্র-উত্তরীয়ধারী তেজঃপুঞ্জ শুদ্ধাত্মা বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ, ভাবী-নরপতির ও রাজ্যের কল্যাণকামনা করতঃ, 'পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী, শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয়চণ্ডী, সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থ পাঠে রত হইয়াছেন; এবং কোনও স্থানে, স্থণ্ডিলমধ্যস্থ প্রজ্বলিত প্রণীত হোমাগ্নির চতুর্দ্দিকে উপবেশন করতঃ, শাস্ত্রবিশারদ ঋত্বিজ্গণ অঞ্জলিপুটে সুগন্ধগব্যঘৃতসংযুক্ত সমিধ্ গ্রহণ করিয়া 'স্বাহা'-স্বধ্যাদিমন্ত্রে আহুতি প্রদান করিতেছেন। আজিকার এই পুণ্যোৎসবে, সুবিস্তৃত 'সাতগড়া' রাজ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিবিধ আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়াছে; চারিদিকে শত শত নরনারী, দাসদাসী, যাচকভিক্ষুক, আহুত অনাহুত, বিবিধ উদ্দেশ্যে বিবিধ কার্য্যে ছুটাছুটি করিতেছে। সর্ব্বস্থলেই ডাকহাঁক হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

* পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া, এই সময় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচার করেন ও আচণ্ডালে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করেন।

আজ বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরাদেবীর তিলমাত্রও অবকাশ নাই। এখনি ভাণ্ডারে, পরক্ষণেই পাকশালে, তৎপরেই যজ্ঞক্ষেত্রে, তিনি মন্ত্রশক্তিশালী যাদুকরের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। তিনি কাহাকেও ভৎর্সনা করিতেছেন, কাহাকেও আদেশ করিতেছেন, কাহাকেও বা সস্নেহবাক্যে আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন; তিনি আজ যেন শতমুখ, শতহস্ত, শতপদ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য তৎপরতায় ও বুদ্ধিবিচক্ষণতায়, শিশুবৃদ্ধ, নরনারী, আত্মপর, শত্রুমিত্র, সকলেই ধন্য ধন্য করিতেছে।

কিন্তু কোথায় রাণী নবকিশোরী? এই বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে, কই কোথাও ত তাঁর দর্শন পাইতেছি না? তিনি কি আজ তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র অনুপের মঙ্গল কামনায় মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে পূজারাধনায় নিযুক্তা আছেন? অথবা অন্য কোনও গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন? চল, পাঠক! আমরা একবার সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, এই দুর্ভেদ্য মানবব্যূহ ভেদ করিয়া সেই অনাথিনী অভাগিনী কিশোরীকে অন্বেষণ করি।

(৭)

ঐ দেখ! আজ এই আনন্দের দিনেও, এই সমুদ্রকল্লোলসদৃশ আনন্দ কোলাহলের মাঝেও, রাণী নবকিশোরী মলিনবেশে রুক্ষকেশে একাকিনী একটি নির্জ্জন কক্ষে নিরাধারে উপবেশন করিয়া, অনন্যমনে একখণ্ড কি পত্রিকা পাঠে নিযুক্তা আছেন। তিনি পত্রিকাখানি একাধিকবার পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; ঐ শুন, স্বীয় করতলে অশ্রুরাশি মার্জ্জন করিয়া এবং স্থানচ্যুত আলুলায়িত কুন্তলকলাপ ললাট ও নয়ন হইতে অপসারিত করিয়া, তিনি অনুচ্চস্বরে পুনরায় সেই পত্রখানি আবৃত্তি করিতেছেন :—

"প্রবল প্রতাপান্বিতা শ্রীলশ্রীযুক্তা মহারাণী নবকিশোরী দেবী বাহাদুরা রাজ্যোন্নতিষু———

প্রণাম নিবেদনঞ্চ বিশেষ——

শ্রীযুক্ত বাদশাহের নামিক আপনার প্রেরিত পত্রে শ্রীমান অনুপ-নারায়ণ বাবাজীর শুভ বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক হওনের সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীযুক্ত বাদশাঃ নামদার এবং আমরা সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করি-লাম। স্বর্গীয় মহারাজ গনেশনারায়ণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুয়ার দেবালয়ে এবং গৌড়ের মসজিদে শ্রীমানের কল্যাণার্থ পূজা ও উপাসনার আদেশ করা হইল। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ শ্রীযুক্ত রাজা জীবনচন্দ্র রায় দেওয়ানজী মহাশয়কে অভিষেক সামগ্রী সহ পাঠাইলাম। লজ্জাপ্রযুক্ত আমি ও বাদশাঃ নিজে যাইতে পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি—
তারিখ——

আজ্ঞাধীনা·——

আশ্‌মান্‌তারা বেগম।"

আহা! ইহা তাঁহার সেই চিরারাধ্য হৃদয়দেবতার চিরপরিচিত পবিত্র হস্তাক্ষরে পবিত্রীকৃত! পত্র পাঠান্তে রাণী অপলক নেত্রে সেই অক্ষর-গুলির প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; আর পারিলেন না, তাঁহার আয়ত নয়নযুগল দৃষ্টিহারা হইল,—সহসা ভগ্নবাঁধ জলস্রোতের ন্যায় অজস্র অশ্রুস্রোতে তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডদ্বয় ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তিনি পত্রিকাখানি অতি যত্নে বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন:—

"হা স্বামিন্!—হা দেবতা!—বুঝিয়াছি প্রভো, এই অভাগিনী কিঙ্করীর প্রতি তোমার সেই পূর্ব্বস্নেহ—সেই পূর্ব্ব ভালবাসা অদ্যাপিও একেবারে পরিশুষ্ক হয় নাই; তোমার স্মৃতিপটে এই দীনাহীনা পাগলিনী নবকিশোরীর মলিন ছায়া এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। হা নাথ!

আমি যে পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল অনন্যমনে তোমার চরণসেবা করিয়া আসিয়াছি; পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল তোমার অনন্ত স্নেহে—অনন্ত করুণায় অতি যত্নে অতি আদরে স্বর্গসুখে প্রতিপালিত হইয়াছি; একদিনের জন্যও, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, কই—কখনও তো দাসীর প্রতি তিলমাত্রও অনাদর বা অবহেলা প্রকাশ করো নাই? একটি মাত্র কটুবাক্য, কি একটি মাত্র রোষ কষায়িত নেত্রের কটাক্ষপাতে? কই, কখনও তো এই পদাশ্রিতা পদসেবিকাকে বিন্দুমাত্রও মর্ম্মপীড়া প্রদান করো নাই? তবে, তবে প্রাণাধিক! আমার অদৃষ্টে কেন সহসা এমন হলো? ·

'আহা, প্রেমতরুরূপে ছিল, কেন রে এমন হলো!"

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া রাণী ভূতলশায়িনী হইলেন। তড়িদ্‌বেগে রাজ-অন্তঃপুরে সংবাদ প্রচারিত হইল। অচিরকাল মধ্যে অসংখ্য পরিচারিকা ও পুররক্ষীগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিধিমতে তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

বহুক্ষণপরে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল। তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে অঙ্গের বস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার মূর্চ্ছা দূর হইল বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের সেই দাবদাহ,—সেই মরণাধিক অসহ্য যন্ত্রণা বিন্দুমাত্রও প্রশমিত হইল না। তাঁর জীবনসর্ব্বস্ব পতিদেবতার স্বহস্তরচিত স্নেহরসসিক্ত পত্রিকাদৃষ্টে, তাঁর শোকাগুণ আজ শতগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। অতীতের প্রত্যেক ঘটনা একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া,শত শত রক্তমুখ তপ্ত সূচিকার ন্যায় তাঁহার মর্ম্মতল বিদ্ধ করিতেছে। তাঁর অন্তরজগতে মহান অনর্থ সমুপস্থিত। তিনি সহস্র চেষ্টাতেও ধৈর্য্যধারণ করিতে অক্ষম হইয়া, পুনর্ব্বার অজস্র ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সকলের সদুপদেশ ও সান্ত্বনাবাক্য বর্ষাকালীন প্রবল স্রোতমুখে শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

বৃদ্ধারাণী পুত্রবধূর মূর্চ্ছা ও মূর্চ্ছার কারণ অবগত হইয়া ক্রুদ্ধা

ফনিণীর ন্যায় দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে পুত্রবধূর উপর শাশুড়ীর প্রভুত্বের পরিসীমা ছিল না। রাণী ত্রিপুরা কক্ষমধ্যে পদার্পণ করিয়াই বধূর অবস্থা দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু, আজ শুভদিন—অনুপের রাজ্যাভিষেক, তজ্জন্য অধিক কটূক্তি প্রয়োগ না করিয়া, তিনি উগ্রভাবে কেবলমাত্র বলিলেন—"কিলো বৌ! এত বেলা হলো এখনো তুই মঙ্গলচণ্ডীর পূজোয় বসিস্ নাই? আবার সেই পুরাণো কাঁদ্‌না কাঁদ্‌ছিস্?—যা গিয়েছে, তা হাতের বালাই পায়ের বালাই গিয়েছে; যা আছে এখন তারই মঙ্গল দেখ। তুই কি এই শুভ-দিনে সেই অপিণ্ডিয়ার জন্যে চোখের জল ফেলে আমার অনুপের অক-ল্যেণ কর্‌বি?"

শাশুড়ীর তিরস্কারে ও তীব্রস্বরে রাণী কিশোরী ভয়ে ও লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন; তাঁহার হস্তপদ যেন উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল; শারদাকাশে মেঘগর্জ্জনের সহিত মেঘরাশির অপসরণের ন্যায়, বৃদ্ধার তর্জ্জনে মুহূর্ত্তমধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয় হইতে শোকের ছায়া অপসারিত হইল। তিনি অবিলম্বে হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করতঃ বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ৺মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে গমন করিলেন।

(৮)

যথাসময়ে, যথাশাস্ত্রবিধানে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের তত্ত্বাবধারণে কুমার অনুপনারায়ণের শুভপরিণয় ও রাজ্যাভিষেক সুশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন হইল। বৃদ্ধা রাণী, মনের সাধে মুক্তহস্তে ও মুক্তহৃদয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, অতি প্রশংসার সহিত এই উভয় মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা করি-লেন। এই উপলক্ষে তিনি অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সজ্জনগণকে প্রভূত ধনরত্নাদি প্রদান করিলেন; আত্মীয় অনাত্মীয়, এমন কি, সাতগড়া দ্বীপে যে কেহ আগমন করিল, সকলকেই যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা ও অন্নবস্ত্রাদির দ্বারা

পরিতুষ্ট করিলেন; সৈন্যসামন্ত ও দাসদাসীগণকে যথেষ্ট সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করিলেন। সমস্ত প্রজাবর্গের এক বৎসরের খাজনা 'মাফ' করিলেন; এবং কয়েদিগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, পথখরচা দিয়া বিদায় করিলেন।

তিনি আজ তাঁহার অতি আদরের পৌত্র ও পৌত্রবধূকে আপনার উভয় পার্শ্বে লইয়া, রাজ-সিংহাসন আলোকিত করিয়া বসিলেন। অদ্য তাঁহার সকল কষ্ট, সকল দুঃখ তিরোহিত হইল; তাঁহার নয়ন-যুগল আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বর-বধূ (রাজারাণী) কে বাষ্প-গদগদকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহা-দিগকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"স্মরণ রাখিও, অদ্য হইতে তোমরা কিরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইলে; স্মরণ রাখিও, অদ্য হইতে তোমরা কিরূপ কঠোর ব্রতে ব্রতী হইলে। রাজপদ, রাজার বিলাসব্যসনাদি পাশবিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিতৃপ্তির উপায় স্বরূপ নহে; ইহা তাঁহার আত্মসুখ সম্পাদনের বা আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি-পালন ও স্বচ্ছন্দ-বিধানের জন্য নহে। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন এবং সহস্র আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন সুখসমৃদ্ধি সম্পাদন। তোমরা রামায়ণে পাঠ করিয়াছ, এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই, রঘুকুলরবি নরনারায়ণ রামচন্দ্র, প্রজারঞ্জনের জন্য, আপনার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নী সতীলক্ষ্মী সীতা-দেবীকেও নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই রাজপদই নৃপতি-গণের স্বর্গ ও নরকের দ্বার্ স্বরূপ; যদি রাজা রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 'রাজা' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়েন, তবেই তিনি জীবনান্তে দুর্ল্লভ স্বর্গসুখের অধিকারী হন; নতুবা, তাঁহাকে গভীর নিরয়ে কৃমিকীটের ন্যায় কোটিকল্পকাল পরিভ্রমণ করিতে হয়। অধিক আর কি বলিব? বৎস অনুপ! বৎসে!—সতত সতর্ক থাকিও, প্রাণান্তেও

যেন কখনও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইও না; মায়া-মোহের মোহন প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া, যেন সত্যমার্গ হইতে কদাচ বিচলিত হইও না;—সাবধান! খুব সাবধান! সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে সতত প্রত্যক্ষ করিয়া, কি গোপনে কি প্রকাশ্যে, ক্ষুদ্র বা মহৎ সকল কার্য্যই সম্পাদন করিও।"

উৎসব-কোলাহল ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। কার্য্যান্তে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ একে একে সকলেই স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেওয়ানজী রাজা: জীবন রায়ও অনুচরগণসহ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য সকলের ন্যায় ইঁহারাও যথোচিত সৎকৃত হইয়াছিলেন। বিদায়-কালে, রাণী নবকিশোরী পরিচারিকার হস্ত দিয়া দেওয়ানজীকে একটি ছোট ঝালি (পেট্‌রা) ও একটি কৌটা প্রদান করিয়া, প্রথমটি বেগম আশ্‌মান্ তারাকে এবং দ্বিতীয়টি বাদশাঃ বাহাদুরকে উপহার দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ানজী স্বীকৃত হইয়া গৌড়াভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।

(৯)

গৌড়ের রাজভবনে, বাদশাঃর বিশ্রামাবাসে, একখণ্ড বহুবর্ণবিচিত্র কুসুমকোমল গালিচাসনে বাদশাঃ ও বেগম উপবিষ্ট আছেন। উভয়েই কিঞ্চিৎ চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন; স্থিরনেত্রে দ্বারপথে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন কাহার আগমনের অপেক্ষা করিতেছেন। পরিচারিকাগণ পদোচিত বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া, তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিয়াছে; কেহ স্বর্ণপাত্রে সুবাসিত তাম্বুল যোগাইতেছে; কেহ হীরকখচিত অপূর্ব্ব চাক্‌চিক্যশালী বহুমূল্য আল্‌বোলায় তাম্রকূট রচনায় ব্যস্ত আছে; কেহ বা শিখিপুচ্ছশোভিত রত্নমণ্ডিত সুচারু ব্যজন গ্রহণ করিয়া, ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতেছে;—এইরূপে, বিবিধ কার্য্যে সকলেই ব্যাপৃতা

রহিয়াছে। এমন সময়, একটি দাসী দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বাদশাঃ ও বেগমকে যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখে একটি ছোট ঝালি ও একটি কৌটা স্থাপন করিল। গৌড়াধিপতি, সুমিষ্টস্বরে পরিচারিকাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক, কিছুক্ষণ নির্জ্জনে অবস্থিতির অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া, তাহাদিগকে কার্য্যান্তরে গমনের আদেশ প্রদান করিলেন। আজ্ঞামাত্র, তাহারা ক্ষণকালের জন্য অলঙ্কারের রুণুঝুনু শব্দে কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, ধীরপাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইল।

বাদশাঃ কহিলেন—"আশ্মান্! এই লও,—শীঘ্র ঝালি উন্মোচন কর, রাণী নবকিশোরী তোমায় কি উপহার দিয়েছেন দেখ।" এই বলিয়া তিনি ঝালিটি উত্তোলন করিয়া বেগমের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং অতীব আগ্রহ ও যত্নের সহিত কৌটাটি আপন হস্তোপরি স্থাপন করিয়া অনিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে আশ্মান্ অতীব কৌতূহলপরবশ হইয়া ঝালিটি উদ্ঘাটন করিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, বহুবিধ দুর্ল্লভ-রত্ন-বিখচিত বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে ঝালিটি পূর্ণ! বাদশাঃর ও নয়ন সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। বেগম পরম কৌতূহলাবিষ্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া, অলঙ্কারগুলি এক একখানি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। বাদশাহের নিকট এ অলঙ্কারগুলি নূতন নহে; তিনি দৃষ্টিমাত্রেই চিনিতে পারিলেন, এই রত্নাভরণগুলি তিনিই তাঁহার পূর্ব্বপ্রেয়সী নবকিশোরীকে উপহার দিয়াছিলেন এবং এই গুলিই কিশোরীর অতি মাত্র আদরের ও সাধের সামগ্রী ছিল, ও তাঁহার পবিত্র অঙ্গে স্থান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। এই অলঙ্কারগুলিতে তাঁহার অনাথিনী দুঃখিনী নবকিশোরীর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। বাদশাঃ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দাবানলে শুষ্ক তরুর ন্যায়, স্মৃতির অনলস্পর্শে তাঁহার অন্তর সহসা ধূ ধূ

ধন্য, ধন্য, আশ্‌মান্! তোমার সপত্নীর প্রতি এই অকপট সহানুভূতি, স্বার্থময় সংসারক্ষেত্রে অতীব দুর্ল্লভ। দয়াবতি! রমণীকুলে তুমি অমূল্য রত্নস্বরূপা; অথবা, মানবীর আকারে তুমি দেবী।

আশ্‌মানের এই বিলাপবাক্যে ও অশ্রুপাতে, বাদশাঃ মোহিত ও বিস্মিত হইলেন। তিনিও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন—"ধন্য আশ্‌মান্! ধন্য তুমি! তোমার এই স্বর্গীয় রূপরাশির মধ্যে, এই লোকাতীত গুণরাশিই, এই কুলকলঙ্ক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বাল্যকাল হ'তে * তোমার প্রতি আকৃষ্ট ক'রে রেখেছে; তাকে স্বধর্ম্ম ও স্বজনবিচ্যুত ক'রে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য ক'রেছে। সহস্র অপ-রাধে অপরাধী হ'লেও তোমা হেন রমণীরত্নলাভে, আমিও আজ ধন্য।"

(১০)

এইবার তিনি ভয়ে ভয়ে সেই কৌটাটি উন্মোচন করিলেন। তাঁহার বক্ষঃ দুরু দুরু করিতে লাগিল। না জানি, ইহাতে আবার কি আছে? এ কি! এ আবার কি! দৃষ্টিমাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; দেখি-লেন, কৌটার অভ্যন্তরে কয়েকটি ভগ্ন খাড়ু ও শাঁখার খণ্ড এবং ভূর্জ্জ-পত্রে লিখিত একখানি পত্র! এই খণ্ডিত শাঁখা ও খাড়ুগুলিও তাঁহার অপরিচিত নহে; তিনি হস্ততলে সেইগুলি গ্রহণ করিয়া ভাবিতে লাগি-লেন—"হায়, হায়, অভাগিনী সত্য সত্যই কি তবে বিধবার বেশ পরিগ্রহণ করিয়াছে? হিন্দুবিধবার অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই সযত্নবর্দ্ধিত, সুখপালিত, কুসুমকোমল, সুগোল দেহ, কৃষ্ণপক্ষীয় শশধরের ন্যায়, দিন দিন কৃশ ও ক্ষীণ করিতেছে?

* রাজা গণেশ যখন সম্মুখযুদ্ধে নসেরিৎশাঃকে নিহত করিয়া গৌড়ের রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন আশ্‌মান্‌তারা বালিকা ছিলেন; যদুনারায়ণেরও তখন কৈশোরাবস্থা; সেই সময়ই ইঁহাদের উভয়ের প্রণয়-সঞ্চার হয়।

হায়, হায়, আমি বর্ত্তমানেও, আমার সেই প্রিয়তমা, প্রাণাধিকা কিশোরী আজ অনাথিনী—বিধবা! উঃ!" একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার নাসাপথ হইতে বহির্গত হইয়া অনন্ত বায়ুসাগরে বিলীন হইল।

পুনর্ব্বার তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যবলে অল্পক্ষণ-মধ্যে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিলেন এবং সেই ভূর্জ্জপত্রাঙ্কিত লিখনখানিতে মনোনিবেশ করিলেন। এখানি তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া লিখিত হইয়াছে; ইহাও সেই নবকিশোরীরই হস্তাক্ষর। নবকিশোরী ইহাতে লিখিয়াছেন :—

"যবনীর তরে যদি স্বামী দেয় জাতি।
কি পাঠ লিখিবে তারে কহ গৌড়পতি॥
মিলন সম্ভব নহে সে পতির সনে।
তার বাড়া শত্রু আর নাহি ত্রিভুবনে॥
সূর্য্যপ্রিয়া সরোজিনী সর্ব্বলোকে কয়।
মিলন সম্ভব নাই অতি দূরে রয়॥
প্রখর তপন-তাপে শোষে সরোজল।
জল বিনে দিনে দিনে শুখায় কমল॥
তেমনি বিরহতাপে শোষে প্রেমনীর।
দেহ মন শুষ্ক প্রাণ যায় রমণীর॥
ধর্ম্মার্থে রমণীগণ পতিব্রতা হয়।
ধর্ম্মার্থে কিশোরী পতি ছেড়ে দূরে রয়॥
জীবিত থাকিতে পতি বিধবা কিশোরী।
হেন অভাগিনী কেবা আছে মরি মরি॥"

পত্রপাঠ শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই প্রলয়াগ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইল! আত্মগ্লানি ও অনুতাপের প্রচণ্ড অনলে তাঁহার বহিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল! শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, শত সহস্র অনল-শিখা হূ হূ করিয়া ছুটিতে লাগিল! বীরেন্দ্রের অপরিসীম ধৈর্য্যশক্তি সেই

অমিতপ্রতাপ প্রলয়াগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত—ভস্মীভূত হইতে লাগিল! তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে বিষময়ী মৃত্যুযন্ত্রণার করালগ্রাসে সংজ্ঞাহীন—শবতুল্য হইতে লাগিলেন!—হায়, পাঠক! কেমন করিয়া বুঝাইব, এই হতভাগ্য গৌড়পতির মানসিক অবস্থা আজ কিরূপ শোচনীয়-কিরূপ যন্ত্রণাপ্রদ? যাঁহার হৃদয় আছে, তিনিই তাঁহার এই হৃদয়ের অবস্থা অনুভব করিবেন।

ইহজীবনে তাঁহার আর এ যন্ত্রণার অবসান হয় নাই। অতঃপর যদিও তিনি মুসলমান-সমাজে হেয় এবং কাপুরুষ নামে অভিহিত হইবার ভয়ে, কোনও প্রকারে বাহ্যিক প্রশান্তভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজকার্য্যে যথারীতি মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার মর্ম্মতলে এই বিষশল্য আমরণ সমভাবেই বিদ্ধ ছিল।

(১১)

রাজা অনুপনারায়ণ সাতগড়ার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজ-কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরার উপদেশ ও সুশিক্ষা গুণে, তিনি সুশৃঙ্খলায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া প্রজাবর্গের সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন।

পুত্রের রাজ্যাভিষেকের পরদিবস হইতে, রাজমাতা নবকিশোরী কঠোরতর ব্রত আরম্ভ করিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া তিনি দিন দিন দুর্ব্বল ও কঙ্কালসার হইতে লাগিলেন। বৎসরের অধিকাংশ দিন তাঁহার প্রায় উপবাসেই অতিবাহিত হইত।

এইরূপে চারিটি বৎসর অতীত হইল। নবকিশোরীর আয়ুষ্কালও পূর্ণ হইয়া আসিল; এই সংসার-নাট্যাঙ্গনে তাঁহার অভিনয় শেষ হইল; অচিরেই তিনি, তাঁহার সেই যন্ত্রণাময় ভারভূত নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যময় শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বসন্তাপহারী মৃত্যু তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দান করিল।

এই দুঃসংবাদ শীঘ্রই গৌড়েশ্বর বাদশাঃর শ্রুতিগোচর হইল। তিনি গুপ্তকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক অভাগিনী কিশোরীকে স্মরণ করিয়া একান্ত অধীরভাবে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন—"হায়, হায়, আমিই এই সাধ্বী সতীর শোচনীয় অকাল-মৃত্যুর একমাত্র কারণ!—আমিই তার প্রাণহন্তা!" এইরূপে নানা-বিধ বিলাপ পরিতাপ পূর্ব্বক, শিরে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিয়া তিনি প্রবলবেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়, আশ্‌মান্‌ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার প্রাণাধিক স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া, দুঃখিত ও ভীত চিত্তে তাঁহাকে তাঁহার এই আকস্মিক অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদশাঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সাশ্রুনেত্রে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—"হায়, আশ্‌মান্‌! কি আর বলিব? সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! রাণী নবকিশোরী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া, অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে! হায় আশ্‌মান্‌ আমিই তার একমাত্র মৃত্যুর কারণ।"

বেগম ক্ষণকাল স্তম্ভিতার ন্যায় নীরব নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান রহি-লেন; তৎপরে দীননয়নে বাদশাঃর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অতীব দুঃখের সহিত কহিলেন—"ছি, ছি, তুমি বড়ই অন্যায় কাজ ক'রেছ!—এরূপ সতী সাধ্বী সুশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে তুমি অতীব গর্হিত কাজ করেছ! তোমার চরিত্র দেখে আমার বড় ভয় হয়, পাছে পুনরায় তুমি অন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, এইরূপে আমাকেও পরিত্যাগ কর!—উঃ, পুরুষ কি ভয়ঙ্কর স্বার্থপর নিষ্ঠুর জাতি!"

বেগমের সুমধুর ভর্ৎসনা-বাক্যে, লবণাক্ত ক্ষতস্থানের ন্যায়, তাঁহার দগ্ধ অন্তর দ্বিগুণতাপে জ্বলিয়া উঠিল; তাঁহার জ্ঞানচক্ষু এতদিনে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইল। তিনি অতিকষ্টে উত্তর করিলেন—"উঃ বটে!—পাপি-ষ্ঠের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপই বটে! 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর!'—

বুঝেছি আশ্‌মান্‌, বুঝেছি সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ! কিন্তু, তুমি যে তার সপত্নী হ'য়েও তার সর্ব্বদা প্রশংসা কর এবং ভ্রমেও কখনও তার প্রতি নীচোচিত কটূক্তি প্রয়োগ কর না, তজ্জন্য আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তুমি নিজে গুণবতী না হইলে, অপরের গুণ কখনই স্বীকার করিতে পারিতে না। যাহা হউক, এক্ষণে আর আমরা সেই স্বর্গীয়া দেবীর কোনও উপকার বা অপকার করিতে সক্ষম নহি। তবে, তোমার নিকট এখন আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, তুমি যেন আমার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র রাজা অনুপনারায়ণের কখনও কোনও অনিষ্ট করিও না; তাহাকে চিরদিন অপনার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দর্শন করিও এবং সকল বিপদ আপদে সাহায্য প্রদান করিয়া রক্ষা করিও। অধিক আর কি বলিব? আশ্‌মান্‌! আমার দিন নিকটবর্ত্তী।" বাদশাঃ নীরব হইলেন; আবার তাঁহারচক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বেগম অতি কাতরভাবে গৌড়পতির পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া, আপন অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ধীরে ধীরে কহিলেন—"আপনি দেবতা; আমি আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র আমেদশাঃর ন্যায় অনুপকে চিরদিন স্নেহের চক্ষে দর্শন করিব; এবং তাহাকে সকল বিপদ আপদ হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিব; তাহারা উভয়েই আমার সমান স্নেহের পাত্র।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, অবসন্ন হইয়া বাদশাঃ ধীরে ধীরে উপাধানে মস্তক রক্ষা করিলেন।*

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

* ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা আরও চিত্তাকর্ষক। ইহাতে বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরার দেবী-চরিত্র অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তত্ত্বান্বেষী ইতিহাস-পাঠক তাহার রসাস্বাদন করিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের ইহা বর্ণনীয় নহে।

পঞ্চকূট-রাজবংশ-পত্র

—:*:—

পঞ্চকূট-রাজবংশ পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বংশ। এককালে ইঁহাদের রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরেশনাথ পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্দ্ধমানের নিকট পর্য্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডে তাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের সীমান্তরক্ষক ব্যক্তিবৃন্দ একণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। তন্মধ্যে পালগঞ্জ, ঝরিয়া, নওয়াগড়, কাত্রাস প্রভৃতির অধিপতিগণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত পঞ্চকূট রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনেক প্রধান প্রধান জমিদারীরও সৃষ্টি হইয়াছে। কাশীমবাজার রাজবংশের চটিবালিয়াপুর জমিদারী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সমস্ত রাজ্য ও জমিদারী এককালে যে রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, তাহা যে অতীব বিশাল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই বিশাল রাজ্যের নরপতিগণ বহুগ্রাম দেবসেবার, ব্রাহ্মণসেবার ও ভৃত্যবর্গের ভরণপোষণের জন্য অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এতভিন্ন এই বংশের অনেক সৎকীর্ত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে।

পঞ্চকূট-রাজবংশ সাধারণতঃ পঞ্চকোট বা পাঁচেট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইঁহাদের আদি রাজধানী একটি পর্ব্বত হইতে রাজ্যের নামকরণ হইয়াছে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের রামকানালী ষ্টেসনের নিকট একটি পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতের প্রান্তভাগে এই প্রাচীনবংশের আদি রাজধানী স্থাপিত ছিল। একণে পর্ব্বতটির প্রকৃত নাম

স্থির হইলে রাজবংশেরও যথার্থ নামকরণ হয়। আমরা এক্ষণে উহার আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি। পর্ব্বতের নাম পঞ্চকোট হইলে ইহার অর্থ কিরূপ হয়, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। কোট বা কোঠ শব্দে বেষ্টন অথবা দুর্গ বা গড় বুঝায়। এক্ষণে পঞ্চকোট পর্ব্বতের পাঁচটি বেষ্টন বা তাহাতে পাঁচটি দুর্গ ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার পাদদেশে যেখানে রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, তাহা অবশ্য দুর্গাকারে বেষ্টিত ছিল। সেই দুর্গেরও পাঁচটি বেষ্টন ছিল কিনা, তাহা বুঝা যায় না। কনিংহাম সাহেব পঞ্চকোট শব্দে পঞ্চপ্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গ অর্থ করিতে চাহেন। কিন্তু সেই পাঁচটি প্রাচীর স্থির করিতে তাঁহাকে অনেক কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে। আমরা নিম্নে কনিংহাম সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"About 10 miles to the South-west of Borakar stands the high solitary hill of Pachet ; at its South-eastern foot is the fort of Pachet, once the residence of the Rajas of Pachet, now deserted and in disrepair ; the name of this fort is said to be a contraction of Ponchokot, and the explanation of the name now given is, that the Rajas of Pachet reigned over five Rajas but the word clearly means five forts, and I consider the name to have reference rather to the number of walls that depedn the citadel—"Kot" There are four sets of walls, each within the other, surrounding the kot on the west, south and east, the north being depended by the hill itself, at the toe of the slope of which the citadel stands ; but, beyond the last line of the walls of the fort, tradition

says, ran another line of the walls and the positions ascribed to the parts of this wall show that the so-called outermost rampart was nothing else than the natural ridge lines of the undulating country round the fort, taking this outer natural line of ramparts—if ramparts they can be called—we have the five sets of walls necessary to explain the name." (Archæological survey of India vol VIII.)

কনিংহাম সাহেবের এরূপ কষ্টকল্পনায় পঞ্চকোট শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থির হয় না। এই পর্ব্বতের সাধারণ নাম পাঁচেট বা পাঁচুট, পাঁচুট হইতে পাঁচেট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঁচুট অর্থে পাঁচচূড়া বুঝায়। পূর্ব্বে কোন সামাজিক দোষ করিলে তাহার মস্তকের পঞ্চস্থানে চূড়া রাখিয়া মুণ্ডন করা হইত। সে ব্যক্তিকে পাঁচুট বলিত। পাঁচুট শব্দে পঞ্চচূড়া বুঝাইলে, পর্ব্বতের প্রকৃত নাম বুঝিতে বিলম্ব ঘটিবে না। পর্ব্বতের চূড়ার নাম কূট। তাহা হইলে ইহার প্রকৃত নাম পঞ্চকূট হইতেছে। এই পঞ্চকূট ক্রমে পঞ্চকোট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই প্রসিদ্ধ পর্ব্বতটিতে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্য তাহার একটি নাম ছিল। পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ স্থাপিত হওয়ায় উহার যে নামকরণ হইয়াছে, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পর্ব্বতের নামেই রাজধানী বা রাজ্যের নাম হই-য়াছে, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই পর্ব্বতে কি পাঁচটী চূড়া আছে? আমরা বলি যে, ইহার ক্ষুদ্র বৃহৎ চূড়া পাঁচটির অধিক হইলেও ইহার প্রধান পাঁচটি চূড়া লইয়াই ইহার পঞ্চকূট নামকরণ হইয়াছিল। ফলতঃ পর্ব্বতের নাম পাঁচুট হইলে, তাহা যে পঞ্চকূট হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কালে পাঁচুট হইতে পাঁচেট ও পঞ্চকূট হইতে পঞ্চকোট হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চকূট-রাজবংশ বহুদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে আপনাদের রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পরে বিহার-রাজগণের অধীন ভূপতি রূপে গণ্য হন। পরিশেষে মোগল বাদসাহদিগকে পেস্কশ বা নজরানা প্রদান করিতেন। রাজা গরুড় নারায়ণের সহিত প্রথমে পেস্কশের নূতন বন্দোবস্ত হয়। নবাব মুর্শিদকুলী ও সুজাখাঁর সময় পাঁচেট জমিদারী বলিয়া উল্লিখিত হইলেও তাহার রাজস্ব পেস্কশ বলিয়াই অভিহিত হইত।

পঞ্চকূট-রাজবংশের যে বংশ-পত্র প্রদত্ত হইল, ইহা হইতে জানা যাইবে যে, তাঁহারা কিরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। বহুবর্ষ ব্যাপিয়া এরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে রাজত্ব বঙ্গদেশে দুর্লভ। সেই জন্য আমরা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি। পঞ্চকূট-রাজবংশের বর্ত্তমান রাজধানী কাশীপুরে তাঁহাদের যে বংশ-পত্র রক্ষিত আছে, আমরা অবিকল তাহাই প্রদান করিতেছি। ইহাতে কোনরূপ সংশোধন করা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে টিপ্পনীতে আমাদের মত ব্যক্ত করা হইয়াছে মাত্র। ইঁহারা আপনাদিগকে প্রমার রাজপুত বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে আনুপূর্ব্বিক বংশপত্র প্রদত্ত হইল।

পঞ্চকোটাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরগণের কুর্সিনামা।—

—:*:—

উজ্জয়িনী-বংশের বংশাবলী।

শৌনিক মুনি হোম করিয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে ৪ চারিজন ছত্রি উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যথা—(১) পাম্নার (২) সুনংক্ষি (৩) চোহান (৪) পারহার জন্মগ্রহণ করেন।*

উজেন পাম্নারের বংশাবলী।

আদি মহারাজ—

(১) শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ

(২) শ্রীগন্ধর্ব্ব সেন সিংহ

(৩) শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহ

(৪) শ্রীমুবিজশ সিংহ

(৫) শ্রীউদয়াচল সিংহ

(৬) শ্রীজগৎ দেও সিংহ

(৭) শ্রীখণ্ডন সিংহ

(৮) শ্রীহুঙ্কার সিংহ

(৯) শ্রীউদয়াজিৎ সিংহ

পশ্চিমদেশে ধাবর নগর রাজ্যে রাজ্যাধিকারী ছিলেন।

(১০) শ্রীজগৎ সিংহ

(১১) শ্রীদামোদর শেখর সিংহ

এই মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্বক্ষমতায় পঞ্চকোটী কাকনার মহারাজ হইয়া ইস্তক ২ শক নাং ৬২ শক মুদ্দতে ৬১বৎসর রাজত্ব করেন।†

(১২) শ্রীইন্দ্রশেখর সিংহ

(৬৩—১০১)—৩৯ বৎসর

(১৩) শ্রীমুকুন্দ শেখর সিংহ

(১০২—১৪৬)—২৯ বৎসর

(১৪) শ্রীরামচন্দ্র সিংহ

(১৪৭—১৭৫)—২৯ বৎসর

* প্রমার, শোলাঙ্কি, চৌহান ও পরিহার। শোলাঙ্কির স্থলে চালুক্য ও দৃষ্ট হইয়া থাকে

† শকাব্দের প্রথম হইতে এই রাজত্বারম্ভ প্রকৃত কি না তাহা বিবেচনার বিষয়।

(১৫) শ্রীপুরুষোত্তম সিংহ,
(১৭৬—২০২)—২৭ বৎসর
|
(১৬) শ্রীশঙ্কর শেখর সিংহ
(২০২—২৪৫)—৪৩ বৎসর
|
(১৭) শ্রীভগবন্ত শেখর
(২৪৬—২৬৪) ১৯ বৎসর
|
(১৮) শ্রীঅনিরুদ্ধ শেখর সিংহ
(২৬৫—৩০১) ৩৭ বৎসর
|
(১৯) শ্রীজগন্নাথ শেখর সিংহ
(৩০২—৩১৬) ১৫ বৎসর
|
(২০) শ্রীউদ্ধবশেখর সিংহ
(৩১৭—৩৩৩) ১৭ বৎসর
|
(২১) শ্রীঅনন্ত শেখর সিংহ
(৩৩৪—৩৬৭) ৩৪ বৎসর
|
(২২) শ্রীচতুর্ভুজ শেখর সিংহ
(৩৬৮—৪১২) ৪৫ বৎসর
|
(২৩) শ্রীরাঘবেন্দ্র শেখর সিংহ
(৪১৩—৪২৫) ১৩ বৎসর
|
(২৪) শ্রীহরবৈদ্যনাথ শেখর সিংহ
(৪২৬—৪৪৬) ২১ বৎসর
|
(২৫) শ্রীজয় অনন্ত শেখর সিংহ
(৪৪৭—৪৬৩) ১৭ বৎসর
|
(২৬) শ্রীযুধিষ্ঠির শেখর সিংহ
(৪৬৪—৪৮২) ১৯ বৎসর
|
(২৭) শ্রীপুরানন্দ শেখর সিংহ
(৪৮৩—৫১৩) ৩১ বৎসর
|
(২৮) শ্রীভীম শেখর সিংহ
(৫১৪—৫৩৮) ২৫ বৎসর
|
(২৯) শ্রীসুন্দর শেখর সিংহ
(৫৩৯—৫৫২) ১৪ বৎসর
|
(৩০) শ্রীগোবিন্দ শেখর সিংহ
(৫৫৩—৫৭১) ১৯ বৎসর
|
(৩১) শ্রীরঙ্গন শেখর সিংহ
(৫৭২—৫৯৮) ২৭ বৎসর
|
(৩২) শ্রীজগমোহন শেখর সিংহ
(৫৯৯—৬৩৬) ৩৮ বৎসর
|
(৩৩) শ্রীবিক্রম শেখর সিংহ
(৬৩৭—৬৭১) ৩৫ বৎসর
|
(৩৪) শ্রীশেখরইন্দ শেখর সিংহ
(৬৭২—৬৯৩) ২২ বৎসর
|
(৩৫) শ্রীদুর্য্যোধন শেখর সিংহ
(৬৯৪—৭০৬) ১৩ বৎসর
|
(৩৬) শ্রীহরিশ্চন্দ্র শেখর সিংহ
(৭০৭—৭৩৭) ৩১ বৎসর
|

(৩৭) শ্রীবৈদ্যনাথ শেখর সিংহ
(৭৩৮—৭৫৪) ১৭ বৎসর
|
(৩৮) শ্রীরাঘব শেখর সিংহ
(৭৫৫—৭৯৫) ১৭ বৎসর
|
(৩৯) শ্রীপ্রভুনাথ শেখর সিংহ
(৭৯৬—৮০৮) ১৩ বৎসর
|
(৪০) শ্রীসহদেব শেখর সিংহ
(৮০৯—৮৩৪) ২৬ বৎসর
|
(৪১) শ্রীপ্রণতি শেখর সিংহ
(৮৩৫—৮৪৭) ১৩ বৎসর
|
(৪২) শ্রীকীর্ত্তিনাথ শেখর সিংহ
(৮৪৮—৮৭২) ২৫ বৎসর
|
(৪৩) শ্রীঅভয় নাথ শেখর সিংহ
(৮৭৩—৮৮৮) ১৬ বৎসর
|
(৪৪) শ্রীহরিনাথ শেখর সিংহ
(৮৮৯—৯০২) ১৪ বৎসর
|
(৪৫) শ্রীঅভয় ভঞ্জন সিংহ
(৯০৩—৯১৯) ১৭ বৎসর

(৪৬) শ্রীলছমন শেখর সিংহ
(৯২০—৯৪৩) ২৪ বৎসর।
|
(৪৭) শ্রীগজরাজ শেখর সিংহ
(৯৪৪—৯৫৬) ১৩ বৎসর
|
(৪৮) শ্রীপদ্মমন শেখর সিংহ
(৯৫৭—৯৭৩) ১৭ বৎসর
|
(৪৯) শ্রীঅর্জ্জুন শেখর সিংহ
(৯৭৪—৯৮৫) ১২ বৎসর
|
(৫০) শ্রীদিগ্বিজয় শেখর সিংহ
(৯৮৬—১০০৩) ১৮ বৎসর
|
(৫১) শ্রীজালীম শেখর সিংহ
(১০০৪—১০২২) ১৯ বৎসর
|
(৫২) শ্রীমধুকর শেখর সিংহ
(১০২৩—১০৫৬) ৩৪ বৎসর
|
(৫৩) শ্রীযুবরাজ শেখর সিংহ
(১০৫৭—১০৭৮) ২২ বৎসর
|
(৫৪) নিরঞ্জন শেখর সিংহ
(১০৭৯—১১০১) ৪২ বৎসর
|
(৫৫) শ্রীহরিশ্চন্দ্র শেখর সিংহ
(১১০২—১১৪৩) ৪২ বৎসর *

* বল্লাল সেনের এক কন্যার সহিত পঞ্চকুটের রাজা কল্যাণশেখরের বিবাহ হয়। কল্যাণেশ্বরী দেবী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। কল্যাণশেখর ২য়। হরিশ্চন্দ্র শেখর কি না বিবেচনার বিষয়।

(৫৬) শ্রীবিশ্বম্ভর শেখর সিংহ
(১১৪৪—১১৭৬) ৩৩ বৎসর
|
(৫৭) শ্রীপ্রেমশেখর সিংহ
(১১৭৭—১১৯৩) ১৭ বৎসর
|
(৫৮) শ্রীভবানীশেখর সিংহ
(১১৯৪—১২১২) ১৯ বৎসর

(৫৯) শ্রীভগবান শেখর সিংহ
(১২১৩—১২৩৮) ২৬ বৎসর
|
(৬০) শ্রীচন্দন শেখর সিংহ
(১২৩৯—১২৬৯) ৩১ বৎসর
|
(৬১) শ্রীপুরন্দর শেখর সিংহ
(১২৭০—১৩১১) ৪২ বৎসর
|
(৬২) শ্রীচন্দ্র শেখর ওরফে
হরিনারায়ণ সিংহ
(১৩১২—১৩৫০) ৩৯ বৎসর*
|
(৬৩) শ্রীরাঘব শেখর সিংহ
(১৩৫১—১৪০১) ৫১ বৎসর

(৬৪) শ্রীশ্রীনাথ শেখর ওরফে
বিষ্ণুনারায়ণ শেখর সিংহ
(১৪০২—১৪৪১) ৪০ বৎসর
|
(৬৫) শ্রীহীরালাল শেখর
ওরফে গণেশ নারায়ণ সিংহ
(১৪৪২—১৪৮৩) ৪২ বৎসর

(৬৬) শ্রীজগমোহন শেখর
ওরফে গরুড় নারায়ণ সিংহ
(১৪৮৪—১৫১০) ২৭ বৎসর
|
(৬৭) শ্রীহরিশ্চন্দ্র শেখর ওরফে
হরিনারায়ণ সিংহ
(১৫১১—১৫৪৭) ৩৭ বৎসর

(৬৮) শ্রীরামচন্দ্র শেখর
ওরফে রঘুনাথ নারায়ণ সিংহ
(১৫৪৮—১৫৫৯) ১২ বৎসর
|
(৬৯) শ্রীবলভদ্র শেখর
ওরফে গরুড় নারায়ণ সিংহ
(১৫৬০—১৬২৫) ৬৬ বৎসর
|
(৭০) শ্রীবাঁকেড়া রায় তস্য দ্বি
পুত্র, জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ শেখর
|

* বরাকরের একটি মন্দিরে ১৩৮৩ শকে ও হরিশ্চন্দ্র রাজার পত্নী হরিপ্রিয়ার নাম আছে। চন্দ্র শেখর সম্ভবতঃ—হরিশ্চন্দ্র শেখর হইবেন।

কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন শেখর। বাঁকেড়া রায় আপন পিতা বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীধাম গমন করেন। পরে বলভদ্র মহারাজ আপন পৌত্র জগন্নাথ শেখরকে রাজগদীর টীকা দিয়া "রঘুনাথ নারায়ণ" নাম আখ্যায় রাজা করায় ঐ জগন্নাথ শেখর ১৬২৬—১৬৪১ এই ১৬ বৎসর আপন পিতামহের অত্র পঞ্চকোটী রাজত্ব ভোগ করেন। পরে ঐ জগন্নাথ শেখরের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন শেখর ওরফে গরুড় নারায়ণ সিংহ ১৬৪২—১৬৭৩ এই ৩২ বৎসর আপন ভ্রাতার অত্র পঞ্চকোটী ভোগ করেন।

(৭১) বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজাধিরাজ শ্রীশত্রুঘ্ন শেখর বাহাদুরের পুত্র শ্রীভিক্ষমনাথ শেখর, তস্য পুত্র বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজাধিরাজ শ্রীমণিলাল শেখর ওরফে রঘুনাথ নারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর। ভিক্ষমনাথ শেখর আপন পিতা বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীধাম গমন করেন। পরে মণিলাল মহারাজ আপন পিতামহের রাজগদীতে কায়েম হইয়া ১৬৭৪—১৭১২ এই ৩৯ বৎসর অত্র পঞ্চকোটী রাজত্ব ভোগ করেন।

(৭২) শ্রীমণিলাল শেখর বাহাদুরের পুত্র শ্রীভরত শেখর ওরফে গরুড় নারায়ণ সিংহ (১৭১৩—১৭৩৬) ২৪ বৎসর অত্র পঞ্চকোটী রাজত্ব ভোগ করেন।

(৭৩) শ্রীচেৎনাথ সিংহ ওরফে রঘুনাথ নারায়ণ সিংহ (১৭৩৭—১৭৩৯) ৩ বৎসর।

(৭৪) শ্রীজগজীবন সিংহ ওরফে গরুড় নারায়ণ সিংহ (১৭৪০—১৭৭২) ৩৩ বৎসর।

(৭৫) শ্রীশ্রীনীলমণি সিংহ (১৭৭৩—১৮২০) (১৮৫১—১৮৯৮) ইংরাজী, ১২৫৮ সাল—১৩০৫ শুক।

(৭৬) শ্রীহরিনারায়ণ সিংহ (১৮২০—১৮২৩) (১৮৯৮—১৯০১) ইংরাজী, ১৩০৫—১৩০৮ সাল।

(৭৭) তস্য পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ দেও বাহাদুর—

জন্ম ১২৮৮ সাল
১৮০৩ শক
১৮৮১ ইংরাজী।

সেকালের যশোহর।

—•:※:০—
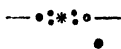
১৮২৭ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত একখানি ভূগোল-বিষয়ক পুস্তকে যশোহর জেলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—সে. আজ ৮২ বৎসরের কথা। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত যশোহরের এত পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন—এত ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে যে, একালের যশোহরের পার্শ্বে সেকালের যশোহরের চিত্র নিতান্ত মলিন বলিয়াই প্রতিভাত হইবে—তবে সংসারে যাহা কিছু প্রাচীন, যাহা কিছু সেকালের, ঐতিহাসিকের চক্ষে তাহাই মূল্যবান্—ঐতিহাসিকদিগকে তাহাই জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায়—এই সাহসেই আমরা এস্থলে সেই বিবরণটী প্রকাশ করিলাম।—

১। "যশোহর জেলার উত্তর সীমা পদ্মাবতী নদী; এই নদী গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্ব অঞ্চলে গিয়াছে, এইজন্য সাহেব লোকে ইহাকে গঙ্গা বলেন; দক্ষিণ সীমা সমুদ্র; পশ্চিম সীমা নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলার সীমালাগা পূর্ব্ব; পূর্ব্ব সীমা ঢাকা জালালপুর (ফরিদপুর) ও বাকরগঞ্জ।

২। "এই জেলার মধ্যে ভূষণা, মহম্মদপুর, নলডাঙ্গা, মুড়লী, মৃজানগর, নিমুরায়ের বাজার (সেনহাটী), খুলনিয়া, গোপালগঞ্জ, এই সমস্ত প্রধান প্রধান নগর আছে; এই সকলই প্রায় যশোহরের উত্তরাংশে। এই জেলার দক্ষিণাংশে সুন্দর বন, সেখানকার ভূমি সমুদ্রের খালেতে সর্ব্বদাই সরস, আর অনেক ভূমি বনেই ব্যাপ্ত, কেবল মলঙ্গী (লবণ

প্রস্তুতকারক) লোকেরাই সেখানে থাকিতে পারে। তথায় যদি চাসা লোকের বসতি হইয়া কৃষিকর্ম্ম চলিতে পারিত, তবে ঐ ভূমিতে সকল শস্যই জন্মিত ; কেন না, তথাকার ভূমি বড় উর্ব্বরা।

৩। "এই জেলাতে ধান্য, নীল, নারিকেল, পাটী, কাপড় আর গব্য, এই সকল সামগ্রী বড় উৎকৃষ্ট জন্মে।

৪। "এই জেলাতে ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার, মধুমতী এই সকল নদীই প্রধান।

৫। "ইংরাজি ১৮০৩ সালে শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের আজ্ঞাতে এই জেলায় বার লক্ষ লোক গণা গিয়াছিল ; তাহার মধ্যে নয় আনা মুসলমান, সাত আনা হিন্দু।"

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে ইতিহাসপ্রিয় পাঠকবর্গ যে সেকালের যশোহর জেলার ভৌগোলিক পরিচয়ের সহিত তৎকালীন বাঙ্গলা-ভাষারও একটী স্বরূপ প্রতিকৃতি জানিতে পারিবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

গঞ্জীফা।

—:*:—

(তাসখেলার জন্ম ও কোষ্ঠী)

বদনবিনা ভোজন হয় না, ভক্তিবিনা ভজন হয় না, আর আমোদ বিনা মানুষ বাঁচে না। এই দুঃখময় ও মায়াময় সংসারে ক্রমাগত অবিচ্ছিন্নভাবে যদি মানুষকে ক্লেশ, চিন্তা, অভাব ও অসুখের ভার বহন করিতে হইত, তাহা হইলে মানুষ কয়টা দিন বাঁচিতে পারিত? চিরশুষ্ক বিশাল মরুভূমির মধ্যস্থিত "সরস স্থল" (oasis) সমতুল্য অথবা অমা-রজনীতে মহাপ্রান্তরস্থিত পথিকের সম্মুখে বনপার্শ্বে দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে নিঃসৃত ক্ষীণ দীপালোকের ন্যায়, এই দুঃখাবহ সংসারে মানুষেরা মধ্যে মধ্যে একটু একটু আমোদ প্রমোদ করিবার সুবিধা পায় বলিয়া, দুঃখ ও চিন্তাকে ভুলিয়া সময়ে সময়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে। এই আমোদ দুই প্রকার, নির্দ্দোষ ও সদোষ। শাস্ত্রকার মহোদয়গণ বহু প্রকার আমোদপ্রমোদের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় বিস্তৃত ভাবে বর্ত্তমান প্রস্তাবে বিবৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না। জুয়া খেলা, মাড়োয়ারীদের অহিফেনের চৌকা খেলা, কুকুরে ও বিড়ালে লড়াই লাগা-ইয়া দিয়া সারমেয় কর্ত্তৃক মার্জ্জারের প্রাণনাশ প্রভৃতি অনেক প্রকারের খেলা আমোদের মধ্যে গণ্য হইলেও, এগুলি সদোষ সুতরাং অপ্রশস্ত। সমর-নীতি শিখিবার জন্য ক্ষত্রিয় জাতি কর্ত্তৃক বৃক্ষ বা লতাচ্ছেদনরূপ ক্রীড়া, কৃত্রিম মল্লযুদ্ধ, শূন্যে অস্ত্রনিক্ষেপ, জলে লম্ফ প্রদান প্রভৃতিতে অনিষ্টের (এমন কি প্রাণনাশের আশঙ্কা) থাকিলেও ইহা অশাস্ত্রীয় নহে। যে ক্রীড়ায় অধিক পরিমাণে এবং অধিক সময়ের জন্য পশুপক্ষীকে ঘোরতর যন্ত্রণা দেওয়া হয়,

তাহাতেপ্রশ্রয় দিতে মহর্ষিগণ একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন; সঙ্গীত, কবির লড়াই, প্রদর্শনী, ভাস্কর্য্য, বসন্তকেলি, মরালপোত, বিদূষকের শ্লেষ প্রীতি-ভোজ,ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি সদোষ নহে। দ্যূতক্রীড়া (পাশা খেলা) সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধবিধি বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাস, সৎরঞ্চ (দাবা), কড়িখেলা প্রভৃতি প্রাচ্যসমাজে এতই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, এইগুলি একপ্রকার ভদ্রসমাজে ও সাধারণ সমাজে আমোদপ্রমোদের অন্যতম প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে ক্রীড়া বহু দেশে বহুপ্রকার, তাহার তালিকার আবশ্যক নাই। এতন্মধ্যে তাস ও দাবা খেলাদ্বয় স্বদেশ ও বিদেশ এই উভয় স্থানেই এখন পর্য্যন্ত প্রবল-ভাবে প্রচলিত দেখা যায়। তাস কতদিনের পুরাতন খেলা, তাহা নিশ্চিত প্রকারে নির্ণয় করা দুরূহ। মহাভারত ও রামায়ণ শাস্ত্রদ্বয় যেমন জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্ট আকর, তেমনি সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের বিবরণের বর্ণনায় অতুলনীয় ভাণ্ডার; কিন্তু ইহাতে তাস বা তাসের প্রতিনিধি স্বরূপে কোন খেলার বিবরণ পাই না। অনুসন্ধানদ্বারা যতটুকু অবগত হওয়া যায়, তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, মুসলমান জাতি "তাস" ক্রীড়ার সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক এবং তুরস্কদেশে ইহা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়া ইরাণ (পারস্য) দেশে উন্নতিলাভ করে, ক্রমে ক্রমে ইহা সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় সভ্যসমাজের লোকেরা বর্ত্তমানকালে তাসের খেলা করে বটে, কিন্তু ক্রীড়ার প্রণালী সকল স্থানে এক নহে। এই ভারতবর্ষেই প্রায় ১৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা দেখা গিয়াছে। ভারতে যবন-শাসনের সময়ে মোগলেরা তাস খেলার খুব উন্নতি করিয়াছিল, এখন তাহাদের প্রবর্ত্তিত প্রথা, ভদ্রসমাজের অন্দরে ও বৈঠকখানায় প্রচলিত আছে।

বাঙ্গালাদেশে যাহাকে আমরা "তাস" বলি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে; সকল দেশে একই প্রকারের তাস চলে না এবং

তাসগুলির মধ্যে বঙ্গদেশীয় তাসের ন্যায় চিত্র থাকে না। পৃথিবীর কত দেশে কত প্রকারের তাস তৈয়ার হয় এবং কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খেলার প্রথা আছে, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম।

	কত প্রকারের তাস আছে।	কত প্রকারের খেলা আছে।
বঙ্গদেশে (মায় পূর্ব্ববঙ্গ)	২	৩
ইংলণ্ড ...	১	৫
আমেরিকা		৬
ফ্রান্স	৪	৯
জর্ম্মনী	১	১
পর্টুগাল	৩	৪
গ্রীশ	৪	৫
ইটালী	২	৩
মিশর	৩	৩
চীন	১	১
জাপান	১	১
ভারতবর্ষ (বঙ্গদেশ ব্যতীত) ...	৪	১২
আরব্য	১	১
পারস্য	[illegible]	১০
তুরস্ক	১৩	১১

মুসলমান জাতির দ্বারাই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম তাস খেলা চলিতে আরম্ভ হয়। বিদেশীয় যবন বণিকেরা জলপথ ও স্থলপথ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিত, তাহাদের দ্বারাই ভারতবাসী সর্ব্বপ্রথমে তাস খেলিতে শিক্ষা করিয়াছিল, ক্রমে ভারতবাসী পাঠান ও মোগলদিগের কর্ত্তৃক তাহার বিশেষ উন্নতি হয় এবং নূতন নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। হিন্দু রাজারা অনেকদিন হইতে বহু প্রকারের তাস বহু প্রথানুসারে খেলিয়া

আসিতেছেন ; সেই সকল তাসের আকার ও তাসখেলার প্রথার মধ্যে অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও অতি প্রাচীনকাল হইতে কয়েকটি হিন্দুরাজবংশে একপ্রকারের অদ্ভুত তাস খেলা পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহার নাম—“গঞ্জীফা।”

কতকগুলি প্রতিভাশালী হিন্দু নরপতি মুসলমানদিগের প্রবর্ত্তিত বিদেশীয় তাস খেলার প্রথা পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক নূতনভাবে—হিন্দুমতে—তাস তৈয়ার করিবার চেষ্টা করেন এবং পরিণামে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া নবীন প্রথানুসারে এক আশ্চর্য্য তাস খেলার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। প্রায় পঞ্চশত বৎসরকাল ব্যাপিয়া এই প্রকারের তাস ও এই প্রকারের নূতন প্রথা, অনেক হিন্দু রাজবংশে চলিয়া আসিতেছে, এখনও তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ নূতন তাসের নাম “গঞ্জীফা”। ইহা অবশ্য মুসলমানীয় নাম, কিন্তু সেকালে মুসলমান-শাসনপ্রভাবে মুসলমান-ভাষার বহু প্রচলন থাকা হেতু হিন্দু রাজগণ “গঞ্জীফা” নাম ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা এখন “গঞ্জীফা” অর্থে সর্ব্বপ্রকার তাসকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তব কথা এই, হিন্দু রাজাদের ঐ নূতন ধরণের তাসের নামই “গঞ্জীফা”। এই অদ্ভুত তাসের কৌতুককর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

পারস্য “গন্‌জ্” অর্থে ধন, এস্থলে ধনী, বণিক্, মহাজন, শেঠী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যশালী (প্রভুত্বশালী) লোককেই বুঝিতে হইবে। এই শ্রেণীর লোকেরা অন্দরমহলে, বন্ধুসমাজে, বৈঠকখানায়, প্রমোদোদ্যানে তাসের ক্রীড়া এবং বিবিধপ্রকার কৌতুক (হাতের চাতুরী) দ্বারা দর্শকগণকে আমোদিত করিতেন, এই জন্য তাসের নাম গঞ্জীফা, অর্থাৎ বড় লোক কর্ত্তৃক কৌতুক বা হস্তকৌশল (চাতুরী), কিংবা ক্রীড়া প্রদর্শনের উপায়। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের গঞ্জীফা এখন সুলভ নহে, ইহার খেলা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয় এবং ইহা সহজে আর তৈয়ারী

হয় না। যে সকল রাজবংশে ইহার খেলা এখনও প্রচলিত আছে, সেখানে রাজবেতনভোগী দুই একজন কারিকর থাকে, কিন্তু জনসাধারণের জন্য "গঞ্জাফা" তাস অতি অল্পই বিক্রীত হয়। তৈয়ার করিবার লোকের সংখ্যা খুব কম, সুতরাং দশ বিশ যোড়া তাস একত্রে দরকার হইলে সহজে পাইবে না। তাহার পরে আর এক কথা এই, ইহার ক্রীড়াপ্রণালীও সহজে শিক্ষা করা যায় না, সুতরাং তাসের প্রচলন কম ; এইজন্য তাসও বহু সংখ্যায় বা বহু স্থানে পাইবে কিরূপে ? মধ্যপ্রদেশের কতকগুলি প্রাচীন হিন্দুরাজবংশে এখনও গঞ্জীফা খেলার চলন আছে : আমি বাঙ্গালা ১৩১৫ সনের প্রাবৃট্ ঋতুতে মধ্যপ্রদেশান্তর্গত অমরকণ্টক নামক পর্ব্বতে সুপ্রসিদ্ধা নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-স্থান (Source) দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রাচীন পাটনা গড় নামক করদ হিন্দুরাজ্য হইতে গঞ্জীফা আনিয়াছি, তাহার বিবরণ শুনিলে পাঠকেরা কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন।

গঞ্জীফা তাস কাগজে প্রস্তুত হয় না, ইহা চামড়া বা কাপড়ের জিনিষ নহে, অথচ বৃক্ষপত্র কিংবা বল্কল নয়। সমুদয় তাসগুলি "গালা"র (লাক্ষার) দ্বারা প্রস্তুত। সমুদয় তাসের সংখ্যা ১৪৮ ; ভাবিয়া দেখ, এক সেটে এতগুলি তাস থাকে, ইহাদের সকল তাস লাক্ষায় তৈয়ার হয়। চারিজন মানুষে পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিদিন যদি দুই চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত খেলে, তাহা হইলেও তাস ভাঙ্গে না অথবা ছেঁড়ে না কিংবা মচকাইয়া যায় না। রঘুনাথপুরের রাজবাটীতে চারি পুরুষের পুরাতন গঞ্জীফা আছে, তাহাতে অসংখ্য মানুষ অসংখ্যবার খেলিয়াছে, কিন্তু এখনও যেন নূতন। তাসের আকার গোল (সম্পূর্ণ গোল) এবং বর্ণ লোহিত। লাক্ষা ভিন্ন আর কিছু জিনিষ ইহাতে নাই, সুতরাং তৈয়ারীর বাহাদুরী দেখ !! যে বাক্সে তাস রক্ষিত হয় তাহাও গালা নির্ম্মিত ; যদি ছোট কাঠের কৌটায় তাস রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্স লাক্ষার দ্বারা চিত্রিত হইয়া

থাকে। গঞ্জীফা তাস কলে তৈয়ার হয় না, ছাঁচেও ঢালা হয় না, ছাপা-খানা বা লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হয় না, সমুদয় তাস হাতের তৈয়ারী, অথচ ছাপা হইতেও সুন্দর ও মজবুত। সেকালের পটোগণ যেমন হাতের আঁকা পট প্রস্তুত করিত, এই তাস সেইরূপ হাতের দ্বারা চিত্রিত অথচ লিথোর ন্যায় দেখিতে মনোহর। পাঠকপাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হই-বেন, এই ১৪৮ খানা তাসে সমুদয় রামায়ণ গ্রন্থখানি চিত্রিত আছে। রামায়ণ শাস্ত্রে যুদ্ধ, বিগ্রহ, সমুদ্র, বন, পর্ব্বত, জীব, জন্তু প্রভৃতি যাহা কিছু পড়িয়া থাকেন, এই তাসের ভিতরে তাহা আছে। এই ১৪৮ খানা তাসের মধ্যে কতকগুলির নমুনা এস্থলে দেওয়া হইল। ১। গন্ধমাদন পর্ব্বত। ২। সমুদ্র। ৩। পঞ্চবটী। ৪। গোদাবরী। ৫। চিত্রকূট। ৬। হনু-মান্। ৭। সুগ্রীব। ৮। মারীচ। ৯। রাবণ। ১০। সীতা। ১১। শ্রীরামচন্দ্র। ১২। লক্ষ্মণ। ১৩। কানন। ১৪। সূর্পণখা। ১৫। লঙ্কা। ১৬। সেতু। ১৭। বাল্মীকি। ১৮। লব। ১৯। কুশ। ২০। ভগবতী। ২১। বিজয়াদশমী। ২২। ভরত। ২৩। শত্রুঘ্ন। ২৪। শতঘ্নী। অস্ত্র। ২৫। গদা। ২৬। অশ্ব। ২৭। লক্ষ্মণের শক্তিশেল। ২৮। ইন্দ্রজিৎ। ২৯। রথ। ৩০। সারথী। ৩১। কুঠার। ৩২। তীরধনু। ৩৩। রাক্ষস। ৩৪। অশোকবন। ৩৫। জটায়ু। ৩৬। সীতার অগ্নিপরীক্ষা। ৩৭। বিভীষণ। ৩৮। কল্পতরু। ৩৯। ভগবান। নারায়ণ। ৪০। বিশল্যকরণী। ৪১। সূর্য্য। ৪২। কোকনদ। ৪৩। গুহক। ৪৪। অহল্যা ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ সমুদয় রামায়ণের প্রায় সকল জীব জন্তু, অস্ত্র, তরু, লতা, মানুষ, রাক্ষস, দেবতা, বন, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, ধাতু ইত্যাদি এই ১৪৮ খানা তাসে আঁকা আছে। তাস দেখিতে অতি সুন্দর, একটা কোটের পকেটে দুই তিন সেট তাস অনায়াসে রাখিয়া দেওয়া যায়। তাসের একদিক খালি থাকে, অপর দিকে চিত্র থাকে। খালির দিক্ একেবারে লাল, অপরদিক্ নীল, হরিদ্রা, পিঙ্গল প্রভৃতি রং মাখাইয়া দিয়া তাহার উপরে নানা বর্ণের ছবি আঁকা হইয়া

থাকে। তুলি দ্বারা ছবি অঙ্কিত হয়। শুনিয়াছি, কোন কোন তাসের সেট দুইদিকেই চিত্র আছে, কিন্তু সে তাস দেখি নাই। দুই একটি হিন্দু রাজার ঘরে এবম্প্রকারের দুই এক জোড়া অতি প্রাচীন গঞ্জীফা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রচলন আর নাই, সুতরাং ইহা তৈয়ারও হয় না।

এইবারে গঞ্জীফা খেলার নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রকৃত কথা এই, স্বচক্ষে এই খেলা না দেখিলে বা দেখাইলে, ১৪৮ খানা তাসের অদ্ভুত খেলা কেহ সহজে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে না। মোটের উপরে কথা এই, লঙ্কা জয়, রাবণ বধ, সীতার উদ্ধার ও বিজয়া দশমী এই চারিটি এই খেলার উদ্দেশ্য। এই চারিটিই খেলার Four Stages (চারিটা "তনকীন্") ; খেলার এই চারিটি stages বা তনকীন্ শেষ হইলে তাস খেলারও শেষ হয় ; যে দল এই তিনটা তনকীন্ সমাপন করিয়া চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ বিজয়া দশমীর উৎসব দেখাইতে পারে, সেই দলের জয় হয় এবং জয় হইলেই ক্রীড়ক ও দর্শকগণ "জয় রাম" "জয় জয় রাম" বলিয়া আনন্দে উচ্চ চীৎকার করিয়া খেলা সাঙ্গ করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য চারিজনে বা আটজনে মিলিয়া এই তাস খেলিতে হয়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

পাণ্ডুয়া। *

(১)

যে স্থানে আজি কর বিচরণ,
পবিত্র যে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি
ক'রো না ক'রো না তার অপমান !

(২)

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী,
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি,—
ক'রো না ক'রো না তার অপমান !

(৩)

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার ?
পুণ্য হলদীঘাট আজও বর্ত্তমান !
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?
ক'রো না ক'রো না তার অপমান !

(৪)

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত—
ক'রো না ক'রো না তার অপমান !

* বৈদ্যবাটী "যুবক-সমিতি"-গৃহে পঠিত।

(৫)

আজও বৃদ্ধ আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান!
আদিশিছে শুন অভ্রান্ত-ভাষায়,—
ক'রো না ক'রো না তার অপমান! *

পরাধীন জাতির দুর্ভাগ্য যে, তাহার অতীত-কাহিনী জনশ্রুতির ন্যায় শুনায়। অতীত গৌরব তাহার নিকট ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস। বিদ্রূপে তাহার চিত্ত এতই অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহারই পূর্ব্বপুরুষগণ একদিন তাহারই অনুরূপ না হইয়া, জগতে স্বাধীনপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় বাহুতে বল, মনে শক্তি ও মস্তিষ্কে বুদ্ধি ধারণ করিতেন, ইহা চিন্তা করিতেও তাহার কুণ্ঠা বোধ হয়। ফলে এক দারুণ গাঢ় নিশ্চেষ্টতা ও ও নিবিড় ঔদাসীনতা তাহাকে আচ্ছন্ন করতঃ মৃতবৎ করিয়া তুলে।

আজ আমাদের এইরূপ অবস্থা। প্রাচীন গৌরব-চিহ্ন অনাদরে কালের ক্রোড়ে মাথা লুকাইতেছে। প্রাচীন কীর্ত্তিমেখলা সহৃদয়তার অভাবে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। আর প্রাচীন কাহিনী দূরাগত অস্পষ্ট সঙ্গীতের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়কে নাচাইয়া পরক্ষণে সংসারের কোলাহলে ও তর্কের কলরবে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া যে এককালে এক সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল, কালের প্রতাপ সহ্য করিয়াও দুই একটী কীর্ত্তি আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ম্যালেরিয়া-অভিভূত, ঘননিবিড়-তরুরাজি-সমাকীর্ণ পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্য হইতে এখনও এক প্রাচীন কীর্ত্তি আপনাকে সরল ঋজুভাবে উন্নতমস্তক করিয়া রাখিয়াছে। দুর্দ্দিনের

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত।

ঝঞ্ঝা ও কালের অটুট শক্তি সহ্য করিয়া, যেন কি তীব্র প্রতিজ্ঞায় অটলভাবে দণ্ডায়মান। যেন কোন পবিত্র চরিত্রকে গৌরব-কীর্ত্তিতে উদ্দীপ্ত করিতে তাহার একান্ত বাসনা; কিন্তু তাহার সে বাসনা সফল হইল কই? তাই বুঝিয়া মন্দিরের গাত্র-নিঃসৃত বারিবিন্দু * হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশের ছলে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর বাষ্পীয় শকটে বসিয়া দক্ষিণ দিকে চাহিলে যে গোলাকার ইষ্টকস্তম্ভ দৃষ্টিপথে উপনীত হয়, তাহাই পাণ্ডুয়ার প্রাচীন কীর্ত্তি—পেঁড়োর মন্দির আজিও পাণ্ডুয়াকে বাঙ্গলা দেশের বহু নির্জীব পল্লীর মধ্যে পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। পাণ্ডুয়া ষ্টেসন হইতে নামিয়া যে পাকা রাস্তা (গ্র্যাণ্ড ট্রঙ্ক রোড্),তাহা ধরিয়া চলিলেই অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে মন্দিরের পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। পাণ্ডুয়া গ্রামটী দৈর্ঘ্যে চারিক্রোশ। কিন্তু মন্দিরের সন্নিকটে ও ইহার চারিপার্শ্বে কেবল নিঃস্ব মুসলমানের বাস। তাহাদের চিন্তাকুঞ্চিত ললাট ও নিরাশ দৃষ্টি দেখিয়া তাহাদের অতীত সৌভাগ্যের ধারণা করা কষ্টকর। বেশী দিনের কথা নয়, যে সময় দাশুরায় পাণ্ডুয়ার দুর্ভাগ্য বর্ণন করিয়া খেদোক্তি করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া ধনে ধান্যে, সম্পদে ও সম্মানে তুচ্ছ ছিল না। গ্রামের লোকের মুখে শুনা যায় যে, এককালে পাণ্ডুয়া গ্রামে ৭০০ ঘর 'আয়মাদা' বা সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস ছিল। আজ ২০ ঘর 'আয়মাদা' খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর।

পাণ্ডুয়ার অতীত ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে চিরলুক্কায়িত। 'বিশ্বকোষ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন, "গৌড়ের প্রাচীনতম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বর্ত্তমান বড় পাণ্ডুয়া, ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত জঙ্গলে পরিপূর্ণ) হইতে পাল রাজ কর্ত্তৃক আদিশূরের বংশধর তাড়িত হইলে, শূরবংশীয় নরপতিগণ দক্ষিণ রাঢ়ে আসিয়া রাজত্ব করিতেন।

* লেখক গত বর্ষায় পাণ্ডুয়ার ভগ্ন মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ তাঁহারাই পূর্ব্বতন পৌণ্ড্রের নামানুসারে নব রাজধানী, পৌণ্ড্র বা পুন্ড্র নামে অভিহিত করেন, তাহা হইতে ছোট পুঁড়ো বা পাণ্ডুয়া নাম হইয়াছে।” এককালে যে শূরগণ এই সব স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ তাঁহাদের প্রাচীন কুলাচার্য্য গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, সুতরাং উক্ত অনুমান সমীচান বোধ হয়। কিন্তু পাণ্ডুয়া নামের উপরি উক্তির সঙ্গে এই স্থানীয় এক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। গ্রামের প্রাচীনেরা বলেন যে, জনৈক পাণ্ডু বা পাণ্ডব রাজার নামানুসারে পাণ্ডুয়া নামের উৎপত্তি। ইঁহার প্রাসাদ মহনাদে অবস্থিত ছিল। পাণ্ডুয়ার চারিদিক্ পরিখার দ্বারা বেষ্টিত ছিল; বর্ত্তমান ষ্টেসন বোধ হয় গড়ের উপর অবস্থিত এবং সন্নিকটে আজিও পরিখার চিহ্ন বর্ত্তমান। টোডর মলের “জমাতুরি”তে অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গলা দেশ পাঁচটি সরকার বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে সুলেমানাবাদ পরগণা অন্যতম। ইহা বর্ত্তমান নদীয়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার কতক অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় আফগান নরপতি সুলেমান হইতে ইহার নামকরণ হয়। টোডরমলের “জমাতুরি”তে পাণ্ডুয়াই একটি স্বতন্ত্র পরগণা এবং উহার রাজস্ব ১,৮২,৩২৯ দাম বা ৪৫,৫৮২৲ টাকা; এখন এখানকার রাজস্ব প্রায় ২,০৭,৮০০৲ টাকা। কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে একটি মুনসেফী আদালত ছিল, কিন্তু এখন ইহা সদরের অন্তর্গত। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাণ্ডুয়ার নাম বিশেষ পরিচিত ছিল। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে, ফরাসডাঙ্গা যেমন কাপড়ের জন্য বিখ্যাত, সেইরূপ পাণ্ডুয়ায় একপ্রকার মসৃণ সূক্ষ্ম কাগজ প্রস্তুত হইত, তাহাকে ‘পেঁড়ুই’ কাগজ বলিত। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ সময় গ্রামে ম্যালেরিয়া উপস্থিত হওয়াতে গ্রাম জন-সম্পদহীন ও নরকঙ্কালে পূর্ণ হইয়া পড়ে। সে সময়কার বিষয় চিন্তা কারণে হৃদয় ক্ষোভে অভিভূত হয়। প্রবাদ আছে যে, এক

ম্যালেরিয়ায় সে সময় এত লোক কালগ্রাসে পতিত হয় যে, সাহায্যের অভাবে শব সকল স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া থাকিত।

সেদিন চলিয়া গিয়াছে। পাণ্ডুয়া বিগতবৈভব হৃতসর্ব্বস্ব। তাহার অতীত কাহিনী কে বিশ্বাস করিবে? বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া প্রাচীন পাণ্ডুয়া হইতে কত স্বতন্ত্র তাহা কে অনুমান করিবে? কিন্তু আজিও গ্রামের মধ্যে অনাদর ও নষ্টপ্রায় পরিত্যক্ত পুষ্করিণী প্রভৃতি তাহার অতীত ভাগ্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটী নাই। রাস্তাঘাট "লোক্যাল বোর্ডের" কর্ত্তৃত্বাধীন। নিকটে মণ্ডলাই গ্রাম। গ্রামে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস আছে। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে এখন মুসলমানের বাস। কিন্তু এককালে বোধ হয়, হিন্দুর বাস ছিল। শুনিয়াছি যে, মুসলমানের মধ্যে এখন যে দুই এক ঘর হিন্দু সুবর্ণবণিক্ বাস করেন, তাহাদের সহিত শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজোপলক্ষে এক বহুকালব্যাপী মোকদ্দমার সূত্রপাত হয়। হিন্দুদিগের দুর্গোৎসবে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বাধাদানেই ইহার সূত্রপাত। এই মোকদ্দমা ৪৩ বৎসরব্যাপী। এখনও পুলিসের সাহায্যে পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পাণ্ডুয়ার সৌভাগ্য চলিয়া গিয়াছে, কেবল অস্পষ্ট স্মৃতিটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে। সে স্মৃতি গৌরবের স্মৃতি, সে স্মৃতি সমুন্নত বাঙ্গালীর অতীতের স্মৃতি; আবার সে স্মৃতি বাঙ্গলার কলঙ্কের স্মৃতি, সে স্মৃতি দুর্ব্বল ক্লিষ্টপেশী বাঙ্গালীর কর্ম্মময় জীবনের স্মৃতি, আবার সে স্মৃতি তাহার দৌর্ব্বল্যের স্মৃতি, অবসাদের স্মৃতি, অধঃপতনের স্মৃতি, কলঙ্কের স্মৃতি। আজ কি বাঙ্গালী এই স্মৃতি নষ্ট হইতে দিয়া জাতীয় ইতিহাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে?

পেঁড়োর মন্দিরের উৎপত্তির সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই;—পাণ্ডু বা পাণ্ডব নামক এক হিন্দু নরপতির শাসনকালে

মুসলমানগণ আধুনিক পাণ্ডুয়ার নিকট বাস করিত। রাজার এক মুসলমান মন্ত্রী ছিল, রাজপুত্রের জন্মোপলক্ষে উক্ত মুসলমান মন্ত্রী একটা গো-হত্যা করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যা করে। পরে হিন্দুগণ এই সংবাদ শুনিয়া বিদ্রোহী হয়, এবং রাজপুত্রকে হত্যা করে। এই সময়ে এই স্থানে এক ফকির বাস করিতেন, তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। প্রবাদ আছে যে, তিনি অতি শৈশবেই ফকিরী গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। হিন্দু-গণের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া মুসলমানগণ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্রাট্ .... তাঁহার মাতুল; মাতুলসমীপে নিজ বিপদের কথা বলাতে সম্রাট্ সেনা দিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলাদেশে পাঠাইয়া দেন। তিনি আসিয়া হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। প্রথম কতিপয় যুদ্ধে হিন্দুদিগেরই জয় হয়। অবশেষে পীর সাহেব অবগত হন যে, মহানদে এক পুষ্করিণী আছে; তাহার জলস্পর্শে মৃত জীবিত হইয়া উঠে। এই জন্য হিন্দু নরপতির লোকক্ষয় হইতেছে না। অনন্তর তিনি গোরক্তে উক্ত পুষ্করিণী অপবিত্র করিয়া তাহার মাহাত্ম্য নষ্ট করেন। ইহার পরেই হিন্দুগণ পরাজিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে দিল্লী হইতে আগত সেনাপতির......মৃত্যু হয়। তাহার কবর এখনও পুণ্যভূমি ত্রিবেণী বহন করিতেছে। যুদ্ধজয়ের পর মুসলমানগণ এই মন্দির নির্ম্মাণ করে, ইহা একপ্রকার জয়চিহ্ন।

এই মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত গোলাকার পদার্থ, দেখিতে কুতবমিনারের ন্যায়। ইহা পাঁচতলা, প্রত্যেকতলা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে। স্তম্ভ-টির ভূতলস্থ ব্যাস ৬০ ফিট এবং পঞ্চমতলার ব্যাস ১৫ ফিটে পরিণত হই-য়াছে। দ্বিতল হইতে প্রত্যেক তলায় সরু বারাণ্ডা এবং বারাণ্ডায় যাইবার জন্য একটি দ্বার আছে। উপরে উঠিবার জন্য ঘুরান সিঁড়ী। সর্ব্বসমেত ১৬১টা সিঁড়ি। Cunningham বলেন "ইহার উচ্চতা ১৩৬ ফিট্।" তাহার হিসাব এই :—

পঞ্চমতল— ২৮ ফিট্	প্রথমতল— ২৫ ফিট্
চতুর্থতল— ১৮ ফিট্	চূড়ার উচ্চতা—৯ ফিট্
তৃতীয়তল—৩১ ফিট্	
দ্বিতীয়তল— ২৫ ফিট্	মোট ১৩৬ ফিট্

ভূমিকম্পে মন্দিরটী নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়াতে সরকার বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া জীর্ণসংস্কার করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। মন্দিরের সম্মুখে হিন্দুদিগের এক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান। ইহাই বাইশ দরজা মন্দির নামে বিখ্যাত। মন্দিরের গাত্র হইতে স্খলিত ইষ্টকস্তূপ সজ্জিতাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে দৈর্ঘ্যে ২২টী চূড়া এবং প্রস্থে ৩টী। দক্ষিণ কোণে একটি বেদীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; মধ্যস্থলে এক কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত বিগ্রহের আসনের ন্যায় শূন্য আসন পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হয়, মুসলমানের অত্যাচারে মন্দিরের বিগ্রহ চূর্ণীকৃত ও মন্দির দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। মন্দিরটী ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। মন্দিরের গাত্রে ইষ্টকে অঙ্কিত কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, মন্দিরের সামান্য মূল্যবান্ প্রস্তরও গ্রথিত ছিল, কিন্তু লোকে সে সমুদয় উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তি আজ যে কলঙ্কে ক্লিষ্ট হইয়া ভূগর্ভে মুখ লুকাই-বার জন্য ব্যাকুল! তাহার চতুর্দ্দিকে কি এক গভীর নীরবতা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাহয়াছে! সে নীরবতা কি প্রাণস্পর্শিনী। এই ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন কীর্ত্তির কি এক নিরাশাব্যঞ্জক মলিন ভাব!

ইহার অনতিদূরে হিন্দুর অপর দুইটী দেবালয়। একটি ছোট, একটি বড়। ইহার মধ্যে ছোটটীতে পীরের কবর দেওয়া হইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বারদেশে এক ভগ্ন হিন্দুপ্রতিমা দৃষ্ট হয়। ইহার কেবল জানু-দ্বয় অবশিষ্ট আছে; সুতরাং কিসের প্রতিমূর্ত্তি বলা দুষ্কর। এই ভগ্ন-

প্রতিমা দৈর্ঘ্যে এক ফুট নয় ইঞ্চি। ইহার গাত্রের পশ্চাদ্ভাগে পার্শী ভাষায় কি লিখিত আছে। মন্দিরের তিনটী দ্বার। দ্বারের উচ্চতা চারি ফিট নয় ইঞ্চ। মন্দিরের উপরে তাড়িতবাহকের ন্যায় এক লৌহদণ্ড দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহাকে পীর সাহেবের আশা শোঁটা কহে। কথিত আছে, তিনি ইহা লইয়া সর্ব্বদা বেড়াইতেন। গত ভূমিকম্পে ইহা ভূতলশায়ী হইয়া পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। কথিত আছে, এই সব মন্দির ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়।

ইহার পার্শ্বে এক পুষ্করিণী, নাম রজা পুকুর। প্রবাদ আছে যে, লোকে মানত করিয়া উহায় সিন্নি ভাসাইলে যদি মানত সফল হইবার হয় তবে সিন্নি ফিরিয়া আসে, নচেৎ নহে। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে অনেক ভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

ইহার পশ্চিম পার্শ্বে আধুনিক এক মস্‌জিদ ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে। পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে এক কবর। মুসলমানেরা বলে ইহা মুকদুম নূরশা—পীর সাহেবের সেনাপতির কবর। ইহার পশ্চিমপার্শ্বে আর এক বিরাট ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু-মন্দির। ইহার তিনটী দ্বার। ইহার ভিতরকার পরিসর ১৩ ফিট, ৮টী খিলান এবং সমচতুষ্কোণ।

ইহারাই অতীত পাণ্ডুয়ার সাক্ষ্য। কিন্তু তাহাদেরও সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। এইরূপ এক এক করিয়া ছোট বড় সমুদয় প্রাচীন কীর্ত্তি নষ্ট হইতেছে। এত বড় বঙ্গদেশের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। ইহা দেখিয়া অদৃষ্ট মানির সান্ত্বনা হয়।

মন্দিরের সন্নিকটে এখনও বৎসরান্তে বহুলোকের সমাগম হয়। বৎসরে দুইবার করিয়া এখানে মেলা বসে। বৈশাখ মাসে যে মেলা হয় তাহা বড় মেলা, তাহাতে অনেক বিদেশীয় মুসলমান উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত মাঘ মাসে আর একটী মেলা হইয়া থাকে।

ষ্টেসনের নিকটে উত্তর দক্ষিণে লম্বমান পীর পুকুর নামে এক বৃহৎ

পুষ্করিণী আছে। গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে বহুদূরের লোক এই পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়া জীবন রক্ষা করে। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগে। পুষ্করিণীতে এক বৃহৎ কুমীর বাস করে। তাহাকে ডাকিলে দেখা দেয় ও মুরগি দিলে খাইয়া যায়।

পাণ্ডুয়া বর্ণনা শেষ করিলাম। প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের অভ্যন্তর হইতে সে মহান পবিত্র উজ্জল আলোকচ্ছটা মুহূর্ত্তের জন্য আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহাতে দেখিলাম যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রাচীন, বৃহৎ, উদার, নির্ভীক, যাহার সমাজ বটবৃক্ষের ন্যায় অমর, আজ তাহা আলোক, বায়ু ও সহানুভূতির অভাবে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর যে মঙ্গল তাহার ধেয় ও শ্রেয় তাহা আজ ২০ কোটী ভারতবাসীকে স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে ফললোলুপ কর্ম্মের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া আপনার একাধিপত্যের মধ্যে লীন হইবার জন্য নয় কিন্তু কর্ম্মকে ব্রহ্ম (কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—গীতা) জানিয়া কর্ম্মকে জীবনের ধ্রুব করিয়া বিপুল উৎসাহে ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থাপন করতঃ অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। আজ যেন সেই ধ্বংসস্তূপ আপনার শীর্ণ দেহখানি রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছে ও ভারতবাসীকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত" হে ভারতবাসি মোহনির্ম্মুক্ত হইয়া জাগিয়া উঠ, দেখ সমস্ত জগৎ নূতন আলোকে জাগিয়া উঠিয়া কর্ম্মস্রোতে অঙ্গ ঢালিবার জন্য ভারতের বাতায়নতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তোমরাও ধর্ম্মকে বর্ম্ম করিয়া মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও, কার্য্য মিলিবে, আবার ভারতবর্ষ ধনধান্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আবার আমার ভগ্ন পঞ্জরের মধ্য হইতে মঙ্গল-শিক্ষা-নিঃসৃত আলোকে আমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিব। হায়! বুঝি বা সে মহীয়সী বাণী প্রেতোযোনী সংসারের কোলাহলে অর্দ্ধপথে মিশাইয়া যাইতেছে।

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়,—সাং বৈদ্যবাটী।

ইংরাজের পেরিম অধিকার।

ব্লকম্যান সাহেবের ভূগোলপ্রসাদে আমরা ছেলেবেলা হইতেই "এডেন ইন-আরেবিয়া" "পেরিম-ইন্-রেড-সি" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃটিশ ভূমি-সম্পত্তির সহিত পরিচিত। পেরিম লোহিতসাগরবক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ; কিন্তু দ্বীপটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইতিহাস-পৃষ্ঠায় বহুদিন হইতেই ইহার নামোল্লেখ আছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই ক্ষুদ্র দ্বীপে একটি আলোকমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ক্ষুদ্র এক সৈন্যদল স্থাপন করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে ইহা কোন জাতি কর্ত্তৃকই স্থায়িভাবে অধ্যুষিত বা অধিকৃত হয় নাই। ভারতের অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া যে সমস্ত ইয়ুরোপীয় জাতি বর্ত্তমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে, তন্মধ্যে পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য ব্যপদেশে পূর্ব্বদিকে আইসে। আলবুকার্ক নামক এক পর্ত্তুগীজ জাতীয় একজন নাবিক ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে পেরিমে উপস্থিত হয়েন—তিনি দ্বীপের একটি উচ্চ শৈলশিখরে একটি "ক্রুশ" স্থাপন করিয়া যান। ইহাই পেরিম-বক্ষে মনুষ্যহস্ত-নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রথম চিহ্ন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষসিংহ নেপোলিয়ান যখন মিসরপথে ভারত আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন। তখনই ইংরাজ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" সর্ব্বপ্রথম কিছুদিনের জন্য এই দ্বীপ অধিকার করেন। চতুর ইংরাজ বর্ত্তমানে পৃথিবীর একচতুর্থাংশের অধিস্বামী, কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিতে তাঁহারা যে ছল ও চাতুরীপান প্রকাশ করিয়াছিলেন—বলা বাহুল্য, অতি ক্ষুদ্র পেরিম অধিকার-সময়েও তাঁহারা সেই নীতিরই অনুসরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

লেজ-অব-ইণ্ড ('Lays of Ind) নামক একখানি ইংরাজিগ্রন্থে ইংরাজদিগের এই দ্বীপ স্থায়িভাবে অধিকার করা সম্বন্ধে যে একটি গল্প আছে, ইতিহাসপ্রিয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এস্থলে তাহা প্রকাশ করিলাম।

ফরাশি গভর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে একখানি ফরাশি যুদ্ধজাহাজ এডেন বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাহিরে অন্য কথা প্রকাশ থাকিলেও, পেরিম দ্বীপ অধিকার করিয়া সেখানে ফরাশি পতাকা উত্তোলন করাই এই জাহাজের গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল। এডেন বন্দর তখন হইতেই ইংরাজের অধিকৃত—ফরাশি যুদ্ধজাহাজ বন্দরে পৌছিলে বন্দরের ইংরাজ রেসিডেণ্ট ভদ্রতার অনুরোধেই জাহাজের কর্ম্মচারিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক বৃহৎ ভোজ দিলেন। ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের ভোজে অন্য কোন দ্রব্য হউক বা না হউক, সুরার ব্যবহারটা যথেষ্টই আছে। ইংরাজ রেসিডেণ্টের ভোজেও ইহা পূর্ণমাত্রায়ই চলিয়াছিল। সুরার প্রভাব বড় শক্ত প্রভাব— সুরা নিজে তরল—টলটলে ঢলঢলে; যাহার উদরে যায়, তিনি অতি বড় বাক্‌সংযমী ও রাশ্‌ভারী লোক হইলেও তাঁহাকে সাময়িক তরল সরল করিয়া তাঁহার পেটের কথা টানিয়া বাহির করে। দু চার গ্লাস উদরস্থ করিতে না করিতেই ফরাশিজাহাজের অধ্যক্ষের মন খুলিয়া গেল—তিনি আর কথা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না -গোপনে ইংরাজ রেসিডেণ্টের নিকট স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। ইংরাজ রেসিডেণ্ট মহাশয়ও যে সুরাপানে বিরত ছিলেন তাহা নহে—তবে তিনি ফরাশি পোতাধ্যক্ষের ন্যায় নিজ তাল ভুলিয়া যান নাই। ফরাসী পোতাধ্যক্ষের কথা শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল—সুদূর ফরাশি দেশ হইতে আসিয়া তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে—সমগ্র ইংরাজসমাজের নিকট তিনি দূরদৃষ্টিহীন অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন হইবেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে এ চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইল— তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পেরিম অধিকার করিবার জন্য গোপনে

রণতরি প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ বিনা খরচায় পেরিম অধিকার করিল।

পরদিন দ্বীপের নিকট পৌঁছিয়াই ফরাশি পোতাধ্যক্ষের চক্ষুস্থির হইল; তিনি দেখিলেন, ইংরাজ রেসিডেন্ট তাঁহাকে বড় ঠকানটাই ঠকাইয়াছেন—এবং তাঁহারই নির্ব্বুদ্ধিতার ফলস্বরূপ পেরিম দ্বীপের সর্ব্বোচ্চ শৈলশিখরে বিজয়গৌরব-দৃপ্ত বৃটিশ জাতীয় কেতন বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া আপন কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। ইহাকেই বলে অদৃষ্ট।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

ঐতিহাসিক ভ্রম

দ্বিতীয় বর্ষের ১০ম সংখ্যা "সমালোচনী" পত্রে শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল এম্, আর, এ, এস্ মহোদয়ের লিখিত "জেব উন্নিসা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাতে কতিপয় অনৈতিহাসিক উক্তির অবতারণা আছে। যে সে লোকের লেখনী-মুখ হইতে ঈদৃশী উক্তি বাহির হইলে লোকে তাহা গ্রাহ্যই করিত না—আমরাও সে সম্বন্ধে কিছু বলিতাম না, কিন্তু যে বড়, তাহার দায়িত্বও গুরুতর—ব্রজসুন্দর বাবু একজন প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক, সুতরাং তাঁহার লেখায় কোন ভুলচুক থাকিলে লোকে দু'কথা বলিবেই—আর আমরাও তাঁহাকে সে ভুল দেখাইয়া দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, কারণ তিনি আমাদেরই একজন অগ্রগামী।

জেব উন্নিসা আওরঙ্গজেব বাদশাহের কন্যা। তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া ব্রজসুন্দর বাবু শাহাজান বাদশাহের কন্যা আওরঙ্গজেবের ভগিনী বেগম-সাহেবার চরিত্রের একাংশ তাহার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া এক অদ্ভুত ডালখিচুড়ী পাকাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলেন ;—

"সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পাঁচটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যার মধ্যে জেব উন্নিসাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা"। * * * *

* * * * * *

জেব উন্নিসার অন্য একজন প্রণয়াস্পদ স্ত্রীবেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া প্রাণ হারায়। যে সময়ে প্রণয়ী প্রণয়িনীর সহিত আলাপ করিতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে, স্বয়ং সম্রাট্ সেই সময়

প্রাসাদে ছিলেন। সম্রাট্ নানা কার্য্যে বহুতর গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একজন গুপ্তচর নাগরের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যার গৃহে গমন করেন, কিন্তু কন্যা তৎসংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়া প্রিয়তমকে স্নানের জল রাখিবার বৃহৎ ডেকের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। সম্রাট্ কন্যার চাতুরী ধরিতে পারিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, আমি রাত্রে গরম জলে স্নান করিব। জল শুদ্ধ এই ডেক এখনই আমার সাক্ষাতে উননের উপর চাপাও। সম্রাটের আজ্ঞা তখনই পালিত হইল—হতভাগ্য প্রেমিক যুবক জীয়ন্তে দগ্ধ হইল। ডাঃ বার্নিয়ার এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।”

'সমালোচনী'

২য় বর্ষ, পৃষ্ঠা ৩১০।৩১৪

ব্রজসুন্দর বাবু যদি কাহারও দোহাই না দিয়া শুধু তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতেন, তবে কোন কথাই ছিল না—আমরা মনে করিতাম, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্রজসুন্দর বাবু হয়ত সাধারণের অজানিত কোন অপ্রকাশিত ইতিহাস-সমুদ্র মন্থন করিয়া আওরঙ্গজেব-কন্যা জেব উন্নিসার চরিত্ররত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বার্ণিয়ারের দোহাই দিয়াই যত গোল বাধাইয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ধরা পড়িয়াছেন।

ডাঃ বার্ণিয়ার যাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি আওরঙ্গজেবের কন্যা নন—সাহাজাহানের কন্যা। তাহার নাম জেব উন্নিসা নয়—বেগমসাহেবা। আর এই বেগম সাহেবার কথাও তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও তাঁহার শুনা কথা—স্বচক্ষে দেখা ঘটনা নয়। আবার ডাঃ বার্ণিয়ার শুনিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, ব্রজসুন্দর বাবু তাহার মধ্যেও কতকটা কল্পনার খেলা খেলিয়াছেন।

আমাদের উক্তির সমর্থনার্থ আমরা নিম্নে ডাক্তার বার্ণিয়ারের লিখিত বিবরণ প্রদান করিতেছি,—

"Now 'tis reported, that the princess (Begum Saheba) found means to let a young gallant enter the seraglio, who was of no great quality, but proper, and of good meen. But among such a number of jealous and envious persons she could not carry on her business privily, but she was discovered. Chah-Jehan, her father, was soon advertised of it, and resolved to surprize her under the pretence of giving her a visit, as he wont to do. The princess Seeing him come unexpected, had no more time than to hide her unfortunate lover in one of the great chaudrous made to bath in, which yet could not be so done, but that Chah-Jehan suspected it. Meantime he quarrelled not with his daughter, but entertained her a pretty while, as he was wont to do; and at length told her, that he found her in a careless and less neat posture; that it was convenient that she should wash herself and bath oftener; commanding presently, with somewhat a stern countenance, that forth with a fire should be made under that chaudrou, and he would not part thence, before the eunuchs had brought him word that, that unhappy man was dispatched."

Bernier's Travels in Hindustan
Page 10 and 11.
(Bangabasi edition).

ব্রজসুন্দর বাবু ও ডাঃ বার্ণিয়ার-প্রদত্ত, বিবরণ মিলাইয়া দেখিলেই পাঠকবর্গ আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

ইতিহাস বাস্তবঘটনা লইয়া লিখিত—তাহাতে কল্পনা বা অনুমান্ স্থান পায় না। লেখক ছোটই হউন, আর বড়ই হউন, ইতিহাসের কিছু লিখিতে হইলে তাঁহাকে নিজেরই নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া তবে তাহা লিখিতে হয়। ব্রজসুন্দর বাবু ইহা না জানেন বা না বুঝেন এমন নয়—তবে জানিয়া শুনিয়া নিজে না দেখিয়া না পড়িয়া কেন তিনি এমন ভুল করিয়া বসিলেন? তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

'গল্প-গুচ্ছ'।

—:•:—

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক সন্দর্ভ)

১

বিধি নির্ব্বন্ধ।

পুরীর একজন নৃপতি কাঞ্চীপুরের রাজতনয়ার অসামান্য সৌন্দর্য্যে কথা শুনিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কিন্তু পুরীর রাজবং কাঞ্চীপুর রাজবংশ হইতে গৌরবে হীন ছিল বলিয়া রাজকুমারী বিদ্রূপ গর্ব্বের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ সংবাদ রাজার কাে পৌঁছিল। তিনি রাজকুমারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার মানসে অসংখ সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাঞ্চী রাজকে সমরে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারীকে বন্দী করিয়া লইয় আসেন। সচিবের গৃহে রাজকুমারীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাঁহা গর্ব্বিত ও উন্নতশির ধূল্যবলুণ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাকে ঝাড়ুদারের সহি বিবাহ দিবার আদেশ দিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ, উদার-হৃদয় সচিব, মনে মনে এক সঙ্কল্প আঁটিয়া রাজার আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

পুরীর রাজা জগন্নাথের সেবাইত। দেবতার নিকট মানবজীবনের লঘুত্ব দেখাইবার জন্য রাজারা আপনাদিগকে জগন্নাথদেবের দাস বলিয় অভিহিত করেন। বৎসরের একদিন পুরীর রাজা অতি সামান্য দীনহীন-বেশে সম্মার্জ্জনী-হস্তে মন্দির সংস্কারের জন্য জগন্নাথের নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের শৌর্য্য আছে, তাঁহারা দেবতার নিকট নত হইতে কুণ্ঠিত হয়েন না। বৎসরের সেই দিন আসিল, রাজা দীনহীনবেশে সম্মার্জ্জনী-হস্তে মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধ সচিব দেখিলেন এই উপযুক্ত সময়, তিনি রাজকুমারীকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন। সচিব বলিলেন "মহারাজ! ইনি কাঞ্চীপুরের রাজকুমারী, আপনি ইহাকে ঝাড়ুদারের সহিত পরিণীতা করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন; এত দিন ইহার উপযুক্ত ঝাড়ুদার পাই নাই, তাই আপনার আদেশ পালনে বিলম্ব হইয়াছে; আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনিই আজ সর্ব্বাংশে ইহার উপযুক্ত ঝাড়ুদার, এই কন্যাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি এ দায় হইতে উদ্ধার হইলাম। প্রভুর আদেশ সেবকের সর্ব্বথা পালনীয়।"

মন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তা দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া রাজকুমারীকে গ্রহণ করিলেন।

২

মাতৃগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্য।

মাতৃগুপ্ত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ ছিলেন। বিক্রমাদিত্য ইহাকে যার পর নাই ভালবাসিতেন। বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহেই তিনি কাশ্মীরের রাজসিংহাসন লাভ করেন। যতদিন বিক্রমাদিত্য জীবিত ছিলেন, ততদিন মাতৃগুপ্ত আহ্লাদসহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কাশ্মীরের সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর ত্যাগ করিতেছেন শুনিয়া কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব রাজার পুত্র 'প্রবরসেন' তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কাশ্মীরত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতৃগুপ্ত বলিলেন, 'রাজন্! যিনি আমাকে রাজা করিয়াছিলেন, সেই পরমধার্ম্মিক রাজসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। আমি সূর্য্যকান্ত মণির তুল্য, যতদিন সূর্য্য আমার উপর কিরণ বিতরণ করিতেছিলেন,

ততদিন আমি উজ্জ্বল ছিলাম। সূর্য্য অস্তে গিয়াছেন, এখন আমি সামান্য প্রস্তর হইয়া পড়িয়াছি।' প্রবর সেন বলিলেন, 'পণ্ডিতবর! কে আপনার অনিষ্ট করিয়াছে যে, আপনি নিজে তাহার প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া 'বিক্রমাদিত্যের' জন্য শোক করিতেছেন?' মাতৃগুপ্ত বলিলেন, "রাজন্। আপনি এরূপ মনে করিবেন না যে, বিক্রমাদিত্য ভস্মে ঘৃত বা উষর ভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কেহ আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিলে আমি স্বয়ং তাহার প্রতীকার করিতে পারিতাম। চন্দ্র সূর্য্য অস্তগত হইলে চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্তমণি মলিন হয়; জড়পদার্থও উপকার বিস্মৃত হয় না। আমি কিরূপে বিক্রমাদিত্যের গুণগ্রাম বিস্মৃত হইব? আমি বিক্রমাদিত্যের শোকে রাজ্য ত্যাগ করিতেছি। বারাণসীতে গমন করিয়া শেষ জীবন ধর্ম্ম-চর্চ্চায় অতিবাহিত করিব।" প্রবর সেন মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "ধন্য বিক্রমাদিত্য! যিনি আপনার ন্যায় রত্ন চিনিতে পারিয়াছিলেন।" প্রবর সেন মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর ত্যাগ না করিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না। মাতৃগুপ্ত বলিলেন, "রাজন্! আমি সুখভোগের জন্য আর রাজত্ব করিতে চাহি না, আপনার পৈতৃক রাজ্য আপনিই গ্রহণ করুন। আমি পার্থিব সুখের জন্য রাজ্য পরিত্যাগ না করিলে, বিক্রমাদিত্যের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে না।"

৩

বাবর ও হুমায়ুন।

ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি বীরকেশরী বাবরের পুত্র হুমায়ুন ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হন। তিনি ভারত সম্রাটের পুত্র, সুতরাং তাঁহার চিকিৎসার কোন ক্রটী হইতেছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয় চিকিৎসকগণ প্রাণ-

পণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে নিরাময় করিতে পারিলেন না। তাঁহার আরোগ্যকামনায় সম্রাট্ বহু সাধুফকির এবং মোল্লা দ্বারা নানারূপ দৈব অনুষ্ঠান করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; হুমায়ুনের রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় বাবর অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন যে, ঈশ্বরের নিকট কোন মহান্ উৎসর্গ ব্যতীত হুমায়ুনের এ যাত্রা রক্ষা পাওয়ার আশা নাই। একথা বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি জীবনাধিক পুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দরবারের আমীর ওমরাহ সাধু মৌলবিগণ তাঁহাকে এ সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে রাজকোষে সঞ্চিত ধনরাশি মূল্যবান মণিমাণিক্যাদি সমস্ত উৎসর্গ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন, কিন্তু বাবর কাহারও কথা শুনিলেন না কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার পুত্রের সঙ্গে কি কোন রত্নের তুলনা হইতে পারে ?" ইহা বলিয়াই তিনি দ্রুত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পুত্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তকের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাহার পর রুগ্ন পুত্রের চতুর্দ্দিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর ! ইহাকে রক্ষা কর। ইহার সমস্ত ব্যাধি আমার উপর পতিত হউক।" বাস্তবিক হইল তাহাই। পুত্রস্নেহকাতর বাবরের ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবানের কর্ণে পৌঁছিল। ইহার পর হুমায়ুন সুস্থ হইলেন, কিন্তু বাবর ক্রমশঃ অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে সেই রোগেই অদ্ভুতকর্ম্মা বাবরশাহ অমরকীর্ত্তি রাখিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে বাবর যে অলৌকিক কার্য্যসাধন করিয়া গিয়াছেন, মানবের চক্ষে বাস্তবিক তাহা একটি জ্বলন্ত প্রহেলিকা।

শেরশাহের শাসনপ্রণালী।

শেরশাহ কি প্রণালীতে দস্যু, তস্কর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এ স্থলে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শেরশাহ যে সময় থানেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার শিবির হইতে একটা অশ্ব অপহৃত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি শিবির হইতে বৃত্তাকার পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যত জমীদার ছিলেন, তাঁহাদিগকে অপহৃত অশ্বের জন্য দায়ী করিয়া চোরকে তিনদিনের মধ্যে হাজির করিতে না পারিলে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করেন। শেরশাহের এ মুষ্টিযোগ প্রয়োগে ফল হইল—জমীদারগণ মান, সম্ভ্রম, ধনপ্রাণের আশঙ্কায় প্রকৃত চোর ধরিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদেরই চেষ্টায় বাস্তবিকই তিনদিনের মধ্যে অশ্বসহ চোর ধৃত হইয়া শেরশাহ সমীপে আনিত হইল। শেরশাহ চোরকে উপযুক্ত শাস্তি দিলেন। জমীদারগণ প্রাণদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া শেরশাহকে যথাযোগ্য অভিনন্দন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এটোয়ার নিকটবর্ত্তী ময়দানে একদা একজন মনুষ্যের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। এই ময়দানের স্বত্ব লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। কোন্ গ্রামের লোক হত্যা করিয়াছে, তাহার নির্ণয় করিতে না পারিয়া সম্রাট ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষ ছেদন করিতে আদেশ দেন। কোনও ব্যক্তি এই কার্য্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে তাহাকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিবার আদেশ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একজন লোক বৃক্ষছেদন করিতে নিষেধ করিলে তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি ধৃত ব্যক্তিকে বলেন, "তুমি গ্রাম হইতে এতদূরে একটা বৃক্ষ ছেদনের বিষয় জানিতে পারিলে, অথচ

সেই স্থানে সংঘটিত নরহত্যার ন্যায় একটি গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পার নাই। এ কিরূপ? তিনদিনের মধ্যে হত্যাকারী ধৃত না হইলে তোমাদের সমস্ত গ্রামবাসীর প্রাণদণ্ড হইবে। এই অপরাধীও ধৃত ও উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

৫

সুলতান মামুদ ও জনৈক বৃদ্ধা।

গজনবী সুলতান মামুদের রাজত্বকালে তাঁহার শাসনাধীন ইরাক্ প্রদেশের মরুভূমিতে জনৈক বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র দস্যুহস্তে নিপতিত ও নিহত হয়। পুত্রবিয়োগদুঃখকাতরা উপায়হীনা বৃদ্ধা প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া সুলতানের নিকট অভিযোগ করেন। বৃদ্ধার অভিযোগ শুনিয়া মামুদ উত্তর করিলেন, "ঘটনাটি অবশ্য অনেক দুঃখজনক, কিন্তু ইরাক্ প্রদেশ আমার রাজধানী হইতে বহু দূরে অবস্থিত; সুতরাং এ স্থান হইতে অত দূরের অত্যাচার নিবারণ করা সহজ সাধ্য নহে।" তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া উঠিল, "সুলতান! দূরে অবস্থিত বলিয়া ইরাক্ প্রদেশের অত্যাচার নিবারণ যদি আপনার পক্ষে কঠিন বলিয়াই মনে হয়, তবে যে পরিমাণের রাজ্য আপনি সুশাসনে রাখিতে পারেন, তদতিরিক্ত রাজ্য অধিকার করা আপনার কদাচ উচিত নয়। রাজ্য জয় করিয়া তাহা শাসন করিতে অবহেলা করিলে তাহাতে যে শুধু প্রজাসাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হইবে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অন্তে নিরয়গামী হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" বৃদ্ধার রূঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়া সুলতানের দরবারস্থ আমীর ওমরাহগণ অনিশ্চিত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন. কিন্তু স্বয়ং সুলতান ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং তিনি বৃদ্ধার 'সত্য অপ্রিয়' কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন

এবং তাহাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করতঃ বহু পুরস্কার দিয়া ইরাক্ প্রদেশে সুশাসন করিবার জন্য তথায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

৬

রাজা বীলনদেব ও ব্যাস জ্যোতিষী।

যখন রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশধরগণ উজ্জয়িনী হইতে দিল্লীর শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন বীলনদেব নামক একজন ধনশালী রাজদূত দিল্লীতে বাস করিতেন। বীলনদেবের পুরোহিত-পুত্র ব্যাস বারাণসী হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া আসিয়াছিলেন। একদিন ব্যাস জ্যোতিষ গণনা করিয়া দেখিলেন যে একটি নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যে কেহ দিল্লীতে একটি স্বর্ণ খুঁটি প্রোথিত করিতে পারিবে তাহার বংশ চিরকাল দিল্লীতে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে সক্ষম হইবে।

ব্যাসদেব একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, মনে মনে রাখিলেন। অবশেষে সেই শুভদিন আসিল—ব্যাস বীলনকে একান্তে লইয়া গিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বীলনদেব! বিক্রমাদিত্যের দিল্লী অধিকারকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত দিল্লী প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তুমি যদি আমার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে পার, তবে তুমি বংশপরম্পরায় এই দিল্লী নগরীতে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে সক্ষম হইবে।" বীলনদেব ব্যাসের কথানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইলে ব্যাস বলিলেন, "তুমি সাত তোলা স্বর্ণ লইয়া আটাশ অঙ্গুলি পরিমিত একটি খুঁটি প্রস্তুত করতঃ অদ্য রাত্রিকালে শুভ মুহূর্ত্তে দিল্লীর এই জনশূন্য প্রান্তরে প্রোথিত কর; তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" বীলনদেব স্বর্ণ খুঁটি প্রস্তুত করিয়া ৭৯২ সংবতে বৈশাখ মাসের প্রথম ত্রয়োদশী তিথিতে অখণ্ড নক্ষত্র-যোগে যথাবিধি এই খুঁটি দিল্লীর বিশাল প্রান্তরে প্রোথিত করিলেন

খুঁটি প্রোথিত হইলে ব্যাস বীলনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এই খুঁটি বাসুকির মস্তকে প্রোথিত হইয়াছে। তুমি নিশ্চয়ই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে এবং তোমার বংশে কখনও অনিষ্ট হইবে না।" ইহা বলিয়া ব্যাসদেব স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ব্যাস চলিয়া গেলে বীলনদেব মনে মনে ভাবিলেন,—"ব্যাস একি বলিয়া গেলেন? সহস্র সহস্র হাত খনন করিলে যে বাসুকির সন্ধান পাওয়া যায় না, সামান্য আঠাশ অঙ্গুলি নীচে সেই বাসুকি কেমন করিয়া আসিবে বুঝিতে পারি না।" তিনি তাহার এ সন্দেহের কথা বন্ধুবান্ধবগণের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বলিলেন, বাস্তবিক ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনি খুঁটি তুলিয়া দেখুন, যদি উহাতে রক্তের চিহ্ন থাকে, তবে ব্যাসের কথাই ঠিক, আর খুঁটিতে রক্তের চিহ্ন না থাকিলে ব্যাস নিতান্তই মিথ্যাবাদী।'

বন্ধুবান্ধবের কথায় বীলনদেব খুঁটি তুলিতে আজ্ঞা দিলেন। খুঁটি তুলা হইল—আর সকলে বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রে দেখিতে লাগিলেন, 'খুঁটির অগ্রভাগ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে। ব্যাপার দেখিয়া বীলনদেব ভীতচিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ব্যাসদেবের নিকট সংবাদ গেল। তিনি ত্রস্তপাদক্ষেপে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বীলনদেব! তুমি কি করিলে? কেন তুমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিলে? যাহা হউক, আর ভাবিয়া উপায় নাই; তুমি আবার খুঁটি প্রোথিত কর।"

আবার খুঁটি প্রোথিত হইল কিন্তু এবার উনিশ অঙ্গুলির বেশী প্রবেশ করিল না। অবস্থা দেখিয়া ব্যাস বীলনকে বলিলেন, 'আমি মিথ্যাকথা বলি নাই—আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখিয়াই তোমায় সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু মূর্খ তুমি, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সমস্তই নষ্ট করিতে বলিয়াছিলে, এবার খুঁটি উনিশ অঙ্গুলি প্রোথিত

হইয়াছে অতএব তোমার বংশ উনিশ পুরুষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করিতে পারিবে। প্রথমবারে খুঁটি না উঠাইলে চিরকালই তোমার ভবিষ্য বংশীয়-গণ দিল্লীর রাজতক্তে সমাসীন থাকিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না—বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।'

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

আত্মোৎসর্গ।

ইতিহাসের অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বিজিতগণ বিজিত বা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া যে অমরত্ব লাভ করেন, বিজেতাগণ বিজয়লাভ করিয়াও সে অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন না। রাজস্থানের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। রাজপুত সমরে যিনিই জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্টেই ঐরূপ ঘটিয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ আলাউদ্দিন, বুদ্ধিমান আকবর প্রভৃতি সকলের ভাগ্যেই ঐরূপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আলাউদ্দিন বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক আকবর তাহা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি রাজধানী দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহদ্বারের উপর জয়মল্ল এবং পুত্তের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া লোকসমক্ষে তাঁহাদের মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি গোরা বাদল কিংবা জয়মল্ল পুত্তের বিষয় কিছু উল্লেখ করিব না। তাঁহাদের পুণ্যকাহিনা ইতিপূর্ব্বে অনেক লেখকের লেখনী পুণ্যময়ী করিয়াছেন। সুতরাং আমার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তবে, স্বদেশরক্ষার জন্য রাজপুত বীরের ন্যায় রাজপুতরমণীও যে রণযজ্ঞে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে পারে এ প্রবন্ধে পাঠকবর্গকে শুধু তাহাই দেখাইব।

রাজস্থান-জয়েচ্ছু মোগল-সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইল, চিতোরের তাৎকালিক রাণা উদয় সিংহ, শত্রুভয়ে ভীত হইয়াই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হইক, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আরাবলী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত-গৌরব-রবি অস্তমিত হইলেন না। তিনি তাঁহার জ্বালাময় মরীচিমালা অপ্রতিহত প্রভাবেই তাঁহাদের মস্তকোপরি ঢালিতে লাগিলেন। চন্দাওৎশ্রেষ্ঠ সহিদাস, রাঠোরশ্রেষ্ঠ জয়মল্ল, জগাত্তৎশ্রেষ্ঠ পুত্ত, কোটারিত অধিপতি, বৈদ্লাধিপতি, প্রমারপতি, ঝালাপতি প্রভৃতি সকলেই আকবর-কবল হইতে চিতোর উদ্ধারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। মোগল রাজপুতে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সূর্য্যদ্বারে সহিদাস অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সমরশায়ী হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্তের উপর সেনাপত্যের ভার অর্পিত হইল। পুত্ত তখন ষোল বৎসরের বালক মাত্র। তাঁহার পিতা ইতি-পূর্ব্বে মোগল-সমরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জননী একমাত্র তাঁহার লালনপালনের জন্য পতির অনুগমন না করিয়া জীবন ধারণ করিয়া রহিলেন। কিন্তু এক্ষণে চিতোরের সমূহ বিপদ দেখিয়া সেই বিধবা রমণী বংশের সর্ব্বস্বধন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র পুত্তকে চিতোরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আদেশ করিলেন। মাতার পুত্র বিদায় হইলেন। মাতা কিন্তু পুত্রকে বিদায় দিয়া নিবৃত্ত হইলেন না। বসন্ত প্রারম্ভে অবিকসিত মল্লিকাবৎ অস্ফুট-যৌবনা পুত্রবধূকে স্বহস্তে রণবেশে সাজাই-লেন। ব্রীড়াসঙ্কুচিতা, সরলা বালিকা কটিদেশে তরবারি এবং হস্তে বর্ষা ধারণ করিয়া তেজস্বিনী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

অবশেষে উভয়ে পর্ব্বতাবতরণ করিয়া সেই তলহীন, কুলহীন, উন্মত্ত সমর সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিলেন। অবিচলিতচিত্তে পুত্ত স্বীয় মাতা এবং বণিতার মৃত্যু নিরীক্ষণ করিলেন।

শ্রীবনওয়ারীলাল বসু।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের * সামগ্রী

[পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ ওঝা কাশী হইতে প্রকাশিত নাগরী প্রচারিণী পত্রিকায় হিন্দী ভাষায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকবর্গেরও জানিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় ইহাতে আছে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস বি, এ, মহাশয়ের অনুমতিক্রমে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।]

ইহা বলা অনুচিত হইবে না যে, ভারতবর্ষের শৃঙ্খলাবদ্ধ লিখিত প্রাচীন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত, তাহার জন্য সামগ্রী একত্রিত করিবার উদ্‌যোগও যে হইয়াছিল, এরূপও অবগত হওয়া যায় না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর উইলিয়ম জোন্সের যত্নে এসিয়া খণ্ডের ইতিহাস, সাহিত্যাদি বিষয়ের শুদ্ধিসাধন জন্য 'এসিয়াটিক সোসাটি' নাম্নী সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই হইতে এখানকার প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধান এবং উহার সংগ্রহ কার্য্য আরব্ধ হইল। অনেক বিদ্বানের শ্রম ও গভর্ণমেণ্টের উদার সহায়তায় আজ পর্য্যন্ত অনেক সামগ্রী উপলব্ধ হইয়াছে। তাহারা কি প্রকারের এবং প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে কতটা উপযোগী হইতে পারে—এই প্রবন্ধে তাহাই বলিবার প্রযত্ন করা হইতেছে।

* 'প্রাচীন ইতিহাস' শব্দে প্রবন্ধকারের অভিপ্রায়—বহু প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদিগের হস্তে হিন্দুরাজ্য সমূহের অস্ত যাওয়া, অথবা তাহাদিগের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হওয়ার সময় পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে।

আমরা উক্ত সামগ্রী গুলিকে নিম্নের প্রধান চারিটি বিভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

(ক) আমাদের এখানকার প্রাচীন পুঁথি।

(খ) য়ুরোপ, চীন, তিব্বত ও সিংহলের লোকের এবং মুসলমান-দিগের লিখিত প্রাচীন পুস্তক সমূহ।

(গ) প্রাচীন শীলালেখ ও তাম্রশাসন।

(ঘ) প্রাচীন মুদ্রা, সিক্কা ও শিল্প।

ক। আমাদের এখানকার প্রাচীন পুঁথি।

(অ) পুরাণ—যে প্রাচীন রাজাদিগের নাম অদ্য পর্য্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীন শীলালেখ, তাম্রানুশাসন, সিক্কা অথবা বিদেশীয়দিগের লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কত পুরাণে তাঁহাদিগের শৃঙ্খলাবদ্ধ বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আমাদের এখানকার বিশেষ প্রাচীন ইতিহাসের জন্য কেবল পুরাণই সহায়ক হইবার যোগ্য। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত—ইতিহাসের পক্ষে এই পাঁচখানি বিশেষ উপযোগী। কারণ ইহাতে সূর্য্য, চন্দ্র, যাদব, শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য, সুঙ্গ, কাণ্ব, এবং আন্ধ্র ভৃত্যবংশের নরপতিগণের শৃঙ্খলাবদ্ধ বংশাবলী এবং কাহার কাহারও কিছু চরিত্র বিবরণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য সুঙ্গ, কাণ্ব এবং আন্ধ্র ভৃত্যবংশের রাজা-দিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই রাজত্বকাল এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রাজ্যকারক প্রতাপী গুপ্তবংশ * পর্য্যন্ত রাজবংশের সন্ধানও ইহা হইতেই

* ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে মুদ্রিত ভবিষ্য মহাপুরাণের প্রতি সর্গপর্ব্বে, কলিকাতায় ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থাপিত হওয়া এবং অষ্ট কৌশল্যা (পার্লামেণ্ট) দ্বারা রাজ্যশাসিত হওয়ার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে, ঐ সমগ্র পর্ব্বটিই অল্প সময় মধ্যে রচিত বলিয়া প্রতীত হয়। উহার রচয়িতা

৮ পাওয়া যায় ; কিন্তু বিশেষ ত্রুটির মধ্যে এই যে, কোন সাল বা সংবৎ ইহাতে দেওয়া নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজ্যশাসক কয়েকটি সমকালীন রাজবংশ পারম্পর্য্যরূপে পর পর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পুরাণোল্লিখিত সমস্ত রাজাদিগের রাজ্যসময় যথার্থরূপে নির্দ্ধারিত করা অসাধ্য। এই সমস্ত পুরাণ কতবার মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু উত্তমরূপে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা অল্প। এই জন্য 'হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সীরীজে' মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থের রীতিতে ইহাদিগের সম্পাদন হওয়া ইতিহাসের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

(আ) রামায়ণ ও মহাভারত—ইহাতে রঘু এবং কুরুবংশের বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে পাওয়া যায়—যাহা উপরিলিখিত পুরাণসমূহে সংক্ষিপ্তাকারে গ্রথিত রহিয়াছে। ইহাদের লিখিবার সময়ে দেশের অবস্থা, মনুষ্যের সাধারণ স্থিতি, যুদ্ধপ্রণালী প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুসন্ধান ইহাদের দ্বারা সুন্দররূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের মুদ্রণ কয়েকবার হইয়া গিয়াছে।

(ই) রাজতরঙ্গিনী—যথার্থ ঐতিহাসিক প্রণালীতে লিখিত। এই একমাত্র গ্রন্থই আমাদিগের এখানে বিদ্যমান,—ইহাতে কাশ্মীরের ইতিহাস আছে। ইহার প্রথম খণ্ড অমাত্য চম্পকের পুত্র কহ্লণ পণ্ডিত-কর্ত্তৃক ১১৪৮ খ্রীঃ অঃ রচিত। ইহাতে প্রথম গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সুস্সলের পুত্র জয়সিংহ পর্য্যন্তের বৃত্তান্ত আছে। ইতিহাসের পক্ষে এই পুস্তকখানি বড়ই উপযোগী। কহ্লণ তথাকার প্রথম রাজা গোনন্দের ভারতযুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ কলিযুগাব্দ ৬৫৩ (২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ) বিদ্যমান থাকা মানিয়া লইয়াছেন (যাহা বাস্তবিক ঐ সময় হইতে অনেক

উপরি কথিত পুরাণসমূহ হইতে যে বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও স্বপক্ষ হইতে বাড়াইয়া কমাইয়া অবিশ্বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন। অতএব প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে ঐ সর্গ সম্পূর্ণ উপযোগ হীন।

পশ্চাতে সংঘটিত হয়), সুতরাং সময় পূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে (কহ্লণকে) কত রাজার রাজত্বকাল মনগড়া করিয়া অধিক ধরিতে হইয়াছে,—এমনকি তিনি রণাদিত্যের (তৃতীয় তুঞ্জীনের) ৩০০ বৎসর রাজ্যশাসন লিখিয়া গিয়াছেন। কহ্লণের রচনানুসারে মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোকের সময় উঁহার বাস্তব সময়ের প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে এবং হূণ মিহিরকুলের সময় ১১০০ বৎসরের পূর্ব্বে মানিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তিনি যে ককোটিক বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের রাজত্বকাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশবাসীর অপেক্ষা কাশ্মীরবাসীদিগের ইতিহাস-প্রেম বিশেষরূপেই বর্ত্তমান ছিল; এই জন্যই তাঁহারা স্বদেশের শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছেন। ১১৪১ খ্রীঃ অঃ জোনরাজ নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক রাজতরঙ্গিনীর দ্বিতীয় ভাগ রচিত হয়। ইহাতে তিনি যেখান হইতে কহ্লণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ সময় পর্য্যন্তের ইতিহাস দিয়াছেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডে জয়সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটারাণী পর্য্যন্ত যাহার সহিত কাশ্মীরের হিন্দুরাজ্যের সমাপ্তি হয়—রাজ্যকর্ত্তা ও তৎপরবর্ত্তী মুসলমানদিগের বৃত্তান্ত আছে। জোনরাজের পর তাঁহার শিষ্য শ্রীবর পণ্ডিত ১৪৭৭ খ্রীঃ অঃ রাজতরঙ্গিনীর তৃতীয় খণ্ড রচনা করেন। তদনন্তর প্রাজ্যভট্ট চতুর্থ খণ্ড রচনা করিয়া আকবরের কাশ্মীর বিজয় সময় পর্য্যন্তের বৃত্তান্ত পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। রাজতরঙ্গিনীর এই চারিখণ্ড প্রথম কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৮৯২ খ্রীঃ অঃ ডাক্তার ষ্টীন (M. A. Steen P.H.D.) কহ্লণ-রচিত প্রথম খণ্ড অতি শুদ্ধতা সহকারে বোম্বাইয়ে মুদ্রিত করেন। অনন্তর জয়পুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও তাহার পরলোক গমনের পর প্রফেসর পীটর্সন এই চারিখণ্ড বোম্বাইয়ের সংস্কৃত সীরীজে প্রকাশিত করিয়াছেন।

(ই) ঐতিহাসিক কাব্যাদি—পুরাণসমূহে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর সমীপপর্য্যন্ত রাজ্যশাসক রাজবংশসমূহের বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্তের রাজগণের কোনই লিখিত ইতিহাস আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। অনন্তর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ও তাহার পর সময়ে সময়ে কতই ঐতিহাসিক কাব্য, নাটক, চরিতাদি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, যে সকল হইতেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এইরূপ পুস্তক সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ :—

(১) হর্ষচরিত—ইহা একখানি গদ্যকাব্য। ইহা কনৌজ ও থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ বৈশ্যবংশীয় রাজা হর্ষ—হর্ষবর্দ্ধনের আশ্রিত প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ বাণভট্ট কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে রচিত। ইহাতে উক্ত বংশের রাজা প্রভাকর বর্দ্ধন, তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন এবং কন্যা রাজ্যশ্রীর বৃত্তান্ত আছে। এই পুস্তক মৌখরীবংশীয়দিগের প্রাচীন ইতিহাসেও কতক সহায়তা করে। কারণ অবন্তীবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ এবং তাঁহার (গ্রহবর্ম্মার) নিহত হইবার বৃত্তান্ত এই পুস্তক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাণভট্ট এই পুস্তকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রুতবিষয়ের নহে। ইহাতে হর্ষের জন্মমাস, পক্ষ, নক্ষত্র এবং সময় পর্য্যন্তের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সংবৎ দেন নাই। এই পুস্তক বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সহ বঙ্গভাষারপত্রিকার প্রয়োজনীয়তা।

শতাধিক বর্ষ অতীত হইল বঙ্গদেশে পত্রিকার প্রচার আরব্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সহিত বাঙ্গালা পত্রিকার সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ট; কারণ বাঙ্গালা ভাষার পত্রিকা যে কেবল ভাষার অঙ্গরাগ বর্দ্ধনে সাহায্য করে এমত নহে, পত্রিকাদ্বারা উক্ত ভাষার যথেষ্ট অঙ্গপুষ্টিও সমাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং পত্রিকা ভাষার জননী না হইলেও, পালিকা ও রক্ষিকা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পত্রিকার উৎপত্তিতে বঙ্গভাষা যথেষ্ট লাভবতী হইয়াছে, যেহেতু পত্রিকার সৃষ্টির পূর্ব্বে অস্মদেশে গদ্যময় পুস্তকের নিতান্তই অসদ্ভাব ছিল। সে কালের লোকে গদ্য অপেক্ষা পদ্যেরই বেশী আদর করিত, তজ্জন্য তৎকালীন গ্রন্থকারগণের গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় অত্যধিক আসক্তি দেখা যায়। পদকল্পতরু, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাস মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রভৃতি সমস্তই পদ্যময়। এমন কি তৎকালে যিনি চিঠি পত্রাদিতেও পদ্যরচনার শক্তি প্রদর্শন করিতেন, তিনিও যথেষ্ট খ্যাতিপ্রতিপত্তির অধিকারী হইতেন।

যাহা হউক পত্রিকার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার যে দিন দিন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রাচীনকালের ভাষার সহিত তুলনা করিলে এক্ষণে যদিও বঙ্গ-

ভাষার অনেকটা উৎকর্ষসাধিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তথাপি ইহাও স্বীকার্য্য যে, বঙ্গভাষা প্রণালীবদ্ধ হইতে এখনও বহু পশ্চাতে পতিত রহিয়াছে। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিতে হইলে দেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সমবায়ে সভাসমিতি সংস্থাপন, ভাষার অভিধান প্রস্তুতকরণ এবং সকল সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকায় সবিশেষ আন্দোলনাদির প্রয়োজন।* বাঙ্গালা ভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিতে হইলে বাস্তবিকই ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুকরণ আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বঙ্গবন্ধু, পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় জে, বীম্‌স, সাহেব মহোদয় একদা বঙ্গীয় সাহিত্যের স্থিরতাবিধানজন্য বিশেষ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই মহাত্মার সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রস্তাব অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হওয়া দূরের কথা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার" সহিত সংস্পৃষ্ট কতিপয় নির্দ্দিষ্ট মহাত্মা ব্যতীত এ বিষয়ে আর কাহারও উচ্চবাচ্য নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। মহামতি বীম্‌স্ বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একদা যে একটী অনুষ্ঠানপত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন যে, বীম্‌সের বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে কিরূপ যত্ন, চেষ্টা ও সহৃদয়তা ছিল এবং তিনি বৈদেশিক হইয়াও বঙ্গভাষায় কিরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

(১২৭৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শন দ্রষ্টব্য)

বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে যে উপকরণের প্রয়োজন বহুল প্রচারিত বঙ্গভাষার পত্রিকা তাহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। পত্রিকা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইলেও দেশের লোকের মতপ্রকাশক এবং বহুবিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনার আধার। পত্রিকা যেমন ভাষাচর্চ্চার বিশেষ সহায়তা করে, তদ্রূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক বহুবিষয়ের আন্দোলন দ্বারা সময়ে সময়ে বহুপরিমাণ সুফলও আনয়ন করিয়া

থাকে। এক দেশের আবশ্যকীয় সংবাদ অন্যদেশে অবিলম্বে প্রচারিত করে, প্রজার সুখদুঃখের কথা রাজদ্বারে জ্ঞাপন করে, কোন স্থানের আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া পাঠকের কৌতূহল জন্মাইয়া দেয়। পত্রিকার সাহায্যে মহতের গুণ ও অসাধুর দোষ দেশবিদেশে কীর্ত্তিত হয়। এতদ্ভিন্ন দেশহিতকর, সমাজহিতকর, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ, আশ্চর্য্য ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপদেশ-জনক ও কৌতূহলোদ্দীপক গল্প, মনোরঞ্জন উপন্যাস, প্রাণমনতোষিণী ও রস-ভাবময়ী কবিতা ও নানাপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যনিচয়ের বিজ্ঞাপন প্রভৃতির প্রচার দ্বারা পত্রিকাসমূহ সর্ব্বদাই যে আমাদের দেশের কি উপকার সাধন করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। জে, বীম্‌স্ বলেন,—"যে বাঙ্গালাকে একেবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দসমূহ প্রয়োগপূর্ব্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীলবাচ্য বাক্যসকল সাধুভাষা হইতে বর্জ্জিত করা আবশ্যক।"

বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বঙ্গভাষা প্রচলিত, একই শব্দ স্থানভেদে নূতনরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কথিত ভাষা স্থানভেদে পৃথকাকারে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু পত্রিকার প্রভাবে লিখিত বঙ্গভাষা সর্ব্বত্রই একাকারে বিরাজ করিতেছে, এবং সকল দেশের পাঠকেরাই এখন পত্রিকার অনুকরণে নিজ নিজ লেখনী সঞ্চালনে যত্নবান হইতেছেন।

কমা, অর্দ্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদাদি দ্বারা পাঠকের যেরূপ শীঘ্র অর্থবোধ হয়, ঐ সকল চিহ্নবিহীন একটানা লেখা পড়িলে তাহা কখনই হয় না। বঙ্গভাষায় বহুভাষা প্রবেশ করিলেও সংস্কৃতই যে বঙ্গভাষার প্রসবিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতে দাঁড়ি ভিন্ন কোন চিহ্নই প্রচলিত নাই সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাতে ছন্দে এ সকল অর্থবোধক চিহ্ন প্রচলিত

ছিল না, ইংরাজীর অনুকরণে পত্রিকার কৃপায় ন্যূনাধিক ষাটী বৎসর হইল কমা, সেমিকোলন, ফুলষ্টপ প্রভৃতি অর্থবোধক চিহ্নসমূহ বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

সংবাদ পত্র সভ্য সমাজের একতম অঙ্গ। মনুষ্য যখন অসভ্য ছিল তখন তাহারা নগ্নাবস্থায় কালাতিপাত করিত। পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে বৃক্ষবল্কল পরিধান করিতে আরম্ভ করিল, তৎপর যৎকালে, সভ্যজগতে মানবের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল তখন বস্ত্রই তাহাদের লজ্জা নিবারণের প্রধান সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। জগতে শিক্ষা ও সভ্যতার যতই বিস্তার হইবে ততই মানবের নিত্য নূতন দ্রব্যের অভাব ঘটিবে। আবিষ্কৃত সভ্যসমাজের অঙ্গবিশেষের সহিত ক্রমশঃ তাহাদের পরিচয় হইবে, এবং সেই পরিচয় গাঢ় হইলেই মানব তাহার গুণাগুণ বুঝিতে পারিবে ও তাহার অভাবে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিবে। সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকা যখন অনাবিষ্কৃত অবস্থায় ছিল তখন কে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিত?

পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণেই যে অস্মদ্দেশে সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকার সৃষ্টি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।* সুসভ্য ইংরাজরাজের রাজত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত দিন দিন প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ায় পুস্তক ও পত্রিকা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে একথা অন্ততঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়-সম্মত। পত্রিকা প্রচারিত না হইলে মুদ্রাযন্ত্রের অবশ্য প্রয়োজনীয় একতম অভাব কিছুতেই মোচন হইত না। মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি ও পত্রিকা পুস্তকাদির প্রচারদ্বারা সমাজ বহু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সুতরাং উক্ত বিষয়দ্বয়ের জন্য আমরা চীন ও ইটালির নিকট ঋণী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* মুসলমান রাজত্বকালে যদিও সংবাদ পত্রের নাম শুনা যায় বটে, কিন্তু তৎকালে পত্রিকা মুদ্রিত হইত না, হস্তলিখিত হইয়া (সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ স্থানে) প্রচারিত হইত।

মুদ্রাযন্ত্রের উৎপত্তি আমাদের আলোচ্য না হইলেও জগতে যতপ্রকার শিল্পযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে মুদ্রাযন্ত্রই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী ; সুতরাং শীর্ষস্থানীয় বলিয়া এস্থলে তৎসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

খৃঃ নবম শতাব্দীর শেষ বা দশম শতাব্দীর প্রথমে চীনদেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। তৎকালে কাষ্ঠফলকে খুদিয়া কোন বিষয় মুদ্রাঙ্কিত করা হইত। খৃঃ ১০৪১—১০৪৮ পর্য্যন্ত এই সাত বৎসরের মধ্যে চীনদেশীয় জনৈক কর্ম্মকার দগ্ধমৃত্তিকার অক্ষর প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা মুদ্রাঙ্কন করিতে থাকেন। পরে খৃঃ ১৪৩৬—১৪৩৯ পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরের মধ্যে ট্রাসবার্গ নিবাসী গাটেনবার্গ ও হায়েলেম নিবাসী কোস্‌টর নামক ব্যক্তিদ্বয় অনুরূপ মুদ্রাঙ্কন বিদ্যার আবিষ্কার করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বৃক্ষত্বকে কতকগুলি অক্ষর খুদিয়া কাগজে মুদ্রিত করেন। তিনি মুদ্রাঙ্কনের জন্য এক প্রকার ঘন মসীরও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গাটেনবার্গ ও কোস্‌টর উভয় ব্যক্তিই কাষ্ঠফলকে অক্ষর খুদিয়া মুদ্রাঙ্কনের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছিলেন। পরে পৃথক্ পৃথক্ কাষ্ঠময় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কন কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে শেফর নামক জনৈক শিল্পবিশারদ ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর নির্ম্মাণ করেন। তদবধি মুদ্রাযন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে থাকে।

দীর্ঘকাল যাবৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল পরে ষ্ট্যান হোপ নামক এক শিল্পকুশল বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদ্বারা লৌহময় মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত হইলে মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের সবিশেষ সুবিধা হইয়া আইসে। অদ্যাবধি ঐ যন্ত্র "ষ্ট্যান হোপমুদ্রাযন্ত্র" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর ক্লাইভমর, কগর, কোপ, রঘবেন, প্রভৃতি অনেকেই ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রের অনুকরণে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তৎপর ১৮১৪ খৃঃ অঃ কোনিগ সাহেব বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত

করেন। প্রথম প্রথম তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় ১১ হাজারখানি কাগজের ১ পৃষ্ঠা ছাপা হইত। ক্রমশঃ ঐ যন্ত্রের নির্ম্মাণকৌশল আরও উন্নত হইলে ঘণ্টায় ১৮ শত তা কাগজের ১ পৃষ্ঠা ও অবশেষে কোনিগ সাহেব ১৮১৫ খৃঃ অঃ পূর্ব্বাপেক্ষাও উন্নত প্রণালীর বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। তাহাতে ঘণ্টায় ১ হাজার তা কাগজ ২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইতে থাকে। অতঃপর আপ্লার্থ ও কাউপার নামক বুদ্ধিশালী সুনিপুন শিল্পীদ্বয় একযোগে এক অতি উৎকৃষ্ট বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র (কোনিগের মুদ্রাযন্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট) প্রস্তুত করেন। যাহাতে প্রত্যেক ঘণ্টায় চারি হাজার তা কাগজের ১ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়া থাকে।

মুদ্রাযন্ত্র সভ্যজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলে কয়জন রাশি রাশি সংবাদ বা সাময়িক পত্র বা পুস্তকসমূহের নাম জানিতে পারিত ? তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যে ৬ মাসের কমে যে সংবাদ জনকর্ণ-গোচর হওয়া অসম্ভব, তাহাই এক ঘণ্টার মধ্যে একজনের শ্রুতিগোচর হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জগদ্ব্যাপী নরনারীর গোচরে আসিতেছে তাহার একমাত্র কারণই মুদ্রাযন্ত্র। আমরা যে আজ রাশি রাশি বহুমূল্য শাস্ত্র-গ্রন্থ, মূল্যবান্ উপন্যাসাবলী, দীর্ঘকালব্যাপী :শ্রমলব্ধ ও বহুসংখ্যক অর্থব্যয়ে প্রাপ্ত অভিধানাদি সুলভে বা বিনামূল্যে! লাভ করিতেছি তাহার মূলে মুদ্রাযন্ত্র। মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা আমাদের যে কি উপকার সংসাধিত হইয়াছে তাহা জ্ঞানবান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহার আলোচনা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক।

ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইটালীর অন্তর্গত ভিনিস নামক স্থান হইতে সংবাদপত্রের বীজ রোপিত হয় ও সেই বীজ ক্রমশঃ ইংলণ্ড,স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে উপ্ত হয় এবং অবশেষে কালচক্রে ঘূর্ণিত হইতে হইতে সভ্যজাতির কৃপায় ১৭৮০ খৃঃ অঃ ৩০ শে জানুয়ারী ভারতের

বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতায় আনীত হয়। ইংরাজরাজগণের প্রসাদে আমরা সংবাদপত্ররূপ মহারত্ন লাভ করিয়াছি।

অস্মদ্দেশে এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন খানি প্রত্যহ, কোন কোন খানি ২ দিন অন্তর, কোন খানি বা ৩ দিন অন্তর, কোন খানি বা ৭ দিন অন্তর, আবার কোন কোন খানি পক্ষান্তে, কোন খানি বা মাসান্তে, কোন খানি বা ৩ মাস অন্তর প্রকাশিত হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধেরও পার্থক্য আছে।

অতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রের বহুল প্রকার ছিল না। অধিকাংশ পত্রিকার নামমাত্রই শ্রুতিগোচর হইত, কিন্তু তাহাদের আকৃতি সন্দর্শন সকলের অদৃষ্টে ঘটিত না। ১৩০ খৃঃ অঃ আমাদের বাঙ্গলার শিক্ষাগুরু সুকবি স্বর্গীয় পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকতায় যখন "প্রভাকর" পত্রিকা প্রকাশিত হয়. তখনই সুদুর মফঃস্বলের অধিবাসীরা পর্য্যন্তও সংবাদ পত্রিকার রসাস্বাদনে সমর্থ হয়।

আজকাল বঙ্গদেশ অসংখ্য সংবাদ ও সাময়িক পত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলা দূরের কথা, এমন মহকুমা অতি বিরল, যেখানে একখানি সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হইতেছে না। আবালবৃদ্ধবনিতা আজ সংবাদপত্র পাঠের জন্য লালায়িত। বিদ্যালয়ের বালকবালিকা এখন পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছে। বিদুষী রমণীকুল সংসারকার্য্য সারিয়া সংবাদপত্রপাঠে অবসরকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। স্থবির সম্প্রদায় রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় স্থিরচিত্তে সংবাদপত্র পাঠে নিত্য মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং সংবাদপত্র অস্মদ্দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে সন্দেহ নাই। কোন সময় যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইলে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতারা সংবাদপত্রের দৈনিক সংবাদ অবগত হইবার জন্য কিরূপে

পোষ্টাফিসের পিওনের আগমন প্রতীক্ষা করেন, মফঃস্বলবাসীমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

ইউরোপে সংবাদপত্রের যেরূপ আদর, দেশে যদিও এখনও সেরূপ আদর হয় নাই তথাপি যে একদা সংবাদপত্র ক্রয়ের খরচ সংসারী বাঙ্গালী মাত্রেরই দৈনিক জমাখরচের খাতায় স্থানলাভ করিবে ইহা বোধ হয় নিতান্ত দুরাশার কথা নহে। ইংলণ্ডে সংবাদপত্র প্রচারের যে উদ্দেশ্য অস্মদ্দেশে তাহার বিপরীত। বিলাতে সংবাদ পত্রের কাটতি এত অধিক যে এক একখানি সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীকে লক্ষপতি বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

অস্মদ্দেশে সাপ্তাহিক পত্রিকার পূর্ব্বেই সাময়িক পত্রিকার সৃষ্টি। ১৮১৬ খৃঃ অঃ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক উপযুক্ত পণ্ডিতের সম্পাদকতায় "বেঙ্গল গেজেট" নামক একখানি সচিত্র সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়। ইহাই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম পত্রিকা। তৎপর ১৮১৮ খৃঃ অঃ লর্ড ময়রার শাসনকালে পাদরি মার্সম্যান সাহেব শ্রীরামপুর হইতে "দিগ্দর্শন" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা এক সংখ্যা মাত্র বাহির করেন। তাহাতে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যসম্বন্ধীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ঐ সময় উক্ত পাদরি সাহেব মহোদয় "সমাচারদর্পণ" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রও বাহির করেন। ন্যূনাধিক দ্বাবিংশবর্ষ পরিচালিত হইয়া সে খানি উঠিয়া যায়। ১৮১৯খৃঃ "গস্পেলম্যাগাজিন" নামক একখানি খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত বৎসর তারাচাঁদ ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় "সংবাদকৌমুদী" নামক একখানি সংবাদ পত্রের (সাপ্তাহিক) জন্ম হয়। ১৮২২খৃঃ ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় "সমাচার চন্দ্রিকা" নামে আর একখানি অর্দ্ধসাপ্তাহিক (সপ্তাহে ২ বার) কাগজ বাহির হইতে থাকে। তৎপর কৃষ্ণমোহন দাসের সম্পাদকতায় "তিমিরনাশক"

এবং বহুভাষাবিদ্ স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেওয়ান নীলরতন হালদারের "বঙ্গদূত" বাহির হয়। ১৮৩০ খৃঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকতায় বিখ্যাত "প্রভাকর" পত্রিকার উৎপত্তি হয়। প্রভাকর প্রথমে সাপ্তাহিক পরে সপ্তাহে তিন বার অতঃপর দৈনিক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রভাকর আমাদের দেশের প্রথম দৈনিকপত্রিকা। ১৮৩৯ খৃঃ "সংবাদ-ভাস্কর" ও "রসরাজ" নামক পত্রিকাদ্বয় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত খানি সপ্তাহে দুইবার ও শেষোক্তখানি ৩ বার বাহির হইত। ১৮৩৮ খৃঃ "সংবাদমৃত্যুঞ্জয়ী" নামক অল্পকালস্থায়ী একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পার্ব্বতীচরণ দাসকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকার আদ্যোপান্ত কবিত্বময় হইয়া বাহির হইত।

যথা—চারি ঘোড়ার গাড়ী চোড়ে গতদিন বৈকালে গো।
গিয়াছেন গভর্ণর সাহেব চানকের বাগানে গো॥
"আমাদের পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পংক্তির প্রতি চারি আনা লাগিবে গো॥

ইত্যাদিরূপ কবিতায় সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ীর কলেবর পরিপূর্ণ থাকিত। ১৮৪০ খৃঃ মফঃস্বলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদের বহরমপুর হইতে মহারাজা কৃষ্ণনাথের যত্নে ও ব্যয়ে এবং গুরুদয়াল চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদকতায় "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" বাহির হয়। ১৮৪২ খৃঃ "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরেই অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদকতায় "বিদ্যাদর্শন" নামক একখানি মাসিকপত্রিকা বাহির হয়। তৎপরবৎসর উক্ত মহাত্মার সম্পাদকতায় "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার সৃষ্টি হয়। ১৮৪৬ খৃঃ আণ্ডুলিয়ার রাজনারায়ণ মিত্র "কায়স্থ-কিরণ" ও নন্দকুমার কবিরত্ন "নিত্যধর্ম্মপত্রিকা" নামক মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত করেন। ১৮৫৩ খৃঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় "রসসাগর" সাপ্তাহিক ও কালীকান্ত ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকতায়

"মুক্তাবলী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৫০খৃঃ "সর্ব্বশুভঙ্করী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইতে থাকে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ বঙ্গের প্রধান প্রধান পণ্ডিত তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অচির-কালমধ্যেই তাহার জীবন পর্য্যবসিত হয়। কয়েক বৎসর পরে ঐ পত্রিকা "শুভঙ্করী" নামধারণ করিয়া মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক প্রকা-শিত হয় ও কিছুদিন পরে আবার উঠিয়া যায়। ১৮৫১খৃঃ "বিবিধসংগ্রহ" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রথমে উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি উক্ত পত্রের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে, "ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটী" উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। উহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধ থাকিত। কখন কখন উক্ত পত্রিকা সচিত্র প্রকাশিত হইত। "বিবিধ-সংগ্রহ" "রহস্য-সন্দর্ভ" নামগ্রহণ করিয়া কিছুকাল প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদকতায় ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। ১৮৫৪ খৃঃ প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার দ্বারা "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি পত্রিকা বাহির হয়। ১৮৬০ খৃঃ "পরিদর্শক" প্রকাশিত হয়। পরিদর্শক প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দৈনিক রূপে বাহির হইত। ঐ সময়ে জগন্নাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় "বিজ্ঞানকৌমুদী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন।

এক্ষণ যেরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য মতভেদ হইলে পত্রিকা-সম্পাদকগণের মধ্যে লেখনীযুদ্ধ সংঘটিত হয় পূর্ব্বেও এইরূপ লেখনী-যুদ্ধ সংঘটিত হইত। কেবল লোক বিশেষ ও পত্রিকা বিশেষের কুৎসা রটনার জন্যই যে কত পত্রিকার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা করা কঠিন।

খৃঃ ১৮১৬ হইতে ১৮৫৩ পর্য্যন্ত এই ৩৭ বৎসরের মধ্যে অস্মদ্দেশে

৯৬ খানি পত্রিকার আবির্ভাব হয় কিন্তু কয়েক খানি ব্যতীত কেহ বাল্যে কেহ বা যৌবনেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

তৎপর যে কত মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার স্রোত বঙ্গভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে ও হইতেছে বা হইবে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

নিম্নে কতকগুলি মৃত ও জীবিত পত্রিকার তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল।

(অ)

"অঞ্জলি" (১৩০৫); "অতিথি" (প্রমথনাথ রায়); "অদৃষ্ট" (রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৩০৩); "অনুবাদিকা" (১২৩৮); "অনুশীলন" (মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ১৩০১); "অনুশীলন ও পুরোহিত অনুবীক্ষণ" (১২৮২); "অনুসন্ধান" (দুর্গাদাস লাহিড়ী ১২৯৪); "অন্তঃপুর" (বনলতাদেবী ১৩০৪); "অবোধ বোধিনী" ; "অভিষেক (বিভূতি-শেখর মুখো ১৩০৯)।

(আ)

"আক্কেলগুড়ুম" (ব্রজনাথ বসু ১২৫৪); "আচার্য্য" ; "আনন্দ" ; "আনন্দবাজার (বিষ্ণুপ্রিয়া ১২৯৭) :"আর্য্যদর্শন (যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যা-ভূষণ ১২৮১); "আর্য্যপ্রতিভা" ; "আর্য্যসমাজসম্পত্তি ; "আরতি" (সারদাচরণ ঘোষ ১৩০৭ ;) "আশা" (মহিমচন্দ্রচক্রবর্ত্তী ; (১৩০০) "আলোচনা" (যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩০৪) ; "আলো" ; "আয়ুর্ব্বেদসঞ্জীবনী।

(ই)

"ইস্‌লাম প্রচারক" (মহম্মদ রেয়াজদ্দীন আহাম্মদ ১২৭৭)

(উ)

"উৎসাহ" (ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল ১৩০৪); "উৎকল-সাহিত্য ;

"উদ্দীপনা"; "উদ্বোধন" (ত্রিগুণাতীতানন্দ ১৩০৫); "উপদেশক" (টম্‌সন্ ১২৫৭); "উপাসনা" (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৩১১)।

(ঋ)

"ঋষি" (রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ১৩০৫)

(এ)

"এডুকেশন গেজেট" (সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ ১২৭৫)

(ঐ)

"ঐতিহাসিক চিত্র" (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ত্রৈমাসিক ১৩০৫); "ঐতিহাসিক চিত্র" (নিখিলনাথ রায় ১৩১১ মাসিক)।

(ক)

"কণিকা" (উমেশনাথ ভট্টাচার্য্য ১৩১৩); "কর্ণধার" (হারাণচন্দ্র রক্ষিত ১২৯৪); "কল্যাণী" (বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১৩০৮); "কল্প", "কল্পনা" (হরিদাস বন্দ্যো ১২৯০); "কল্পদ্রুম" (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১২৮৬); "কাঙ্গাল"; "কান্দী পত্রিকা"; "কার্য্যরত্নাকর (উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ১২৫৪) "কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড বেদ" (ফিকিরচাঁদ ফকির ১৩০৩); "কাশীপুর নিবাসী"; "কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা" (কাশীনাথ মিত্র ১২৫৮); "কৃষক" (ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন); "কুমারী পত্রিকা; "কোহিনুর" (মুন্সী এস্, কে, এম্ রওসন আলি ১৩০৫); "কৌস্তুভ" (মহেশচন্দ্র ঘোষ ১২৫৫); "কৌস্তুভকিরণ" (রাজনারায়ণ মিত্র ১২৫৬); কমলা (যোগীন্দ্র চন্দ্র বসু)।

(খ)

"খুলনা"; "খুল্‌নাবাসী"; খুলনাসুহৃদ।

(গ)

"গভর্ণমেণ্ট গেজেট"; "গরীব"; "গৌরভূমি" (রামপ্রসন্ন ঘোষ ১৩০৮)।

(চ)

"চন্দ্রপ্রভা"; "চন্দ্রমা" (হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৩১০); "চারুবার্ত্তা"; "চারুমিহির"; "চন্দ্রিকা"; "চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ" (দ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায় ১৩০১); "চিকিৎসাসম্মিলনী" (অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন ১২৯০) "চিকিৎসক ও সমালোচক" (সত্যকৃষ্ণ রায় ১৩০১); "চিকিৎসা কল্পদ্রুম" "চিকিৎসক বা পথ্য আয়ুর্ব্বেদ; "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ"।

(ছ)

"ছাত্র"; ছায়া (সাহিত্য সেবক মণ্ডলী ১৩০৭)।

(জ)

"জগদ্বন্ধু পত্রিকা" (সীতানাথ ঘোষ ১২৫৩); "জগদ্বাসী"; জগদু-দ্দীপক ভাস্কর" (মৌঃ বজর আলি ১২৫৩) "জ্ঞানান্বেষণ" (দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১২৩৮); "জ্ঞানদীপিকা" (ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১২৪৭); "জ্ঞানাঞ্জন" (চৈতন্যচরণ অধিকারী ১২৫৩); "জ্ঞান সঞ্চারিণী" (গঙ্গানারায়ণ বসু ১২৫৪); জ্ঞান চন্দ্রোদয় (রাধানাথ বসু ১২৫৫) "জ্ঞানরত্নাকর" (ব্রজনাথ বসু ১২৫৫) "জ্ঞানাঙ্কুর" (শ্রীকৃষ্ণদাস ১২৭৯); "জ্ঞানোদয়" (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১২৫৮) "জ্ঞানোদয়" (রামচন্দ্র মিত্র ১২৩৮); "জ্ঞানদর্শন" (শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ১২৫৮) "জ্ঞানারুণোদয়" (কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার ১২৫৮); "জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ" (রামকৃষ্ণ মল্লিক) "জন্মভূমি" (বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রথম প্রকাশিত ১২৯৭); "জাহ্নবী" (নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১৩১২); "জ্যোতির"; "জ্যোতিরিঙ্গণ" (কলিকাতার ট্রাক্ট সোসাইটী হইতে প্রকাশিত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) "জ্যোৎস্নাহার"।

(ঢ)

"ঢাকাপ্রকাশ"; "ঢাকা গেজেট।"

(ত)

"তত্ত্বমঞ্জরী" (শ্রীরামচন্দ্র দত্ত ১২৯২); "তত্ত্ববোধিনী (তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে ১২৫০); "তমালিকা" ; তত্ত্বকৌমুদী (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ১৭৯৯ শকে); "তৃপ্তি" (কালীচরণ মিত্র) "ত্রিস্রোতা" ; "ত্রিপুরাহিতৈষী"।

(দ)

"দারগার দপ্তর" (প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়); "দাসী" (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯২ খৃঃ); "দিগ্বিজয়" (দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ১২৮৪) ; "দিনাজপুর পত্রিকা" ; "দীপিকা" ; "দুর্জ্জন দমন-মহানবমী" (মথুরা নাথ গুহ ১২৫৩) "দূরবীক্ষণিকা" (১২৫৭); "দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা"।

(ধ)

"ধরণী"—(ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩০১); "ধর্ম্মকর্ম্ম প্রকাশিতা" (কোন্নগর ধর্ম্ম সভা হইতে ১২৫৭); "ধর্ম্মতত্ত্ব" (পাঃ) ; "ধর্ম্ম প্রচারক" ; "ধর্ম্মরাজ" (১২৫৯)।

(ন)

"নবজীবন" (অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১২৯১) ; "নবযুগ" ; "নবসুর" "নবপ্রভা" (জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় ১৩০৭) ; "নববিভাকর ও সাধারণী" ; "নববিধান" ; "নব্যভারত" (দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ১২৯০) ; "নলিনী" (নরেন্দ্রনাথ বসু ১২৮৮) ; "নদীয়া" , "নবশক্তি" (মনোরঞ্জন গুহ) "নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিত" (নন্দকুমার কবিরত্ন ১২৫৩) ; "নির্ম্মাল্য" (রাজেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৩০৫) "নীহার।"

(প)

"পত্রাবলী (রামচন্দ্র মিত্র ১২৩৮ ;) "পন্থা" (কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী ১৩০৫) ; "পল্লীবাসী" ; "পরিদর্শক"; "পাক্ষিক

সমালোচক" ; "পাষণ্ডপীড়ন" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৫৩) ; "পারিজাত" ; "পূর্ব্ববঙ্গবাসী" ; "পুষ্পহার" ; "পূর্ণশশী" ; "পুর্ণিমা" (১২৯৯) ; "পুণ্য" (প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ১৩০৪) ; "পুরুলিয়া দর্পণ" পূর্ব্ববঙ্গ ; "প্রতিজ্ঞা" ; "প্রতিকার" ; "প্রতিবাসী" ; "প্রজাপতি" ; "প্রজাবন্ধু" ; "প্রতিভা" ; (বেণীমাধব দত্ত কর্ত্তৃক ১২৮৯) ; "প্রতিমা" (বামদেব দত্ত, রামলাল গোস্বামী ১২৯৭) ; "প্রভা" (জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ১৩০৭) "প্রচার" (রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৯০) "প্রকৃতি" (১৩০৭) ; "প্রকৃতিরঞ্জন" ; "প্রকৃতিবিজ্ঞান" (প্রভাতচন্দ্র সেন ১২৯৮) ; "প্রবাসী" (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩০৮) ; "প্রভাত" ; "প্রদীপ" (বৈকুণ্ঠনাথ দাস ১৩০৪) "প্রয়াস" (জিতেন্দ্র বিশ্বাস ১৩০৬) ; "প্রবাহ" (দামোদর মুখোপাধ্যায় ১২৮৯) ; "প্রসূন" (পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বঙ্কবিহারী ঘোষ ১১১ ।

(ব)

বগুড়াদর্পণ ; বঙ্গদর্শন (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৮০ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবপর্য্যায় ১৩০৮) ; "বঙ্গবাসী" ; "বঙ্গনিবাসী" ; "বঙ্গভূমি" ; "বঙ্গজীবন" ; "বঙ্গজননী" ; "বঙ্গরবি" ; "বঙ্গবন্ধু" (বরদাচরণ ঘোষ ১২৮৯) ; "বঙ্গমহিলা" (ভুবনমোহন সরকার ১২৮২) ; "বঙ্গহিতৈষী" (১৩০৯) ; "বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী" ; "বর্দ্ধমানজ্ঞানপ্রদায়িনী" (বর্দ্ধমান মহারাজের ব্যয়ে ১২৫৬) "বসুমতী" (১৩০২) ; "বরিশালহিতৈষী" ; "বয়স্ক" ; "বাণী" (অমূল্যচরণ ঘোষ ১৩১২) ; "বসন্তক" (প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ১২৮০) ; "বান্ধব" (কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮১) "বালকবন্ধু" ; "বাঁকুড়া-দর্পণ" ; "বামাবোধিনী" (উমেশচন্দ্র দত্ত ১২৭০) ; "বাসনা" (১৩০১) ; "বিজলী" ; "বিভা" (১২০৪) ; "বিদ্যাদর্শন" ; (অক্ষয়কুমার দত্ত ১২৪৯) ; বিদ্যারত্ন (তারাচরণ শিকদার ১২৫৮) ; "বিবিধ ধর্ম্মসংগ্রহ" (রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১২৫৮) ; "বিদ্যোদয়" (হৃষীকেশ শাস্ত্রী ১২৭৭) ;

"বিকাশ" (রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী); "বিক্রমপুর"; "বিষ্ণুপ্রিয়া"; "বিজ্ঞানদর্পণ" "বিজ্ঞানসেবধি" (গঙ্গাচরণ সেন ১২৩৮); "বিশ্বজননী" (যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩০৭); "বিশ্ববিলোকন" (১২৫৯); "বিশ্বদর্পণ"; "বীণাপাণি" (রামগোপাল সেন ১৩০০); "বীরভূমি" (নীলরতন মুখোপাধ্যায় ১৩০৬); বীরভূমবার্ত্তা ; বীরভূমহিতৈষী ; "বেদব্যাস" (ভূধর চট্টোপাধ্যায় ১২৯৩); "বৈষ্ণব" (সোমপ্রকাশ অফিস ১২৯২)। "ব্রাহ্মণ" তেজশ্চন্দ্র বিদ্যার্ণব) ; "বাল্যসখা," (শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী) ।

(ম)

"মজ্‌লিস্‌" ; "মধ্যস্থ" ; মহাজনদর্পণ (জয়কালী বসু ১২৫৬ ; "মহাজনবন্ধু" (রাজকৃষ্ণ পাল ১৩০৭); "মহাশক্তি" ; "মহিলা" (১৩০২); "মনোরঞ্জন" (গোপালচন্দ্র দে ১২৫৪); "মানভূম"; "মালঞ্চ"; "মাসিক সমালোচনী (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়) ; "মিষ্টভাষী" ; "মিহির ও সুধাকর" ; "মুকুল" (১৩০২) ; "মুকুলমালা" ; "মুক্তাবলী" (কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য ১২৫৫); "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" (গুরুদয়াল চৌধুরী ১২৪৭); "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি"; "মুর্শিদাবাদহিতৈষী" (বনওয়ারিলাল গোস্বামী); "মেদিনীপুর" (হিজলী অঞ্চলের অধ্যক্ষ কতিপয় ইংরেজ কর্ত্তৃক ১২৫৮); "মেদিনীবান্ধব"।

(র)

"রঙ্গালয়" ; "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" ;"রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" (১২৬০ গুরুচরণ রায় ১২৫৪); "রমণী" (চারুচন্দ্র রায় ১৩০০); "রসমুদ্গর" (ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫৬) রসরত্নাকর (যদুনাথ পাল ১২৫৬) "রসরাজ" (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ১২৪৫); "রসসাগর" (১২৫৯); "রাজেন্দ্র" (দুর্ল্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৩৮); "রত্নাকর"।

(ল)

"লক্ষ্মীসরস্বতী"।

(ভ)

"ভক্তিসূচক" (রামনিধি দাস ১২৫৭); "ভারত" (ব্যোমকেশ মুস্তোফী ১২৯১) "ভারতভূমি" ; "ভারতসুহৃদ্ ; "ভারতী" (সরলা দেবী ১২৮৪), "ভারতী ও বালক" (স্বর্ণকুমারী দেবী ১২৮৩) "ভারতবাসী" ; "ভাস্কর" ; "ভারতবন্ধু" (শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ; "ভিষক্-দর্পণ" ; "ভৃঙ্গদূত" (নীলকমল দাস ১২৪৯) ।

(য)

"যশোর পত্রিকা" ; "যশোর সম্মিলনী ; "যশোহর" ; "যুগান্তর"

(শ)

"শশধর" (১২৫৯) ; "শান্তি" ; "শিক্ষা" ; "শিক্ষাপরিচর" (শরৎচন্দ্র চৌধুরী ১২৯৬) ; "শিল্পপরিচয়" (শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ১২৯৬) ; "শিল্পপুষ্পাঞ্জলি (১২৯৩) ; "শিবপুর কলেজ পত্রিকা" ; "শিবা" ; "শোভা"; "শ্যামচাঁদ" ; "শ্রীচৈতন্যপত্রিকা"; "শ্রীসনাতনী" ; "শ্রীরাম-পুর ও আরামবাগ সম্মিলনী" ।

(স)

"সখা ও সাথী" (ভুবনমোহন রায় ১২৯২); "সখী" (১৩০৭) ; "সঙ্গিনী" ; "সঞ্জীবনী" ; "সজ্জন-তোষিণী" ; "সজ্জনরঞ্জন" (গোবিন্দ চন্দ্র গুপ্ত ১২৫৬) ; "সৎসঙ্গ" (সাতকড়ি বন্দ্যো ১৩০১) ; "সত্যপ্রদীপ" (মিঃ টর্ডসেণ্ড ১২৫৭) ; "সত্যার্ণব" (লং পাদ্রী ১২৫৭) ; "সত্যসঞ্চারিণী" (প্রভাকর প্রেস ১২৫১) ; "সময়" (১২৯০) ; "সমাচার জ্ঞানদর্পণ" (উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ১২৫৩) ; "সমাচার সভা" (১২৩৮) ; "সমালোচনী (মজুমদার লাইব্রেরী ১৩০৮) ; "সহচরী" বীরেশ্বর পাঁড়ে ১২৯৩) ; "সমাজ-রঞ্জন" ; 'সমাজ ও সাহিত্য" ; "সনাতন ধর্ম্মকণা" ; "সংস্কৃতচন্দ্রিকা" (জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ১৮১৪ শক) ; "সংবাদঅরুণোদয়" (জগন্নাথ রায় ১২৪৫) ; "সংবাদ অরুণোদয়" (পঞ্চানন বন্দ্যো ১২৫৫) ; "সন্ধ্যা"—ব্রহ্ম-বান্ধব উপা-